আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী।

প্রথম খণ্ড।

(আয়ুর্ব্বেদীয়-চিকিৎসা-বিষয়ক-মাসিক পত্র এবং সমালোচন)

চিকিৎসক-শিরোমণি

শ্রীযুক্ত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয়ের

অনুমতি অনুসারে

শ্রীযুক্ত কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ সেন

এবং

শ্রীযুক্ত কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেন

মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে

শ্রীভগবতীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ

ও

শ্রীহরিপ্রসন্ন সেন কবিরাজ

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

এবং

১৭ নং কুমারটুলী হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা মণিরামযন্ত্রে

(১৮০ নং অপার চিৎপুররোড্ বাগবাজার)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

(প্রথম খণ্ড।)

সূচী।

অন্নকষ্টে সাহায্যদান।

বর্দ্ধমান এবং বাঁকুড়া জেলার নিম্নশ্রেণীর প্রজাদিগের অন্নকষ্ট উপস্থিত; তাঁহাদিগের সাহায্য জন্য দেশের সর্ব্বত্র চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। যদি একজন ব্যক্তিরও অন্নকষ্ট নিবারণ করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলেও মঙ্গলের বিষয় জানিয়া আমরা সাধ্যমত সাহায্য সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনীর অনুগ্রাহক গ্রাহকগণ যদি পরঃদুঃখ মোচন কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া, আমাদিগের সহিত যোগ দানে প্রস্তুত হয়েন, তাহা হইলে আমরা পরমানন্দিত হইব। যিনি যাহা কিছু দান করিবেন, আমরা তাহাই সানন্দে গ্রহণ করিয়া, বর্দ্ধমানের মেজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিব। আমরা আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনীর লাভাংশ হইতে ইতিপূর্ব্বে উক্ত মেজি-ষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ১০০ একশত মুদ্রা পাঠাইয়াছি।

আমাদের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত সংখ্যক যাহা সঞ্চারিত হইয়াছে ;—

আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী	১০০
অষ্টাঙ্গহৃদয় বিভাগ	৮
শ্রীযুক্তবাবু নিশিকান্ত সেনগুপ্ত কবিরাজ	৭
,, হরিমোহন গুপ্ত কবিরাজ	২
,, গঙ্গাধর রায় কবিরাজ	২
,, গুরুপ্রসন্ন সেন কবিরাজ	১০
,, গোবিন্দ চন্দ্র রায় কবিরাজ	২
,, রাজমোহন রায়	১
পণ্ডিত শ্রীঅমৃত লাল চট্টোপাধ্যায়	১
শ্রীযুক্তবাবু চন্দ্রকান্ত বন্দোপাধ্যায়	১
,, জগতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১
,, কালীনাথ ভট্টাচার্য্য	২
,, জগদানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১
,, দীনবন্ধু রায় কবিরাজ	১
,, শারদা চরণ রায় কবিরাজ	১
,, যদুনাথ পাল	১
,, হরিনাথ বিশারদ কবিরাজ	১
,, রজনী কান্ত সেন কবিরাজ	১
,, শ্যামাচরণ সেন	১
,, ঈশান চন্দ্র বিশারদ কবিরাজ	॥০
,, শশীভূষণ রক্ষিত	॥০
,, পার্ব্বতীচরণ দাস কবিরাজ	।০
,, গঙ্গাধর দাস কবিরাজ	।০
,, অম্বিকাচরণ রায় কবিরাজ	১
,, অশ্বিনীকুমার দাস	১

করিতে পারিলে অভিপ্রায় রক্ষিত হইতে পারে। তালিকাপ্রধান গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ প্রশস্ত।

মূল গ্রন্থেরই হউক আর সংগ্রহ গ্রন্থেরই হউক, অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে গুরূপদেশ, ব্যাখ্যা, বিবৃতি, উদাহরণ প্রভৃতি থাকা চাই। তাহা হইলে গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদ্গত হইতে পারে এবং ফল-প্রধান শাস্ত্রের কার্য্যগত দৃষ্টিও জন্মিতে পারে।

৩। আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বাংশে ব্যুৎপন্ন লোক বিরল। যিনি বচন মাত্রের অর্থ বা আবৃত্তি করিতে পারেন, কিন্তু ক্রিয়া জানেন না, তাহাকে ব্যুৎপন্ন বলিতে পারি না। যিনি ক্রিয়া জানেন, কিন্তু বচন জানেন না, তিনি অনেক অংশে পূজনীয়। অতএব অনুবাদ কালে ক্রিয়ানিপুণ ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করা চাই। আয়ুর্ব্বেদের অনেক ভাব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সেই সকল ভাব শীঘ্র উদ্ধার করার উপায় নাই। এমন স্থলে "মাছিমারা" কেরাণীর ন্যায় অনুবাদ না করিয়া সন্দেহবোধক কোনরূপ চিহ্ন বা উক্তি থাকা প্রয়োজনীয়। কেন না ঐরূপ সন্দেহ প্রকাশিত হইলে কোন না কোন ব্যক্তি সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে পারিবেন।

৪। ঔষধদ্রব্যের নাম এবং অর্থবোধও একটী কঠিন ব্যাপার। এরূপ অনেকগুলি শব্দ আছে অভিধান গ্রন্থে যাহাদের বহুবিধ অর্থ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং গ্রন্থকার কোন্ অর্থ লক্ষ্য করিয়া কোন্ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা অসংশয়ে নির্দ্ধারণ করা সহজেই দুরূহ। তাহাতে আবার ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদির অনুরোধে শব্দের আকার ও প্রকারগত বিকৃতি বা বৈলক্ষণ্য ঘটায় সমধিক সন্দেহ জন্মে। এমনস্থলে পরীক্ষা করিয়া দ্রব্যার্থনির্ণয় করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তাহা না ঘটিলেও ব্যবহারনিপুণ শিক্ষিত বহুব্যক্তির মত সংগ্রহ করিয়া অর্থ নির্ণয় আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ শব্দের অর্থ বোধ হইলেও ঐ সকল শব্দে কোন্ বস্তু বুঝায়; তাহা সাধারণকে বুঝান

নিতান্ত সহজ নহে। কেন না এক বাঙ্গালা প্রদেশেই একই বস্তু নানা নামে ব্যবহৃত হইতেছে। এমন স্থলে কোন প্রধান স্থানের নাম গ্রন্থে ব্যবহার করিলে ভাল হয়। কলিকাতা ভারতের প্রধান রাজধানী, এইস্থানে শিক্ষিত এবং সভ্য লোকের সংখ্যা বেশী, সুতরাং কলিকাতার শিক্ষা প্রভৃতি সকলেই অনুকরণ করিতে প্রস্তুত অতএব কলিকাতার বাজারে ব্যবহৃত নাম ব্যবহার করিলে অনেকের আপত্তি না হইতে পারে। গ্রন্থশেষে একটী আভিধানিক সূচী প্রস্তুত করিয়া সেই সূচীতে প্রধান প্রধান স্থান-সকলের নাম যোজনা করিলে সুন্দররূপে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া সম্ভব।

৫। আয়ুর্ব্বেদ এক প্রকার নষ্ট শাস্ত্র উহার সর্ব্বাংশের ক্রিয়া সুন্দররূপে কাহারও বিদিত নাই। কতকালে যে ইহার প্রকৃত উদ্ধার হইবে, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। ইহার পদে পদেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। সন্দিহান বিষয় সকল বিনা পরীক্ষায় সাধারণের (বিশেষ অনভিজ্ঞ লোকের) নিকটে প্রচার করা ন্যায়-বিরুদ্ধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। সুতরাং উহার ভাল মন্দ বিচারের ভার উপযুক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করা উচিত। তদ্ভিন্ন যাঁহারা সমাজে পণ্ডিত বলিয়া গণনীয় তাঁহাদের নিকটেও গুণ দোষ অনুসন্ধানার্থে গ্রন্থ অর্পণ করা কর্ত্তব্য। যদি তাঁহারা কোন উপকারি ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রন্থে যোজনা করা কর্ত্তব্য। এবং যে সমস্ত ভ্রম প্রদর্শন করেন, তদনুসারে শুদ্ধিপত্র প্রচার করা আবশ্যক।

সংপ্রতি শ্রীযুক্ত কবিরাজ হরিনাথ বিশারদ ও শ্রীযুক্ত কবিরাজ ঈশানচন্দ্র বিশারদ যে সটীক সানুবাদ চরকসংহিতার প্রচার উদ্দেশে অনুষ্ঠান-পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। অনুবাদসম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায়ের সহিত তাঁহাদের মতের কতদূর ঐক্য হইবে বলা যায় না। তথাপি তাঁহাদের গন্তব্যপথে ইহা যদি কিঞ্চিৎ

আলোক প্রদান করিতে সমর্থ হয়, সেই উদ্দেশে এত কথা বলিলাম। বিশেষতঃ বৈদ্যক গ্রন্থসমূহের মধ্যে চরকের ন্যায় দুরূহ গ্রন্থ আর নাই। সুতরাং ইহার অনুবাদ বিষয়ে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিলে বড়ই আক্ষেপের বিষয় হইবে। আমরা বিশারদদ্বয়ের পাণ্ডিত্যের উপর যতদূর বিশ্বাস করি, তাহাতে বোধ হয়, চরকের ভাবী অনুবাদ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরই হইবে।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আমরা বস্তুবিদ্যা (১) নামক একখানি মাসিক পত্রিকাপ্রাপ্ত হইলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে পাইকপাড়া নর্সরি হইতে এই শ্রেণীর আর একখানি পত্রিকা প্রচারিত হইতেছিল। এক্ষণে তাহার তিরোভাবে বস্তুবিদ্যাই উক্ত পত্রিকার স্থান অধিকার করিল।

বস্তু বিদ্যার অবতরণিকা ভাগে এইরূপ লিখিত হইয়াছে— "ইংরাজ রাজত্ব প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবাসী আপনার প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য আপনি প্রস্তুত করিয়া লইত। কিন্তু আজ কাল আর সে সময় নাই, আমরা কেবল " হা ভারত যো ভারত " করিয়া ভারত উদ্ধারে উদ্যত হইয়াছি। কিন্তু এদিকে বিলাতী দীপ শলাকা না হইলে গৃহে প্রদীপ জ্বলে না। কি বিড়ম্বনা! আমরা প্রদীপ্ত হুতাশন ভ্রমে ভস্মে [illegible]ত নিক্ষেপ করিতেছি। যতদিন ভারতবাসী স্বাবলম্বী হইয়া আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্য আপনি প্রস্তুত করিয়া লইতে না শিখিবে, ততদিন কোনক্রমেই শ্রেয়ঃ নাই। জগতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে আপনার ক্ষমতা সত্ত্বে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে, মনুষ্য কখন

(১) শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তীকর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

উন্নতি-শৃঙ্গের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে পারে না। যাহাতে সকলে আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্য আপনি প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে, তদ্বিষয়ে দৃঢ়প্রযত্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরাও বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুতের নিয়ম সরল ভাষায় বিশদরূপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। বস্তুবিদ্যায় মুষ্টিযোগ, ইন্দ্রজাল ও শিল্পবিষয়ক প্রস্তাবও স্থান পাইবে। ভরসা করি তাহাতে আমাদিগকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতে হইবে না। সে যাহা হউক, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এবং আধুনিক কয়েকখানি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন। আমরা ভারতবর্ষজাত দ্রব্যাদির গুণাগুণ বিশেষরূপে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। কারণ এদেশের দ্রব্যাদি এই দেশের প্রধান উপযোগী।" সুতরাং ইহার উদ্দেশ্য অতিসুন্দর ও মহোপকারী তাহার সন্দেহ নাই। ইহাতে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় এবং সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য দ্রব্যেরগুণ লিখিত হইতেছে। লিখিত বিষয় গুলির ভাষা প্রাঞ্জল সুতরাং সাধারণের বোধগম্য ও উপকারী হইবে; আমরা এইরূপ ভরসা করিতে পারি। কিন্তু একটী বিষয়ের সঙ্গে আমাদের মতের সম্পূর্ণ অনৈক্য দেখিতেছি। কেবল কতকগুলি বচন দেখিয়া বিনা-পরীক্ষায় যে কোন বিষয় লিখিয়া পত্রিকার কলেবর পূর্ণকরা যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। পত্রিকার দ্বাদশ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিয়াছিলেন প্রিয়ে। অশোক, চিতার মূল, খঞ্জন পক্ষীর বিষ্ঠা, ঘোটকের ফেনা, [illegible]ভাঞ্জন বীজ এবং স্বর্ণচাতক বা নীলকণ্ঠ পক্ষীর নেত্র দ্বয় দ্বারা ধূপ দিলে লোকে দেবগণেরও অদৃশ্য হয়। মনুষ্যের কথাই বা কি!!!

কেবল সংস্কৃত বচনমাত্র দেখিয়া ঐরূপ আজগবি বস্তুবিদ্যা লেখা অকারণ সময় নষ্টকরা মাত্র। আমরা আশা করি, গ্রন্থকার মহাশয় অতঃপর লেখিতব্য বিষয়ে যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা করিয়া দ্রব্যের গুণ প্রচার করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ কত কালের ?

চতুর্থ প্রস্তাব।

প্রশ্ন শুনিলে বোধ হয়, প্রশ্ন কর্ত্তার মনে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ সংশয় বা কোনরূপ জিজ্ঞাসা উপস্থিত নাই। প্রশ্নকর্ত্তা কেবল আয়ুর্ব্বেদের প্রচার-কাল জানিতে চাহেন, অথবা উহার পুরাতনতার ইয়ত্তাবধারণ করিতে ইচ্ছুক। যাহাই হউক, আয়ুর্ব্বেদের আবির্ভাব-কাল বা প্রচার-কাল নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয় করা অতীব দুঃসাধ্য। আয়ুর্ব্বেদ যে কোন্ সুদূর অতীতকালে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল—তাহা আজ আমরা কেহই বলিতে পারিব না, কেহই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব না। যদিও আমরা অসমর্থ, তথাপি আজ দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া আয়ুর্ব্বেদের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধান বা আলোচনা করিব।

আয়ুর্ব্বেদের আবির্ভাব-কাল অনুসন্ধান করিতে হইলে, প্রথমতঃ কতকগুলি প্রাচীনতম আর্ষগ্রন্থের আশ্রয় লইতে হয়। তদ্দ্বারা কোন একটী কালকেন্দ্র স্থির করিয়া, কোন একটী নির্দ্দিষ্ট কালকে কেন্দ্রস্বরূপে বা বিন্দুরূপে গ্রহণ করিয়া, অবশেষে তাহার পূর্ব্বাপর প্রান্ত বা পূর্ব্বাপর রেখা নিরীক্ষণ করিতে হয়। ঐরূপ করিলেই বোধ হয়, আয়ুর্ব্বেদের আবির্ভাব-কাল আকর্ষিত হইবে, অন্ততঃ আংশিক তথ্য অবশ্যই প্রকাশ পাইবে।

কালকেন্দ্র অর্থাৎ কোন একটী নির্দ্দিষ্ট কালকে মূল বা বিন্দু স্বরূপে Zero point গ্রহণ করিতে হইলে, মুখ্যকল্পে মহাভারত-কালকে গ্রহণ করা উচিত। মহাভারতকাল সুনির্ণীত হইলে, তথা হইতে যে দিক্ ইচ্ছা সেই দিক্ নিরীক্ষণ করা যাইবে এবং প্রত্যেক পুরাতন গ্রন্থকাল নিকট হইয়া আসিবে। কিন্তু দুঃখের

বিষয় এই যে, কুরুপাণ্ডবকালের ওদিকে যাইতে বর্ষগণনা করা যায় না। বরং ১।২।৩ এবং ক্রমে বর্ষগণনা করিয়া এদিকে আশা যায়, তথাপি তাহার উপরের দিকে পাওয়া যায় না। উপরে কেবল যুগ-গণনা, বর্ষ-গণনা ওদিকে নাই বলিলেও বলিতে পারি। না থাকুক, আমাদের অন্বেষ্টব্য বস্তু প্রায়ই এ দিকে আছে, সুতরাং এই দিকটা দেখিলেই আমাদের যথেষ্ট কার্য্য হইবে।

মহাভারতকালই যদি প্রথম অন্বেষ্টব্য হইল, তবে, তদ্বিষয়েই মনোনিবেশ করুন। কোন্ সময়ে ভারত যুদ্ধ হইয়াছিল, কুরু-রাজ যুধিষ্ঠির কোন্ সময়ে রাজ্য করিয়াছিলেন, তদ্বৃত্তান্ত পরিপূর্ণ মহাভারত গ্রন্থ কোন্ সময়ে প্রচারিত হইয়া ছিল?—এ সকল তথ্য অনুসন্ধান করিতে আমাদের বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না। তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা অনেক বার উহা'র অনুসন্ধান করিয়া ছিলেন, এবং অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য সকল লিপিবদ্ধ করিয়াও ছিলেন। সেই সকল লিপি আমরা অদ্যাপি পাইতেছি, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলেই আমরা সহজে মহা-ভারত কাল জানিতে সক্ষম হইব।

আট শত বৎসরের বৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীকহ্লণ মিশ্র অনেক অনুসন্ধা-নের পর স্থির করিয়া ছিলেন যে, কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে পর, পৃথিবী কুরুপাণ্ডবগণের শাসনাধীন হয়। তাঁহার উদ্ভাবিত যুক্তিপ্রণালী এস্থলে উল্লেখ করিবার তত প্রয়োজন নাই বলিয়া, তাঁহার বিনির্ণীত সিদ্ধান্তমাত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। বোধ হয় তল্লিখিত সিদ্ধান্ত শ্লোকটীই আমাদের ঈপ্সিত বিষয়ের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ হইবে। যথা—

"—ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥"

কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে, পৃথিবীতে কুরুপাণ্ডবগণ আধি-পত্য করিয়াছিলেন। *

কহ্লণ পণ্ডিতের এই নির্ণয় যে ভ্রান্ত নির্ণয় নহে, তৎপ্রতি অনেক কারণ আছে। সে সকল কারণ উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধকায়া বাড়িয়া যায় এবং অপ্রাসঙ্গিকতুল্য হয়। তবে যদি কাহারও ইচ্ছা হয় ত তিনি কহ্লণ পণ্ডিতের কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত দেখিবেন, দেখিলেই তাঁহার সন্দেহ অপনীত হইবে।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ প্রণেতা বিষ্ণুশর্ম্মা অপেক্ষা ও পূর্ব্বোক্ত কহ্লণ পণ্ডিত অপেক্ষা বহুপ্রাচীন প্রধানতম জ্যোতির্ব্বিৎ আচার্য্য বরাহমিহির মহারাজা যুধিষ্ঠিরের সময় নির্দ্ধারণ করিয়াগিয়াছেন। তিনি স্বকৃত বৃহৎসংহিতানামক জ্যোতিগ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে,

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড্‌দ্বিক পঞ্চ দ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ ॥"

রাজা যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবীশাসন করেন, সপ্তর্ষিমণ্ডল (সাত ভেয়ে তারা) তখন মঘানক্ষত্র ভোগ করিতেছিল। সপ্তর্ষি-চার গণনার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, তাঁহার রাজ্যকাল হইতে ২৫২৬ বৎসর পরে শকাব্দ প্রচারিত হইয়াছিল। এখন বিবেচনা করুন, বর্ত্তমান বৎসর বা আমরা আর রাজা যুধিষ্ঠির, এই উভয়ের অন্তরালে কি পরিমাণ কাল পড়িয়া আছে। ২৫২৬ আর শকাব্দা ১৮০৬ একত্রিত করিলে অবশ্যই ৪৩৩৪ বৎসর হইবে। জ্যোতির্ব্বিৎ শ্রেষ্ঠ মহামান্য বরাহমিহির যদি মিথ্যা বাদী না হন, যদি তাঁহার গণনা করিতে ভ্রম না হইয়া থাকে, তবে, তাঁহার দোহাই দিয়া আমরা বলিতে পারি, রাজা যুধিষ্ঠির আজ হইতে ৪৩৩৪ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

* অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, এই কালটী কুরুপাণ্ডব-গণের জন্মকাল, রাজ্যকাল নহে।

যতকাল এদেশে পঞ্জিকার সৃষ্টি হইয়াছে—তত কালই তাহাতে কল্যব্দ লিখিত হইয়া আসিতেছে। এ বৎসরের পঞ্জিকায়, নিয়মানুসারে, ৪৯৮৫ কল্যব্দ লিখিত আছে। যুধিষ্ঠির যদি সত্য সত্যই ৬৫৩ কল্যব্দ অতীত করিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পাঁজির নিয়মটী অব্যভিচরিত হয়। অর্থাৎ পঞ্জিকার লিখিত ৪৯৮৫ কল্যব্দের সহিত হিসাবী কল্যব্দের ঐক্য হয়।

প্রত্যক্ষপ্রমিত জ্যোতির্গণনা অনুসারেও উক্ত কুরু-পাণ্ডবকাল নির্ণীত হইতে পারে। প্রধানতম জ্যোতির্বিৎ বরাহমিহির সপ্তর্ষিচার গণনার নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে,—

"একৈকস্মিন্নৃক্ষে শতং শতং তে চরন্তি বর্ষাণাম্।"

ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল (সাত ভেয়ে তারা) শত বৎসর ধরিয়া এক এক নক্ষত্র ভোগ করে। অর্থাৎ সপ্তর্ষি নামক জ্যোতিষ্ক শ্রেণীর এত অল্পগতি যে এক নক্ষত্র অতিক্রম করিতে উহাদের একশত বৎসর লাগে; সুতরাং সমস্ত রাশি পরিভ্রমণ করিতে ২৭০০ সাতাইশ শত বৎসর অতিবাহিত হয়। এবম্ভূত সপ্তর্ষিমণ্ডল যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে মঘা নক্ষত্রে ছিল, এখন তাহা মৃগশিরা নক্ষত্র ভোগ করিতেছে। জ্যোতিষ্ক মাত্রেরই মন্দগতি ও শীঘ্রগতি হইয়া থাকে। সুতরাং সপ্তর্ষিগণের গতিও কখন মন্দ কখন বা শীঘ্র হইয়া থাকে। এই গতিমূলক স্ফুট গণনা হইতে ভুক্তি আনয়ন করা হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে যে, সপ্তর্ষিগণের গতিমান্দ্য প্রত্যেক রাশি ভোগের অন্তরে অন্তরে হইয়া থাকে; তদনুসারে প্রত্যেক সহস্র বৎসরে এক এক শত বৎসর করিয়া ভুক্তি বৃদ্ধি লব্ধ হয়। পুনরপি সহস্র বৎসরান্তে তাহাদের শীঘ্র গতি আরম্ভও হয়। সেই বৃদ্ধি সঙ্কলন করিলে এবং মধ্যে অন্য একবার মঘা গতি ধরিয়া লইলে, উল্লিখিত কাল পাওয়া যায় এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাও মিলিয়া যায়।

উল্লিখিত গণনার দ্বারা, উক্ত জ্যোতিষ প্রমাণের দ্বারা, ইহাই নিশ্চয় হইতেছে যে, রাজা যুধিষ্ঠির ৪৩৩২ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির লিখিত চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের রাজ্যকাল গণনা করিলেও উল্লিখিত কাল পাওয়া যায়।

মহারাজ পাণ্ডুর পরলোক হইলে অনাথিনী কুন্তী শিশুপুত্র সমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমন করেন। যুধিষ্ঠিরের বয়স তখন ১৬ বৎসর হইয়া ছিল। ইহার পর জতুগৃহ দাহ পর্য্যন্ত ২০ বৎসর কাল অরণ্যানী ভ্রমণ করেন। অনন্তর দ্রৌপদীবিবাহের পর, ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া ১৮ বৎসর মাত্র রাজ্য শাসন করিয়া ছিলেন। পরে, পাশক্রীড়ায় নির্জ্জিত হইয়া ১৩ বৎসর অজ্ঞাতবাসে অতিবাহিত করেন। সেই ১৩ বৎসর অতীত হইলে ভারত মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই সর্ব্বান্তকর মহাযুদ্ধের শেষ হইলে, তিনি বীরশূন্যা পৃথিবীতে রাজা হন এবং ৫৭ বৎসর রাজ্য পালন করিয়া অবশেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুসংবাদে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া মহাপ্রস্থান গমন অর্থাৎ হিমালয় প্রদেশে গমন করেন। অতএব, লিখিত সংখ্যা সকল একত্রিত করিলে, অর্থাৎ ১৬, ২০, ১২, ১৮, ১৩, এবং ৫৭ বৎসর একত্রিত করিলে যুধিষ্ঠিরের জীবন ১৩৬ বৎসর অবধারিত হয়। ইহার পরেই তদীয় সিংহাসনে অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎ উপবিষ্ট হন। লিখিত আছে যে, রাজা পরীক্ষিৎ ৯৬ বৎসর বয়সে সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইতে পরীক্ষিতের দেহোপরম পর্য্যন্ত গণনা করিলে, কলিগতাব্দ তখন ৮৮০ সমাপ্ত হইয়াছিল, ইহা নির্ণীত হয়। এই সময় হইতে মগধেশ্বর পদ্মপতি নন্দ এবং তৎসম্ভূত নব নন্দের শেষ নন্দ বা তাহার চাণক্য কর্ত্তৃক নষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত গণনা করিলে ১৭২৮ বৎসর পাওয়া যায়।

(জরাসন্ধ পুত্র) সহদেব,

।

মার্জ্জারি,

।

শ্রুতশ্রবা,

।

যুতায়ু,

।

নরমিত্র,

।

সুনক্ষত্র,

।

বৃহৎসেন,

।

কর্ম্মজিৎ,

।

সুতঞ্জয়,

।

বিপ্র,

।

শুচি,

।

ক্ষেম,

।

সুব্রত,

।

ধর্ম্মসূত্র,

।

সম,

।

দুরসেন,

।

সুমতি,

।

সুবল,

।

সুনীথ,

।

সত্যজিৎ,

।

বিশ্বজিৎ,

।

রিপুঞ্জয় বা পুরঞ্জয়।

এই ২২ জন রাজা (১০০০) সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছিলেন।

(পুরঞ্জয় পুত্র) প্রদ্যোতন,
।
পালক,
।
বিশাখযূপ,
।
রাজক,
।
নন্দিবর্দ্ধন।

এই পাঁচজন রাজা ১৩৮ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন।

শিশুনাগ,
।
ক্ষেমধর্ম্মা,
।
ক্ষেত্রজ্ঞ,
।
বিম্বিসার বা অজাতশত্রু
।
দর্ভক,
।
অজয়,
।
নন্দিবর্দ্ধন,
।
মহানন্দি।

এই কএক নরপতির রাজ্যকাল ৩৬০ বৎসর।

(মহানন্দি পুত্র) পদ্মপতি নন্দ।
।
(তদ্বংশীয়) নব-নন্দ।

নন্দ ও নব নন্দ ৩০০ বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। নব নন্দের শেষ নন্দ চাণক্য কর্ত্তৃক নষ্ট হইলে, মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত তৎসিংহাসন অধিকার করেন।

এই গণনা অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত রাজা কলির ২৬৮৩ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান কল্যব্দ পূরণার্থ উক্ত সংখ্যা যোগ করিলে চন্দ্রগুপ্তের আয়ু এক্ষণে ২৩০২ বৎসর অতীত হইয়াছে, ইহা অবধারিত হয়। *

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, কলিপ্রারম্ভ কাল হইতে যুধিষ্ঠিরাদির জন্মকাল অবাধে গণনা করা যাইতে পারে কি-না। কলির ৬৫৩ বৎসর পরে যুধিষ্ঠির, তাঁহার জীবন ১৩৬, তাঁহার ভ্রাতৃপৌত্র পরীক্ষিতের জীবন ৯৬, তৎসমকালিক জরাসন্ধপুত্র সহদেব হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত ১৭৯৮, এবং চন্দ্রগুপ্ত হইতে বর্ত্তমান অব্দ ২৩০২। * সমুদায়ে ৪৯৮৫।

"আয়ুর্ব্বেদ কত কালের?" এই প্রশ্নোপলক্ষ্যে আমরা কলি প্রারম্ভ, কলিগতাব্দ, যুধিষ্ঠিরাদির জন্মকাল এবং তাঁহাদের রাজ্য কাল অনুসন্ধান করিলাম। প্রাচীন শাস্ত্রের সাহায্যে যাহা লব্ধ হইবার সম্ভাবনা তাহাও এই প্রস্তাবে বিন্যস্ত করিলাম। এক্ষণে মহাভারতকাল অনুসন্ধান করিতে হইবে, কেন না মহাভারত কালটী নির্ণীত হইলেই আয়ুর্ব্বেদ-কালটী সহজবোধ্য হইয়া আসিবে।

মহাভারত সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার জল্পকথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, মহাভারত এক জনের লিপি নহে;

* ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ চন্দ্রগুপ্তের জন্মকাল বা রাজ্যকাল খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক ৩২৪ বৎসর হইয়াছে, এরূপ স্থির করেন। কিন্তু উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা উল্লিখিত কালই পাওয়া যায়।

* এই সকল সিদ্ধান্তের প্রমাণ ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ও হরিবংশে আছে। আবশ্যক হয়-ত পাঠকগণ অনায়াসে দেখিয়া লইতে পারেন।

কেহ বলেন, বর্ত্তমান মহাভারত ব্যাসের নহে; অন্যে বলেন, মহাভারত ব্যাসের বটে; পরন্তু যাহা ব্যাসের, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; বর্ত্তমান মহাভারত তাহার ছায়া মাত্র। এ কথার উচিত প্রত্যুত্তর থাকিলেও সে সকল প্রত্যুত্তর এ প্রবন্ধের অবিষয়। যাহাই হউক, বিদ্যমান মহাভারত যখন ব্যাসের কৃত বলিয়া নিরূঢ় বা প্রসিদ্ধ, তখন আর সে পক্ষে সংশয় উত্থাপন করা আমাদের বিবেচনায় নিষ্ফল। বিদ্যমান মহাভারতের মধ্যে যতই গোলোযোগ ঘটুক, প্রক্ষেপ নিক্ষেপ থাকুক, ইহার অনেকাংশই যে ব্যাসের, তৎ পক্ষে অনেক অকাট্য প্রমাণ দেখান যাইতে পারে; পরন্তু তাহা অনুদ্দেশ্য বলিয়া এপ্রবন্ধে বিস্তার করিলাম না। স্থূল কথা এই যে, বিদ্যমান মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত থাকিলেও এক সময়ে ইহা যে বিশুদ্ধ ছিল এবং সেই বিশুদ্ধ অংশ যে ভগবান্ বেদব্যাসের মুখ হইতে নির্গত, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

প্রক্ষেপ নিক্ষেপ বর্জ্জিত বিশুদ্ধ মহাভারত ব্যাসের কি না, যদি তাহা ব্যাসের হয়, তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল এ সকল তথ্য নির্ণয় কবিবার জন্য সমধিক প্রয়াস স্বীকার করিতে হয় না। অত্যল্প মনোনিবেশ করিলেই ঐ সকল তথ্য জানা যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিলে পর, অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎ তদীয় রাজ্যাধিকার গ্রহণ করেন। তিনি ৯৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। তৎপরে তদীয় পুত্র জনমেজয় তদীয় রাজ্যাধিকার গ্রহণ করেন। এই জনমেজয় রাজা ৪৮ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন এবং ইহাঁরই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মহাভারত গ্রন্থ নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল।

রাজা জনমেজয় রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াই সর্পসত্রে দীক্ষিত হন। ঐ অদ্ভুত সত্রে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন তাঁহাকে ব্যাসকৃত মহাভারত শ্রবণ করান। তাহারই অত্যল্পকাল পরে উগ্রশ্রবা নামক

জনৈক মুনি নৈমিষারণ্যে গমন পূর্ব্বক শৌনক প্রভৃতি মুনিগণকে উহা শ্রবণ করান। তৎ শ্রবণে অনেক ঋষিই মুগ্ধ হইয়া মহাভারত গ্রন্থ শিক্ষা করিতে ও পঠন পাঠন করিতে উদ্যোগী হন। ক্রমে তাহা সর্ব্বত্র প্রচারিত ও জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠে। সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, মহাভারত প্রচারের কাল অনধিক চতুঃ সহস্র বৎসর। বিদ্যমান মহাভারত যতই প্রক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত দোষাভ্রাত হউক, ইহার আধার ভাগটী সার্দ্ধ ত্রিসহস্র বৎসরের অধিক পুরাতন হইবে। *

পানিনি অপেক্ষা বহু প্রাচীন যাজ্ঞ্যবল্ক্য ঋষি স্বকৃত ব্রাহ্মণ বিভাগে (উপনিষদে) ব্যাসকৃত মহাভারতকে পঞ্চম বেদ ও ইতহাস-পঞ্চম নামে উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির ত কথাই নাই। পাণিনি মুনি ও যাজ্ঞ্যবল্ক্য ঋষি মহাভারত জানিতেন, এই প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হয় যে, মহাভারত গ্রন্থ কখনই উক্ত কালাপেক্ষা ন্যূন কালিক নহে।

স্থির হইল যে, মহাভারতকাল কিঞ্চিন্ন্যূন ৪০০০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে†। এখন দেখিতে হইবে যে, এই কালের কোন্ প্রান্তে (পূর্ব্বপ্রান্তে বা পরপ্রান্তে) আয়ুর্ব্বেদ নামটী বিরাজ করিতেছে। আয়ুর্ব্বেদ এমন যৎসামান্য বস্তু নহে যে, 'যন্নাস্তি ভারতে তন্নাস্তি ভারতে' এরূপ বিখ্যাত গ্রন্থে উহার উল্লেখ পরিত্যক্ত হইবে। মহাভারতে যদি আয়ুর্ব্বেদের উল্লেখ থাকে ত অবশ্যই উহাকে মহাভারত অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া স্থির করিতে হইবে। আজ্ এই পর্য্যন্ত; অবশিষ্ট তথ্য আমরা আগামী মাসের সঞ্জীবনীতে ব্যক্ত করিব।

ক্রমশঃ।

---

* মহাভারতে ও অন্যান্য প্রত্যেক পুরাণে এই নির্ণয়ের প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

† ইংরাজ অধ্যাপকগণ একথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন কিনা জানি না। বোধ হয় তাঁহারা এত কাল স্বীকার করিতে পারিবেন না। কেন না তাঁহাদিগের পুঁজী মোট ৬০০০ হাজার বৎসর।

আয়ুর্ব্বেদে উদ্ভিদ্বিদ্যা।

প্রথম প্রস্তাব।

উদ্ভিদ্বিদ্যা" এই নাম শুনিয়াই পাঠকগণ হয়ত মনে করিয়াছেন আয়ুর্ব্বেদে গর্ভ্ভ কেশর পরাগ কেশরের কথা আছে, নানা প্রকার কলম্ বাঁধার কথা আছে,বীজকোষ ও আবরণকোষ প্রভৃতির বর্ণনা আছে। বস্তুতঃ ইহাতে তাহা নাই, আয়ুর্ব্বেদ ও সকল কথায় যান না, ঐ সকল অকর্ম্মণ্য অসার কথায় তিনি দৃক্পাত করেন না, জীবের যাহাতে হিত হয়, আয়ুঃস্থাপন হয়, আয়ুর্ব্বেদ সেই সকল কথাই বলেন, সুতরাং শীর্ষকস্থ "উদ্ভিদ্বিদ্যা" শব্দের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন যে,যে বিদ্যার দ্বারা বা উদ্ভিদ্ বিষয়ক যে জ্ঞানের দ্বারা মনুষ্য এই ভৌতিক-কায়ার হ্রাস বৃদ্ধির বা ক্ষতি পূরণ সংশোধিত করিয়া লইতে পারে, সাম্য বিধানের অধীন করিতে পারে, সেই বিদ্যা বা সেই জ্ঞান উপদেশ করাই আমাদের আয়ুর্ব্বেদের প্রধান উদ্দেশ্য সুতরাং ইনি গর্ভ্ভ কেশর পরাগ কেশর নির্ণয় করিবেন না ; তিনি উদ্ভিদের জাতি, শ্রেণী, তাহাদের সহিত মনুষ্য কায়ার সম্বন্ধ, তাহার ফল, পত্র, পুষ্প ও রসাদির বিভাগ, এই সমস্ত নির্ণয় করিবেন। আজকাল যাহাকে আপনারা উদ্ভিদ্বিদ্যা বলিয়া জানিতেছেন, এ সে উদ্ভিদ্বিদ্যা নহে, এ একটী পৃথক্ প্রকারের উদ্ভিদ্বিদ্যা।

এই ভৌতিক দেহের একটী পুরাতন নাম পুদ্গল "।

"পূর্য্যন্তে গলন্তি চ" কখন পূরিতেছে, কখন বা গলিতেছে ; সুতরাং ইহার নাম "পুদ্গল।" ইহার বৈদিক নাম "অন্নময় কোষ।" অন্ন ইহার উপাদান, অন্ন ইহার হ্রাস বৃদ্ধির হেতু, অন্ন ইহার কোষ পরিণাম, তৎ কারণে ইহা "অন্নময়"। অন্ন শব্দের প্রকৃত অর্থ

পৃথিবী ও পার্থিব উদ্ভিদ ; তৎ কারণে ইহার সহিত পৃথিবীর ও পার্থিব উদ্ভিদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, হ্রাস বৃদ্ধির পক্ষে কার্য্য কারণ ভাব আছে। পার্থিব উদ্ভিদের বা পার্থিব প্রয়োগের উপযোগে ইহার পূরণ হয়, ইহা দেখিয়া "পুরী" এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুরে যিনি শয়ান—তিনিই পুরুষ ; নির্দ্দুঃখ স্বভাব হইলেও তিনি পুরীর দোষে দুঃখিতের ন্যায় হন, কাজে কাজেই যাহাতে আমাদের পুরীর উত্তমতা রক্ষা হয়, আয়ুর্ব্বেদ তাহা দেখিবেন। দেহে পার্থিব উদ্ভিদের পরিণাম আছে, পার্থিব উদ্ভিদের প্রভাবেই ইহার ক্ষয়, উদয়, রক্ষা, স্থিতি, উত্তমতা, ও পুরুষে আরোপিত দুঃখের বিঘাত ; এই সকল পারম্পর্য্য ক্রম সম্বন্ধ, বা সম্পর্ক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, উদ্ভিজ্জ-বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদের একটী প্রধানতম অংশ, এবং তাহা আমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বস্তু। সেই জন্যই চরক মুনি বলিয়াছেন।

"মূল-ত্বক্-সার-নির্য্যাস-নাল-স্বরস-পল্লবাঃ।
ক্ষারাঃ ক্ষীরং ফলং পুষ্পং ভস্ম তৈলানি কণ্টকাঃ।
পত্রাণি শুঙ্গাঃ কন্দাশ্চ প্ররোহশ্চৌদ্ভিদোগণঃ ॥"

উদ্ভিদ্ সংক্রান্ত মূল, ত্বক্, সার, নির্য্যাস, নাল, রস, পল্লব, ক্ষার, ক্ষীর, ফল, পুষ্প, ভস্ম (অঙ্গার) তৈল ও কণ্টক, এই গুলিই পুদ্গল দেহের বিশেষ উপকারী ও অপকারী ; আমাদের আয়ুর্ব্বেদ ঐ সকল পদার্থের তথ্য অনুসন্ধান ও তথ্য নির্ণয় করিবেন, পরাগকেশর গর্ভকেশর কি তাহা বলিবেন না।

লক্ষণ।

উদ্ভিদ্ কি ? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এক কথায়,অথবা "উদ্ভিদস্তরু গুল্মাদ্যাঃ" এই অত্যল্প কথায় সমাপ্ত হয় না, পর্য্যাপ্তও হয় না। ইহার উপর অন্যান্য কথাও বলিতে হয়, তবেই উহার স্বরূপ জানা যায় ও লক্ষণ নির্ণয় হয়।

"উদ্ভিদ্য ভূমিং নির্গচ্ছেদুদ্ভিদঃ স্থাবরস্তুসঃ।
নির্দ্দিষ্টঃ স্কন্ধ-বিটপ-পত্র-পুষ্প-ফলাদিভিঃ ॥" [বিশ্ব প্রপঞ্চসার।

পূর্ব্বোক্ত কথার সঙ্গে এ সকল কথা যোগ না করিলে উদ্ভিদের লক্ষণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কথাটীর বা বচনটীর অক্ষরার্থ এইরূপ,—যাহা ভুমির উদ্ভিদ, যাহা ভূমিভেদ করিয়া নির্গত হয়, যাহা ভৌম-বিকার বীজ করিয়া বা আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদ স্থাবর বলিয়া গণ্য এই স্থাবর নামক উদ্ভিদ স্কন্ধ, বিটপ, পত্র, পুষ্প ও ফল প্রভৃতির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ ইহা অমুক, উহা অমুক, উহা অমুক, ইত্যাদি প্রকার নির্ণীত বা শ্রেণীকৃত হইয়া আছে।

স্কন্ধ গুঁড়ি। বিটপ=শাখা, প্রশাখা। নির্যাস, রস, ও সার প্রভৃতি শব্দের দ্বারা উন্নয়ন করিবেন।

স্কন্ধ, বিটপ, পত্র, পুষ্প, ফল, নির্যাস, রস, সার, প্রভৃতির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়, এই সূচক কথায় অর্থ অনেক দূর যায়, অনেক দূর বিস্তৃত করা যায়। উদ্ভিজ্জের জাতি, শ্রেণী, নাম, লক্ষণ ইত্যাদি সমুদয় তথ্য বা সমুদয় বিভাগ ঐ অত্যল্প সংক্ষিপ্ত সূচক কথার তাৎপর্য্য মধ্যে আছে। উহার ছায়াই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি, ঐ গুলিই আয়ুর্ব্বেদীয় উদ্ভিদ্বিদ্যায় প্রতিপাদ্য; চরক মুনি ঐ গুলিকেই ঔষধোপ-যোগী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। (বচনটী পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার রাঘবভট্ট বলেন,—

"উদ্ভিদঃ স্থাবরা জ্ঞেয়াস্তৃণ-গুল্মাদি-রূপিণঃ।"

উদ্ভিদ্ এক প্রকার স্থাবর জীব, তাহারা তৃণ ও গুল্ম প্রভৃতি. বহুরূপে অবস্থিত।

রাঘবভট্ট তৃণাদি স্থাবর পদার্থকে জীব বলিলেন কেন? জীব বিশেষণে বিশেষিত করিলেন কেন? তাহাও এস্থলে ব্যক্ত করা আবশ্যক। হিন্দু পণ্ডিতেরা স্থাবর দ্বিবিধ, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া

থাকেন। এক সজীব স্থাবর, অপর নির্জীব স্থাবর; এবিভাগ বর্ণন করা অথবা এতদ্রূপ বিভাগের হেতু প্রদর্শন করা আয়ুর্ব্বেদীয় উদ্ভিদ্বিদ্যার অঙ্গ নহে, উহা প্রাণিবিদ্যারই অঙ্গ, সুতরাং এক্ষণে উক্ত বিভাগের কারণ বর্ণনা কি কোন বিষয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যাউক।

উদ্ভিদের উৎপত্তি।

উদ্ভিদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক অদ্ভুত শাস্ত্র কথা আছে। সে কথায় এখনকার নব্য পণ্ডিতগণের মতের একতা নাই। নব্য পণ্ডিতেরা বলেন, উদ্ভিদ্ বীজ অনাদি, অথবা উহাদের আদিম বীজ ঈশ্বর সৃষ্ট। সেই অনাদি প্রবাহাগত বীজ-পরম্পরা হইতে ক্রম পারম্পর্য্যে সেই সেই উদ্ভিদের জন্ম হইয়া আসিতেছে। ঈশ্বর-বাদী পণ্ডিতেরা বলেন, ঈশ্বর সৃষ্ট আদিম বীজ হইতে তাহার প্ররোহ সেই প্ররোহ হইতে পুনর্ব্বার বীজ, এতদ্রূপ ক্রম পারম্পর্য্য উদ্ভিদ্ সৃষ্টির প্রবাহ চলিতেছে। বীজ সংযোগ হইলনা, অথচ ভূমি হইতে উদ্ভিদজাতি জন্মিল, উদ্ভিদের অভিনব জন্ম হইল এরূপ হয়না। জলাশয়ের জল শুকাইল, অমনি তথায় উদ্ভিজ্জ জন্মিল, ইহা দেখিয়া মনে করিবেননা যে,তথায় সেই সেই উদ্ভিদের বীজ প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, এই বহমান বায়ুই তথায় অসংখ্য অসংখ্য উদ্ভিজ্জ বীজ বপন করিয়াছে, আনিয়া ফেলিয়াছে ইহাই মনে মনে করিবেন। পত্র রেণু, ত্বক্ ও ত্বকস্থিত রেণু, ফল ও ফলমধ্যগত সুক্ষ্মকণা সমস্তই যখন বীজ তখন আর উক্ত সিদ্ধান্তে সন্দেহ জন্মিবার কোন কারণ নাই। বহমান বায়ু বীজ রেণু মৃত্তিকোপরি নিক্ষিপ্ত না করিলে কোন ক্রমেই তথায় ঘাস প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ জাতির জন্ম হইতে পারিত না তাহার সেই অণুরূপ বীজ তোমরা দেখিতে পাওনা বলিয়াই আপনা আপনি ঘাস উদ্ভিজ্জ জন্মিয়াছে বলিয়াই অবধারণ করিয়া থাক; পরন্তু মাইক্রস্‌কোপ যন্ত্রের সাহায্যে সেই

সেই সূক্ষ্ম বীজ দৃষ্ট হইয়া থাকে কাজে কাজেই আমরা নির্বীজ সৃষ্টি নাই বলিয়াই অবধারণ করি। ইহার অকাট্য প্রমাণও আছে।

এইত গেল নব্য পণ্ডিতের মত; এক্ষণে পুরাতন ঋষিপণ্ডিতের মত কি? তাহা বলিতেছি, শুনুন।

পুরাতন ঋষিপণ্ডিতেরা বলেন যে, নির্বীজ সৃষ্টি অর্থাৎ অভিনব উদ্ভিজ্জ সৃষ্টি হয়। বীজ ব্যতীত [illegible] জন্মেনা নয়, পরন্তু কখন কখন ভৌম বিকারও উদ্ভিজ্জ সৃষ্টির বীজ হইয়া থাকে। তাহার প্রক্রিয়া এইরূপ।

"তত্র সিক্তা জলৈর্ভূমিরন্তরুষ্মবিপাচিতা।
বায়ুনা ব্যূহমানাতু বীজত্বং প্রতিপদ্যতে॥
তথা ব্যক্তানি বীজানি সংসিক্তান্যম্ভসা পুনঃ।
উচ্ছূনত্বং মৃদুত্বঞ্চ মূলভাবং প্রযান্তি চ॥
তন্মূলাদঙ্কুরোৎপত্তিরঙ্কুরাৎপর্ণসম্ভবঃ।
পর্ণাত্মকং ততঃ কাণ্ডং কাণ্ডাচ্চ প্রসবঃ পুনঃ॥"

বাসব ভট্ট।

জলক্লিন্ন ভূমি স্বাভ্যন্তরস্থ উষ্মার দ্বারা পচ্যমান হইলে, বিপাক প্রাপ্ত হইলে, সেই বিপাক জনিত বিকার বিশেষ যখন বায়ু কর্ত্তৃক ব্যূহমান অর্থাৎ সংগৃহীত বা সংঘাত ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা উদ্ভিজ্জ জন্মের বীজ অর্থাৎ মূল কারণ বা উপাদান হইয়া দাঁড়ায়। এই অব্যক্ত বীজ হইতে যে প্ররোহ জন্মায়, সেই প্ররোহ হইতে কখন কখন ব্যক্ত বীজের জন্ম হইয়া থাকে। ব্যক্ত বীজ হইতে প্ররোহ জন্মিবার প্রণালী প্রায় ঐ রূপ। ব্যক্ত বীজ সকল সংলিপ্ত অর্থাৎ জলক্লিন্ন হইলে প্রথমতঃ তাহা উচ্ছূন হয়, (ফুলিয়া উঠে) মৃদু বা কোমলত্ব প্রাপ্ত হয়, ক্রমে তাহা ভবিষ্যদঙ্কুরের মূল স্বরূপে পরিণত হয়। সেই মূল হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুরের পরিণামে পত্রাবয়ব, তাহা হইতে তাহার আত্মা বা দেহভাগ অর্থাৎ কাণ্ড (শাখা), এবং কাণ্ড হইলে তাহা হইতে প্রসব (পুষ্প প্রভৃতি) জন্মে এবং ক্রমেই জলক্লিন্ন ভূমি হইতে উদ্ভিজ্জ জাতির জন্ম হইয়া থাকে।

"স্বেদজঃ স্বিদ্যমানেভ্যো ভূবহ্ন্যম্ভঃ প্রজায়তে।
যুক-মৎকুণ-কীটাদ্যা যে চান্যে ক্ষণভঙ্গুরা ॥"

প্রপঞ্চসার ও বিশ্বসার নামক গ্রন্থে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ জীবের প্রভেদ বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে—

স্বিদ্যমান অর্থাৎ অন্তরুষ্মার দ্বারা বিপচ্যমান ভু, বহ্নি ও জল হইতে চুক, মৎকুণ ও বিবিধ কীট পতঙ্গ প্রভৃতি এবং অন্যান্য ক্ষণ ভঙ্গুর প্রাণী উৎপন্ন হইয়া থাকে *।

টীকাকার এই শ্লোকের এইরূপ বিস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যাহাই হউক, 'বায়ুনা ব্যূহামানাত্তু' এই পাঠের পরিবর্ত্তে যদি "*বায়ুনা বাহ্যমানাত্তু*" *পাঠ সত্য হয়,* ঋষির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত নব্য মতের সহিত পুরাতন আর্যমতের কিয়ৎ পরিমাণে ঐক্য হইলেও হইতে পারে। ফল, উদ্ভিজ্জ জাতির জন্ম যে প্রকারেই হউক, আয়ুর্ব্বেদ তাহার অনুসন্ধান করিবেন না। কি কারণে তিনি নিষ্ফল অনুসন্ধান করিবেন? করিয়া তাঁহার কি ফলোদয় হইবে ? যে প্রকারে হয় হইয়াছে, আমরা উহার উৎপত্তি দেখিবনা, উৎপন্ন উদ্ভিজ্জের ব্যবহারোপযোগী বিভাগ বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব যাহা আয়ুর্ব্বেদের নিতান্ত উপযোগী যাহার সহিত এই পুদ্গল দেহের ক্ষতি পূবক সম্বন্ধ অকাট্য সূত্রে বাঁধা আছে, আয়ুর্ব্বেদ কেবল তাহাই দেখিবেন।

ক্রমশঃ।

* আগুনে পোকা হয়, কথাটী বড় সহজ কথা নহে। আমরা জানিনা পরীক্ষার অযোগ্য কথা কতদূর সত্য তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

বায়ু কখন পচা গোবরে বীছার বীজ নিক্ষিপ্ত করেনা, তথাপি তাহাতে বীজ জন্মে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সিদ্ধান্ত। পচা গোবোরে যদি বীছার জন্ম হইতে পারে ত পচা মাটীতে ঘাস প্রভৃতি উদ্ভিদের জন্ম না হইবার পুষ্কল কারণ কি ?

ঔষধ-সূত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে যে হেতু-বিরোধী, ব্যাধি-বিরোধী এবং উভয়-বিরোধী ঔষধের উল্লেখ করা গিয়াছে, ঐ সমস্ত ঔষধ যথেচ্ছভাবে অর্থাৎ যে স্থলে যেমন ইচ্ছা হইল, তদনুসারে প্রয়োগ করিলেই চিকিৎসার সুফল ফলিতে পারে না। ইহাতে অনেক বিচার্য্য ও বিবেচ্য বিষয় আছে। ইহাদের প্রয়োগের স্থলসকলও ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সেই সকল বিষয় ও স্থল প্রণিধানপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করাই সুচিকিৎসকের কর্ত্তব্য। আজ কাল আমাদের দেশে যে ভাবে বৈদ্য চিকিৎসা চলিতেছে, অধিকাংশ বৈদ্য যে হিসাবে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহার আভ্যন্তরিক বিবরণ অনুসন্ধান করিলে হতশ্রদ্ধ হইতে হয়। শাস্ত্রের প্রকৃত আলোচনার অভাবে উহার গূঢ় অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য লুপ্ত হওয়ায় 'ঢেলামারা' চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পূর্ণ-বিজ্ঞানময় হইয়াও ব্যবহার দোষে প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিযোগী চিকিৎসকগণ অসার ও অপদার্থ বলিয়া উপহাস করিতেছেন, সুতরাং ইহা অপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? যতদিন দেশীয় চিকিৎসকগণ শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সম্মাননা না করিতেছেন, প্রকৃত ভাব কার্য্যে পরিণত না করিতেছেন, ততদিন উক্ত কলঙ্ক অপনোদনের পন্থা নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতগণ উক্ত ত্রিবিধ ঔষধ প্রয়োগের নিম্নলিখিত স্থল সকল নির্দ্দেশ করেন।

১ম হেতু-বিরোধী ঔষধের প্রয়োগস্থল।

রোগের হেতু অনেক প্রকার। সংক্ষেপে উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা,—বাহ্য হেতু ও আভ্যন্তর হেতু।

আহার, আচরণ, শীত, গ্রীষ্মপ্রভৃতিকে বাহ্য হেতু এবং কফ, পিত্ত, রস, রক্ত, মল, মূত্র প্রভৃতিকে আভ্যন্তর হেতু বলা যায়। কোনও রোগই হেতু বিনা উৎপন্ন হইতে পারে না। এবং হেতুসংঘটন হওয়া মাত্রই আভ্যন্তরিক ক্রিয়া-বিশেষ-ব্যতিরেকে কোন রোগই জন্মিতে পারে না। বীচিতরঙ্গন্যায়ে অনেক গুলি ক্রিয়ার অপেক্ষা করে। একটীর পরে আর একটী ক্রিয়া, তৎপরে অপর একটী ক্রিয়া, এইরূপ পরম্পরিত ও ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া জন্মাইয়া পরিণামে যে ক্রিয়া বা ফল প্রকাশ করে, তাহারই নাম রোগ। যে সমস্ত রোগ অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়, তাহাতেও প্রায় ইহার ব্যভিচার নাই। তবে শতপত্রবেধের ন্যায় অতি অল্প সময়েই উৎপন্ন হয়, বলিয়া সর্ব্বদা অনুভূত হয় না। ঐ সমস্ত ক্রিয়ার যথাক্রমিক নাম (১) সঞ্চয়, (২) প্রকোপ, (৩) প্রসর, (৪) স্থানসংশ্রয়, (৫) অভিব্যক্তি, এবং (৬) ভেদ। এই ক্রিয়া গুলিকে শরীরের এক একটী অবস্থা বলা যাইতে পারে ঐ সকল অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়। * অগাধ-মতি, সূক্ষ্মদর্শী আর্য্য ঋষিগণ ঐ সকল লক্ষণ

* যদিও সঞ্চয় প্রকোপ প্রসরপ্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ নিদানকাণ্ডে আলোচিত হইবে,তথাপি উহাদের সংক্ষিপ্ত অর্থ এস্থলে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কোন কারণ বশত শরীরে বায়ু পিত্ত প্রভৃতির অতিরিক্ত বৃদ্ধির নাম "সঞ্চয়" এবং ঐ সঞ্চিত বায়ু প্রভৃতি যৎকালে উদ্বেল বা প্রবলভাব ধারণ করে, সেই অবস্থাকে "প্রকোপ" বলা যায়, প্রকুপিত বায়ু প্রভৃতির স্বস্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমনের নাম "প্রসর" এবং স্থানান্তর আশ্রয় করিলে সেই অবস্থাকে "স্থানসংশ্রয়" বলে, স্থানসংশ্রিত বাত বা পিত্তপ্রভৃতি যৎকালে কোন রোগের ধর্ম্ম প্রকাশ করে, সেই অবস্থাকে "অভিব্যক্তি" এবং রোগের লক্ষণ প্রকাশ করার পরে বায়ু পিত্ত প্রভৃতির স্পষ্ট ধর্ম্ম প্রকাশ করার নাম "ভেদ" বলা যায়।

অবগতির জন্য যেরূপ গভীর গবেষণা ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় বিস্ময়রসে প্লাবিত ও ভক্তিভাবে বিগলিত হয়। সেই সকল লক্ষণ, লক্ষণসূত্রে এবং নিদানকাণ্ডে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে। তাঁহাদের চেষ্টা কেবল লক্ষণানুসন্ধান করিয়াই নিবৃত্ত হয় নাই, প্রত্যেক অবস্থার চিকিৎসারও বিধান করিয়াছেন। এক এক অবস্থার চিকিৎসাসময়কে এক এক কিচিৎসা-কাল বলে, তদনুসারে প্রথম চিকিৎসাকাল, দ্বিতীয় চিকিৎসাকাল ইত্যাদি সংজ্ঞা বৈদ্যশাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত দোষের সঞ্চয় হইতে স্থানসংশ্রয় পর্য্যন্ত এই চারিটী অবস্থায় অর্থাৎ যতদিন রোগ অভিব্যক্ত না হয়, পূর্ব্বরূপ অবস্থায় থাকে, কিংবা প্রবলাকার ধারণ না করে, তত দিন হেতুবিরোধী ঔষধই যুক্তিসম্মত। অপিচ যে স্থলে কারণের সহিত রোগের অবিনাভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ কারণের ধ্বংস হইলে, রোগেরও বিনাশ হইতে পারে, পক্ষান্তরে কারণের অবস্থিতিবশতঃ রোগের স্থায়িত্ব অনুভূত হয়, সেই স্থলে হেতুবিরোধী ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই কথা গুলি উদাহরণ দ্বারা নিম্নে বিশদ করা যাইতেছে।

১ম। মনে কর হিমসম্পর্ক, দধিসেবন বা এইরূপ কোন কারণবশতঃ কোন ব্যক্তির শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়াছে, ঐ সঞ্চিত শ্লেষ্মা প্রকোপপ্রভৃতি ক্রমোক্ত অবস্থান্তর সকল প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে কোন প্রকার রোগ উৎপাদন করিতে পারে, অথবা কোন প্রকার রোগের সূচনা করিয়াছে, এমন স্থলে বমন, লঙ্ঘন বা এইরূপ কফনাশক উপায় দ্বারা শ্লেষ্মনিঃসারণ বা শোষণ করা। এইরূপ প্রতীকার দ্বারা রোগের হেতু বা মূল কারণ বিনষ্ট হয়, সুতরাং রোগের ভবিষ্যদাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। মহর্ষি সুশ্রুত এইরূপ প্রতীকারের বিশেষরূপ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন,—

"সঞ্চয়ঞ্চ প্রকোপঞ্চ প্রসরং স্থান-সংশ্রয়ম্।
ব্যক্তিং ভেদঞ্চ যো বেত্তি দোষাণাং স ভবেদ্ভিষক্ ॥
সঞ্চয়েঽপহৃতা দোষা লভন্তে নোত্তরা গতীঃ।
তাস্তূত্তরাসু গতিষু ভবন্তি বলবত্তরাঃ ॥" সূত্রস্থান।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বায়ু, পিত্ত প্রভৃতির সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর, স্থানসংশ্রয়, ব্যক্তি ও ভেদের স্বরূপ ও লক্ষণ সুন্দর রূপে অবগত আছেন, এবং তৎসাময়িক প্রতিকারে সক্ষম, তিনি সুচিকিৎসক। যৎকালে শরীরে দোষের সঞ্চার হয়, সেই সময়েই উহা সমূলে বিনষ্ট হইলে আর উত্তরোত্তর গতি অর্থাৎ প্রকোপ, প্রসর প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। দোষ যত উত্তরোত্তর গতি (Degree) লাভ করে ততই তাহার প্রবলতা হয়, ফলতঃ দোষের সঞ্চার হওয়া মাত্র তাহার প্রতিবিধান করাই উত্তম কল্প। এইরূপ ক্রিয়ায় সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ভাবী রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

২য়। রোগের অপ্রবল অবস্থায় অর্থাৎ যত দিন সামান্যাকার লক্ষণ সকল প্রকাশ করে। বৈদ্যশাস্ত্রে যে অবস্থাকে বিশিষ্টপূর্ব্বরূপ বলে, সে অবস্থায়ও হেতুবিপরীত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু এই মত সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

৩য়। যে স্থলে হেতুর সহিত রোগের অবিনাভাব সম্পর্ক সে স্থলে হেতুবিপরীত ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক। মনে কর যেমন কৃমি বা মলসঞ্চয়বশতঃ উদরে বেদনা জন্মিয়াছে, এমন স্থলে বেদনানিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ কোন উপকার-লাভের প্রত্যাশা নাই, যাহাতে বেদনার কারণীভূত ক্রিমি বা মল নিঃসারিত হয়, তদনুরূপ ঔষধের প্রয়োগ করিতে হইবে।

৪র্থ। কেহ কেহ রোগের হেতুত্যাগকেও হেতুবিরোধী চিকিৎসা বা ঔষধের মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। কেননা নৈদানি

কেরা বলেন "যেসকল আহার ও আচরণাদি রোগের নিদান তৎসমুদয় পরিত্যক্ত না হইলে রোগের উপশম হয় না। কারণ ঐরূপ আহার বিহারাদি দ্বারা দোষের বলবৃদ্ধি হয়, দোষ, বল পাইয়া রোগের বলবৃদ্ধি করে অথবা আরোগ্যের প্রতিবন্ধকতা জন্মায়।

এমন স্থলে ঔষধ দেওয়া না দেওয়া তুল্য। এজন্য অনেক রোগী সুবিজ্ঞ বৈদ্যকর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়াও এক মাত্র নিদান-সেবনের দোষে আরোগ্যলাভে বঞ্চিত হয়েন। অতএব আহার,আচরণ প্রভৃতি যে প্রকার নিদানই কেন না হউক প্রথমতঃ তৎসমুদায় পরিত্যাগ করা আরোগ্যার্থী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে কেবল নিদান পরিত্যাগ করিয়াও অনেক ব্যক্তিকে রোগ হইতে মুক্তি পাইতে দেখা যায়। এজন্য আয়ুর্ব্বেদের পণ্ডিতেরা নিদান পরিত্যাগকে এক প্রকার চিকিৎসা বলিয়াছেন। নিদান পরিত্যাগের প্রসিদ্ধ নাম নিদানপরিবর্জ্জন। আয়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসার প্রারম্ভে নিদান পরিবর্জ্জন রূপ চিকিৎসার উপদেশ করিয়া থাকেন।" পরন্তু এই মতটী হেতুবিপরীত বলিয়া সকলে স্বীকার করেন না।

ব্যাধি-বিপরীত ঔষধপ্রয়োগের স্থল।

রোগের অভিব্যক্ত বা প্রস্ফুট অবস্থায় ব্যাধি-বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এমন অনেক গুলি ঔষধ দ্রব্য আছে, রোগ যে কারণেই কেন উপস্থিত না হউক, সেই সমস্ত ঔষধ প্রভাবজশক্তিবশতঃ কারণনির্ব্বিশেষে রোগপ্রতীকারে সক্ষম অর্থাৎ রোগ, বায়ু পিত্ত বা যে কোন হেতুতেই কেন উৎপন্ন না হউক তৎপ্রতি ঔষধের লক্ষ্য থাকে না, কেবল রোগ প্রশমনের প্রতিই ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইংরাজী ভাষা ঐ সমস্ত পৃথক পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট শক্তিসম্পন্ন ঔষধকে স্পেসিফিক্ মেডিসিন (Specific Medicine) বলা যাইতে পারে। এরূপ ঔষধের সংখ্যা অতি অল্প।

পরন্তু এপ্রকার ঔষধপ্রয়োগ করিতে চিকিৎসকের চিন্তা এবং শ্রমের লাঘব বলিয়া লোকহিতৈষী ঋষিগণ উহাদের অনুসন্ধানে সমধিক যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন,এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ তাঁহাদের ফার্মাকোপিয়া-গ্রন্থে যেমন ক্রিয়ানুসারে অল্‌টারেটিব পারগেটিভ্ (Alterative, Purgative) ইত্যাদি শ্রেণীভেদে ঔষধ সমূহের বিভাগ করিয়া থাকেন, আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতগণও তেমন দাহনাশক, শীতনাশক ইত্যাদি ভেদে ঔষধের শ্রেণীভাগ করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য ঐরূপ শ্রেণীবদ্ধ ঔষধগুলি উদ্ধৃত হইল। কেহ কেহ বলেন, যখন হেতুবিপরীত ঔষধ কার্য্যকারী না হয় অর্থাৎ ব্যর্থ হয়, সেই সময়েই ব্যাধিবিপরীত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

১। বমন-নিবারক—জামের পল্লব,আম্রপল্লব,ছোলঙ্গনেবু,টককুল, দাড়িম, যব, যষ্টিমধু, বেনারমূল, সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা, খৈ।

২। তৃষ্ণা-নাশক—শুঁঠ, দুরালভা, মুথা, ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, চিরতা; গুলঞ্চ, পাথরকুচি, ধনে, পল্‌তা।

৩। হিক্কা-নাশক—শঠী, পুস্করমূল,কুলের আঁঠী, কণ্টকারী,ব্যাকুড়, বন্দা,হরীতকী,পিপুল, দুরালভা,কাকড়াশৃঙ্গী।

৪। মল-রোধক—প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, আমের কেশী, শোনা, লোধ, মোচরস, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, বামন-হাটী; পদ্মকেশর।

৫। মূত্র-রোধক—জাম, আম্র, পাকুড়, বট, আমড়া, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, ভেলা, অম্ললোটক, খদির।

৬। মূত্র-কারক—বন্দা, গোক্ষুর, বক, হুড়্‌হুড়ে, পাথরচুন, কুশের মূল, শরের মূল, কাশের মূল, গুড়ুচীর মূল, ইকড়ের মূল।

৭। কাসনাশক—কিস্‌মিস্, হরীতকী, আমলকী, পিপুল, দুরালভা, কাকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী, শ্বেত পুনর্ণবা, রক্ত পুনর্ণবা, ভুঁই আমলা।

৮। শ্বাসনাশক—শটী, পুষ্করমূল, কৈকুল, এলাচী, হিঙ্গ, অগুরুচন্দন, তুলসী, ভুঁই আমলা, জীবন্তী, চোরপুষ্পী।

৯। শোথনাশক—পারুল, গনিয়ারি, বিল্ব, শ্যোনা, গাম্ভারী, কণ্টকারী, ব্যাকুড়, শালপাণি, চাকুলে, গোক্ষুর।

১০। জ্বরনাশক—অনন্তমূল, শর্করা, আকনদ, মঞ্জিষ্ঠা, কিস্‌মিস্, পীলু, ফলসাফল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া।

১১। দাহনাশক—খৈ, চন্দন, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, শর্করা, নীলোৎপল, বেনারমূল, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, পাথরকুচি।

১২। শীতনাশক—তগরপাদুকা, অগুরুচন্দন, ধনিয়া, শুঁঠ, যমানী, বচ, কণ্টকারী, গণিয়ারী, শ্যোনা, পিপুল।

১৩। উদর্দ্ধনাশক—গাব, পিয়াল, বদর, খদির, বিট্‌খদির, ছাতিম, শাল, অর্জ্জুন, পীতশাল, গুইয়াবাব্‌লা।

১৪। অঙ্গবেদনানাশক—শালপাণি, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, এরণ্ড, কাকলা, চন্দন, বেনারমূল, এলাচী যষ্টিমধু।

১৫। শূলনাশক—পিপুল, পিপুলের মূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, জোয়ান, ফোকান্দী জোয়ান, কৃষ্ণজীরা, শালঞ্চীশাক।

১৬। তৃপ্তিনাশক—শুঁঠ, চিতা, চৈ, বিড়ঙ্গ, সূচীমুখী, গুলঞ্চ, বচ, মুত, পিপুল, পটোল।

১৬। তৃপ্তি এক প্রকার শ্লেষ্মজ রোগ, এই রোগে আহার না করিলেও রোগী আহার করার ন্যায় বোধ করে

১৭। অর্শোনাশক—কুটজ, বেল, চিতা, শুঁঠ, আতিষ, হরীতকী, দুরালভা, দারুহরিদ্রা, বচ, চৈ।

১৮। কুষ্ঠনাশক—খদির, হরীতকী, আমলকী, হরিদ্রা, ভেলা, ছাতিম, সোঁদাল, করবীর, বিড়ঙ্গ, জাতিপল্লব।

১৯। কণ্ডুনাশক—চন্দন, জটামাংসী, সোঁদাল, করঞ্জ, নিম, কুটজ, সর্ষপ, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা, মুতা।

২০। ক্রিমিনাশক—সজনা, মরিচ, শালিঞ্চী, কেঁউ, বিড়ঙ্গ, নিসিন্দা, কড়ভী, গোক্ষুর, বৃষকর্ণী, ইন্দুরকানী।

২১। বিষনাশক—হরিদ্রা, মাঞ্জিষ্ঠা, হাপরমালি, ছোটএলাচী, শ্যামলতা, চন্দন, নির্ম্মলীফল, শিরীষ, কুড়, নিশিন্দা।

২২। জীবনীয়—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু।

২৩। বৃংহণীয়—ক্ষীরলতা, দুগ্ধিকাবৃক্ষ, বেড়েলা, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, বন-কার্পাসী, ভুঁইকুমড়া, বিস্তারক।

২৪। লেখনীয়—মুত, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, আতিষ, কটুকী, চিতা, করঞ্জ, শ্বেতবচ।

২২। জীবনীয়প্রভৃতি বৈদ্যকসংজ্ঞা। এই সকল সংজ্ঞা স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত ও সংক্ষিপ্ত বলিয়া আমরা অবিকল গ্রহণ করিলাম। ভবিষ্যতে ও প্রয়োজনানুসারে আমরা ঐ সমস্ত সংজ্ঞাই ব্যবহার করিব। আমরা সংজ্ঞাগুলির যে স্থলে যেরূপ অর্থ বলিব। তাহা পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন। যে সমস্ত দ্রব্যে বা ক্রিয়ায় জীবনীশক্তি বা আয়ুষ্যক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া জীবনের আনুকূল্য সম্পাদন করে, তাহাদের নাম জীবনীয়।

২৩। যে সমস্ত দ্রব্যে বা ক্রিয়ায় শরীরের রসরক্তাদি বৃদ্ধি করিয়া পুষ্টি সাধন করে, তাহাদের নাম বৃংহণীয়।

২৪। ঘর্ষণ দ্বারা ঈষৎ চর্ম্ম উত্তোলন বা বিদারণের নাম লেখন। এই ক্রিয়ার উপযোগী দ্রব্যকে লেখনীয় বলে।

২৫। ভেদক—তেয়ড়ী, আকন্দ, (শ্বেত ও রক্ত) এরণ্ড, ভেলা, দন্তী, চিতা, করঞ্জ, শংখপুষ্পী, কটুকী স্বর্ণক্ষীরী।

২৬। সন্ধানীয়—যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, আকনদ্, চাকুলে, বরাহক্রান্তা, মোচরস, ধাইফুল, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, কটফল।

২৭। দীপনীয়—পিপুল, পিপুলের মূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, ভেলার আঁঠি, থৈকুড়, মরিচ, যমানী, হিঙ্গ।

২৮। বলকারক—গোরক্ষকর্কটী, শূকশিম্বী, শতমূলী, ভুঁইকুমড়া, অশ্বগন্ধা, শালপানি, কটুকী, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, মাষাণী।

২৯। বর্ণকারক—চন্দন, বকম, পদ্মকাষ্ঠ, বেনারমূল, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, শর্করা, মঞ্জিষ্ঠা, ভুঁইকুমড়া

৩০। কণ্ঠ্য—অনন্তমূল, ইক্ষুমূল, যষ্টিমধু, পিপুল, কিস্‌মিস্, ভুঁইকুমড়া, কটফল, থুলকুড়ী, ব্যাকুড়, কণ্টকারী।

৩১। হৃদ্য—আম্র, আমড়া, ডহু, করমর্দ্দ, সেকুল, অম্লবেতস, বড়বদর, ছোট বদর, দাড়িম, ছোলঙ্গনেবু।

৩২। স্তন্যজনক—বেনারমূল, শালিধান্য, ষেটেধান, তালমাখনা, উলুরমূল, কুশেরমূল, কেশের মূল, ইকড়ের মূল, গুলঞ্চ, গন্ধতৃণ।

৩৩। স্তন্যশোধক—আকনদ্, শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, সূচীমুখী, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরতা, কটুকী, অনন্তমূল।

২৬। যে সমস্ত দ্রব্যে বা ক্রিয়ায় ভগ্নস্থান সন্ধান অর্থাৎ সংযোজন করিতে পারে, তাহাদের নাম সন্ধানীয়।

২৭। যে সমস্ত দ্রব্য বা ক্রিয়ায় অগ্নির দীপ্তি সম্পাদন অর্থাৎ পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, তাহাদিগকে দীপনীয় বলে।

৩৪। শুক্রজনক—জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, মেদ, বন্দা, জটামাংসী, কাকড়াশৃঙ্গী।

৩৫। শুক্রশোধক—কুড়, এলবালুকা, কট্‌ফল, সমুদ্রফেণা, কদম্বের আঁঠা, ইক্ষু, কোকিলক্ষ, ক্ষুরক, বকপুষ্প, বেনারমূল।

৩৬। স্নেহোপগ—কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, মেদ, ভূঁইকুমড়া, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, জীবক, জীবন্তী, শালপাণি।

৩৭। স্বেদোপগ—সজিনা, এরণ্ড, আকন্দ, শ্বেতপুনর্ণবা, রক্ত পুনর্ণবা, যব, তিল, কুলথকলাই, মাষকলাই, বদর।

৩৮। বমনোপগ—মধু, যষ্টিমধু, রক্তকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চন, কদম্ব, হিজল, তেলাকুচ, ঘণ্টারবা, আকন্দ, প্রত্যক্ পুষ্পী (আপাঙ্গ)।

৩৯। বিরেচনোপগ—কিস্‌মিস্ গাম্ভারী, ফল্গুসা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বড় বদর, ছোট বদর, শেয়াকুল, পীলু।

৪০। আস্থাপনোপগ—তেয়ড়ী, বেল, পিপুল, কুড়, সর্ষপ, বচ, ইন্দ্রযব, শলুফা, মদনফল, যষ্টিমধু।

ক্রমশঃ।

৩৬। ঘৃত তৈলপ্রভৃতি পদার্থ শরীরের স্নিগ্ধতা কারক। যে সকল দ্রব্য ঘৃতাদির সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিলে উহাদের স্নেহণী-শক্তির সহায়তা বা বৃদ্ধি করে তাহাদের নাম স্নেহোপগ। স্বেদোপগ বমনোপগ বিরেচনোপগ এবং আস্থাপনোপগ শব্দের ও এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। কাথ পভৃতি দ্বারা পিচ্‌কারি দেওয়ার নাম আস্থাপন।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আমরা সুশ্রুত-সংহিতা ১ম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা ডল্ল-নাচার্য্য প্রণীত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার কবিভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতি খণ্ড ছয় ফর্ম্মা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। সংস্কৃতভাগ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে।

সুশ্রুত-সংহিতা কি? তাহা ভারতবাসীর অতি অল্পলোকেরই জানিবার অবশিষ্ট আছে। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, শস্ত্রচিকিৎসক সম্প্রদায়ের গুরু ধন্বন্তরি সুশ্রুতপ্রমুখ যে সমুদায় শিষ্যকে শল্যতন্ত্রপ্রধান আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাদের সকলেই এক এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু ভারতের ভাগ্য লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানের সহিত উক্ত গ্রন্থ গুলিরও অধি-কাংশ অন্তর্হিত হইয়াছে। কেবল সুশ্রুত নামধের এই সুপ্রাচীন সংহিতা খানিই তদানীন্তন শস্ত্রচিকিৎসা বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে। সুতরাং সুশ্রুত যে ভারত বাসীর অতিশয় আদরের এবং গৌরবের সামগ্রী, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গীয় মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় মূল সুশ্রুত-সংহিতার সর্ব্ব প্রথম মুদ্রাঙ্কন করেন। আজি আমরা যে সুশ্রুত গ্রন্থের এরূপ সুপ্রাপ্যতা অনুভব করিতেছি, পণ্ডিত মধুসূদনই ইহার নিদান। পণ্ডিত মধুসূদন ইহার মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে ঈদৃশ যত্ন এবং সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন যে, গ্রন্থখানি প্রথম বারেই অধিকাংশ বিশুদ্ধ রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। সংস্কৃত হস্তলিখিত পুস্তকগুলির যেরূপ পাঠের বিভিন্নতা দেখা যায়, তাহাতে কোন একখানি গ্রন্থ বিশুদ্ধ রূপে মুদ্রাঙ্কণ করা যে কিরূপ দুরূহ, তাহা সংস্কৃতগ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণকারী

ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। এই অসাধারণ অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের জন্য আমরা সেই স্বর্গীয় মূর্ত্তির উদ্দেশে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রমাণ করিতেছি। অতঃপর শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র বসাক এবং শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার মুদ্রাঙ্কন করেন, এবং শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। অপিচ কুমিল্লা হইতে শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ও মূল, ডল্লনার্য্যপ্রণীত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত সুশ্রুতসংহিতা মুদ্রাঙ্কন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু বোধহয়, দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ তিনি উহা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অধুনা কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং কবিরাজ চন্দ্রকুমার দাস মহাশয় পুনরায় ডল্লনপ্রণীত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত সুশ্রুতসংহিতা মুদ্রাঙ্কণ করিতে প্রবর্ত্তমান হইয়াছেন। আমরা একান্ত মনে প্রার্থনা করি, ইহাঁদের এই সাধু উদ্যম সুসম্পন্ন হউক। ইহাঁদের এই উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের জন্য ইহাঁদিগকে ধন্যবাদ!

অতঃপর প্রাপ্ত পুস্তকখানির সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহাই বিবৃত করা যাইতেছে।

আমরা আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনীর অবতরণিকায়ই বলিয়াছি যে, "ভাষার পুষ্টি ও শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনার্থে বহুলগ্রন্থের প্রচার যেমন আবশ্যক, কতকগুলি অকর্ম্মণ্য ও অসার পুস্তক দ্বারা সরস্বতী-ভাণ্ডার কলঙ্কিত না হয় এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও বিজ্ঞমণ্ডলীর তেমন আবশ্যক, এই সাধু অভিপ্রায়েই অনেক কাল হইতে সমালোচন প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। সমালোচন গ্রন্থের পরীক্ষাগ্নিস্বরূপ, গুণ দোষের দর্পণস্বরূপ, শাস্ত্ররত্নের শাণযন্ত্রস্বরূপ, এবং জ্ঞানের রসায়ন স্বরূপ। ইহা দ্বারা পণ্ডিতগণ উৎসাহিত হইয়া নূতন চিন্তায় নিমগ্ন, নূতন আবিষ্কারে উদ্দীপিত এবং নূতনসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হয়েন, মূর্খ-দেরও অজ্ঞানতিমির তিরোহিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট সাধন

পক্ষে সমালোচনও একটী উৎকৃষ্ট উপায়।" অতএব ছাত্র কিম্বা পুত্রের বাৎসল্য, বন্ধু কিম্বা আত্মীয়ের অনুরোধ এবং পিতা কিম্বা গুরুর আদেশে সঞ্জীবনী ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করিবেনা। আপন জ্ঞানে সদসৎ যাহা বুঝিবে, সাধারণকে তাহা বুঝাইবে। সুতরাং কর্ত্তব্যের অনুরোধে সমালোচনাপ্রসঙ্গে অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে হইলেও কেহ দুঃখিত না হয়েন, ইহাই সঞ্জীবনীর সানুজয় প্রার্থনা।

পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত মহোদয়ের মুদ্রাঙ্কনের পর এপর্য্যন্ত সুশ্রুত-সংহিতার যে কয়েক খানি মূল মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার একখানিরও মুলের কোন প্রকার উন্নতি হয় নাই। আমাদের আশা ছিল, বর্ত্তমান মুদ্রাঙ্কণে, তদ্বিষয়ের উন্নতি দেখিয়া সুখী হইব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান মুদ্রণে ২।৪টী বর্ণ বিপর্য্যয় দ্বারা অশুদ্ধির ভাগ বৃদ্ধি করা ভিন্ন অন্য কিছুরই উন্নতি হয় নাই। ডল্লন প্রণীত বিশুদ্ধটীকা নিরতিশয় দুর্লভ; সুতরাং টীকায় যে সমুদায় ভ্রম প্রমাদ রহিয়াছে, তজ্জন্য কোন প্রকার দোষারোপ করা যাইতে পারে না। বরং কাগজ উৎকৃষ্ট, মুদ্রাঙ্কণও পরিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশকগণ ধন্যবাদার্হ।

বঙ্গানুবাদ অতিঅল্পই হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা স্থানে স্থানে প্রাঞ্জল এবং সুললিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি।

"তদল্পমপি নোপেক্ষ্যং শাস্ত্রে দুষ্টং কথঞ্চন।
কিং বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগং॥"

"অর্থাৎ শাস্ত্রের অল্পপরিমাণ দোষও উপেক্ষার যোগ্য নহে, যেহেতু, অতিসুন্দর দেহও একটীমাত্র শ্বিত্রে অপবিত্র ও অপ্রীতিকর হয়। স্থানে স্থানে অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল হইলেও এই ২।৪ পৃষ্ঠায়ই অনুবাদক মধ্যে মধ্যে সুমহৎ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা উহার ২।১ মাত্র স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

"উক্ত আহারদ্রব্যও ঔষধমধ্যে পরিগণিত। ঐ আহারীয়দ্রব্য

স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দুই প্রকার; স্থাবর আবার চতুর্ব্বিধ, যথা, বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ ও ওষধি।

বনস্পতি—যাহাদের কেবল ফল হয়, পুষ্প হয় না, তাহাদিকে বনস্পতি কহে। যেমন বট, অশ্বত্থ, উডুম্বর, (যজ্ঞডুম্বুর) প্রভৃতি।

বৃক্ষ—যাহাদের পুষ্প হইতে ফল হয় তাহাদিগকে বৃক্ষ কহে। যেমন আম্র, জম্বু, (জাম) তিন্তিড়ী (তেঁতুল) ইত্যাদি।

বিরুধ—যাহারা একত্রীকৃত তৃণগুচ্ছের ন্যায় শাখা পল্লব বিশিষ্ট এবং খর্ব্বাকার, তাহাদিগকে বিরুধ বা গুল্ম বলে।

ওষধি—ফল পরিপক্ক হওয়া পর্য্যন্ত যাহারা বাচিয়া থাকে, তাহাদিগকে ওষধি কহে। যথা কদলী, ধান্য ইত্যাদি।

জঙ্গম প্রাণীও উৎপত্তি ভেদে চতুর্ব্বিধ; যথা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ্জ। তন্মধ্যে মনুষ্য, পশু, প্রভৃতি জরায়ুজ, পক্ষী মৎস্য প্রভৃতি অণ্ডজ; এবং বস্ত্র পচিলে, তাহা হইতে যে কীট জন্মে তাহাদিগকে স্বেদজ কহে। যথা মশা, মাছি, চর্ম্ম, কীট ইত্যাদি। আর যে সমস্ত প্রাণী মৃত্তিকা মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে, তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ প্রাণী বলে। যথা মহীলতা, (কেঁচুয়া), ইন্দ্রগোপকীট প্রভৃতি।

এতদ্দ্বারা কি বুঝা যাইতেছে? সুশ্রুতাচার্য্য বট অশ্বত্থ হইতে মশা, মাছি, চর্ম্মকীট প্রভৃতি পর্য্যন্ত সমুদায়ই আহারীয় দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত করিয়া উহার বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু ইহা একান্ত অসম্ভব এবং আচার্য্যের অভিপ্রায়ের একান্ত বিরুদ্ধ। এই স্থানের চক্রপাণির ব্যাখ্যা দেখিলেই তাহা সুস্পষ্ট অনুভূত হইবে। চক্রপাণি বলেন,

"ইদানীমুক্তসংশোধনাদৌ স্থাবরাদিভেদেন ঔষধদ্রব্যং নির্দ্দিষ্টং আহারস্যৈব প্রধান্যখ্যাপনার্থমাহ প্রাণিনামিত্যাদি।"

তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে যে সংশোধন ও সংশমনের কথা বলা

হইয়াছে, উক্ত সংশোধনাদি ঔষধ স্থাবরাদিভেদে নির্দ্দেশ করিয়া আহারের প্রধান্যখ্যাপনের অভিপ্রায়েই প্রাণিনামিত্যাদি পাঠের অবতারণা হইয়াছে।

সুতরাং চক্রপাণির ব্যাখ্যা ও আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভৃতি অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, বট, অশ্বত্থ, মশা, মাছি, প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ আহারীয় দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা আচার্য্যের অভিপ্রায় নহে।

অনুবাদক আর এক স্থলে বলিয়াছেন, "সেই স্থাবর এবং জঙ্গমে অগ্নি ও সোম গুণ অধিক আছে বলিয়া, স্থাবর আগ্নেয় ও জঙ্গম সৌম্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে"।

জগতের যাবতীয় স্থাবর পদার্থ আগ্নেয়, এবং যাবতীয় জঙ্গম পদার্থ সৌম্য বলিয়া, নির্দ্দেশ করা আয়ুর্ব্বেদপাঠীর কথা দূরে থাকুক, একজন সাধারণ লোকের পক্ষেও সম্ভব নহে। বস্তুতঃ পদার্থসমূহকে সোমগুণের আধিক্য বশতঃ সৌম্য এবং অগ্নিগুণের আধিক্য বশতঃ আগ্নেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা এস্থলে আচার্য্যের অভিপ্রেত। স্থাবর আগ্নেয়, জঙ্গম সৌম্য বলিয়া অভিহিত করা সংহিতার তাৎপর্য্য নহে।

এতদ্ভিন্ন মূলের অর্থ প্রতিপাদনের জন্য অনুবাদক স্থানে স্থানে যে টিপ্পনী করিয়াছেন, অনেক স্থলে তাহাতে প্রকৃত তাৎপর্য্যের ব্যাঘাত করা হইয়াছে। অপিচ অনুবাদক গণের কোন কোন টিপ্পনী অন্যদীয় পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াও তাহার নামাদি উল্লেখ না করা সুসঙ্গত হয় নাই।

যাহাহউক, এই অত্যল্প অংশেই অনুবাদকগণ যেরূপ ভ্রম প্রমাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র সংহিতার পরিণাম চিন্তা করিয়া আমরা একান্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়াছি। আয়ুর্ব্বেদের বঙ্গানুবাদের দোষে এদেশের যে কিরূপ অনিষ্টাপাত হইতেছে,

তাহা আমরা চতুর্থ খণ্ডে আয়ুর্ব্বেদানুবাদ শীর্ষক প্রস্তাবে দেখাইয়াছি। যে শাস্ত্রের সহিত জীবন মরণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহার অনুবাদ কার্য্যে অনুবাদকগণ বাল্যক্রীড়া না করিয়া যাহাতে বিশুদ্ধরূপে অনুবাদ কার্য্য সমাহিত হয়, তাহাই সম্পাদন করিয়া সুখী করিবেন।

অতঃপর আমরা সমালোচ্য গ্রন্থের উৎসর্গপত্র সম্বন্ধে ২।১ টী কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব। অনুবাদক মহাশয়েরা আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনীর তত্ত্বাবধারক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিয়া গ্রন্থখানিকে সম্মানিত করিয়াছেন, তৎপক্ষে সংশয় নাই। কিন্তু উৎসর্গ পত্রে তাঁহার সাহায্যে গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইতেছে এরূপ বৃথা পরিচয় প্রদান করা ন্যায় বহির্ভূত হইয়াছে। আমরা বিশেষ জানি, ইহার সম্পাদন বিষয়ে তাঁহার কোন সাহায্য বা সহানুভূতি নাই। তাদৃশ সুপণ্ডিত ব্যক্তির সাহায্য থাকিলে যে, গ্রন্থের এরূপ পরিণাম সংঘটন হইত না, ইহা পরিচিত ব্যক্তি মাত্রকেই বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, অনুবাদক দ্বয় এজন্য ক্রটী স্বীকার করিবেন।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

শ্রীহৃদয়নাথ তর্করত্ন- কবিরাজ রামকৃষ্ণ বাগছির লেন ১৭ নং বাটী বিডনষ্ট্রীটঃ—তাঁহার মতে কবিরাজ অবিনাশ চন্দ্র কবিরত্ন এবং চন্দ্রকুমার কবিভূষণ যে সুশ্রুত সংহিতা অনুবাদ করিয়াছেন তাহা ভ্রমপূর্ণ এবং তাহাদের সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ অধিকার তাহাতে তাহাদের দ্বারা উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। তর্করত্ন মহাশয় যে কএকটী ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার সারাংশ পত্র পাইবার পূর্ব্বেই আমরা সমালোচন স্তম্ভে প্রকাশ করিয়াছি। পত্রখানিদীর্ঘঃ এবং কটাক্ষপূর্ণ বলিয়া আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

কালতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইতি পূর্ব্বে ব্যক্ত করা হইয়াছে কাল স্বতন্ত্র কোন দ্রব্য পদার্থ নহে, সূর্য্যের গতি-ক্রিয়াবিশেষই "কাল"; অতএব জাগতিক জৈবিক অজৈবিক পদার্থ নিচয়ের আশ্চর্য্য কালিক পরিবর্ত্তন এবং সাময়িক শীতোষ্ণাদির অনুভব যে সূর্য্যের গমনানুযায়ী কিরণ-সম্পাতের অধীন তাহা বলা বাহুল্য। লোক-লোচন প্রভাকর খগোলদ্বয়ের যে গোলে বিচরণ পূর্ব্বক ধরণী-পৃষ্ঠে যে নিয়মে কর প্রদান করেন, ধরাশ্রিত জীবাজীব নিচয়ও তদনুসারে শীতোষ্ণাদি ফল ভোগ করিবে।

অপিচ এই বাহ্য সন্তাপের অনুগ্রহে মনুষ্য প্রভৃতি জীবাজীবের অভ্যন্তর হইতে পৃথিবীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত অপনীত তাপাংশ সকল পরিপূর্ণ হইয়া যথানিয়মে ভৌতিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

এই হেতু প্রাকৃতিক গতির অন্তস্তলানুসন্ধিৎসু আয়ুর্ব্বেদিকগণ দিনকরের কিরণ-পাতানুসারে সময়ে সময়ে মানবীয় প্রকৃতির এবং পার্থিব স্থাবর অস্থাবর বস্তুর ও ভৌতিক জল, বায়ু প্রভৃতির গুণ-গত এবং আকৃতি গত অবস্থার পরিবর্ত্তন দর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সম্বৎসর নামা খণ্ড কালের অয়ন, ঋতু, ঋতুসন্ধি প্রভৃতি ভেদ-কল্পনা করিয়াছেন। এবং তদ্দ্বারা মনুষ্য সমাজের শারীরিক মানসিক সুখস্বচ্ছন্দে আহার, বিহার, এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ীদিগের ঔষধ দ্রব্য আহরণ, ঔষধ-প্রস্তুতি-বিধান, আময়িক প্রয়োগ এবং দোষাদির দৈনিক অংশাংশ বিভাগ দ্বারা আময়িক অবস্থা বিজ্ঞান প্রভৃতির অতি উপাদেয় উপদেশ সকল যেরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন তদ্বিস্তারিত প্রকাশ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।*

আমরা প্রথম হইতেই প্রকাশ করিতেছি যে আয়ুর্ব্বেদিক সম্প্রদায়ের

পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলা হইয়াছে ত্রিংশৎ দিবসে একমাস, বা এক রাশি, দ্বাদশ মাসে বা দ্বাদশ রাশিতে একসম্বৎসর। এই বৎসরগণনা বৈশাখ মাস বা মেষ রাশি হইতে আরব্ধ হইয়া চৈত্রমাস বা মীন রাশি পর্য্যন্ত গণনায় বৎসর সম্পূর্ণ হয়। এই বৈশাখাদি দ্বাদশমাসের নামকরণ নক্ষত্রের নামানুসারে হইয়াছে অতিপ্রাচীন কালে চন্দ্রের গতি লক্ষ করিয়াই খাগোলিক গণনা সম্পন্ন হইত, যে সময়ে বিশাখা-নক্ষত্র যুক্ত পূর্ণিমা হইবে ঐ সময়কে বৈশাখ মাস নাম দেওয়া হইয়াছে। এই মাস গণনা, কৃষ্ণাপ্রতিপদ্ হইতে আরব্ধ হইয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ত্রিংশৎ দিবস পূর্ণ করিতে হইবে। এই কারণে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড যাহা প্রচলিত, সকলই তিথি-ঘটিত, তৎপর-বর্ত্তি কালের জ্যোতির্ব্বিদ্গণ বিজ্ঞান-নেত্র দ্বারা যে সময়ে সূর্য্যের গতি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নাক্ষত্রিক রাশি চক্রের উপরিভাগে বিপরীত ক্রমে সূর্য্যকে ভ্রমণ করিতে দেখিলেন ঐ সময় হইতে সৌরমাস এবং মেষাদি দ্বাদশ রাশি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সূর্য্যের এই দ্বাদশ রাশি ভ্রমণকাল সৌর সংবৎসর।

পৃথিবীর মধ্যস্থান কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে যে একটি রেখা কল্পিত হইয়াছে ঐ রেখার নাম বিষুব রেখা বা নিরক্ষবৃত্ত *। এই বিষুব রেখা এবং ক্রান্তি বলয়ের (সূর্য্যের ভ্রমণ পথের) পরস্পর সমসূত্রে উপর্য্যুপরি স্থিতির নাম ক্রান্তিপাত † প্রোক্ত মিলন বৎসরে

কালতত্ব জ্ঞাত হওয়া অতীব প্রয়োজনীয় কিন্তু বলা বাহুল্য যে গণিত জ্যোতিষে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সূর্য্যের গতি বোধেও অনভিজ্ঞ, পরন্তু অস্মদ্দেশীয় আয়ুর্ব্বেদ্সম্প্রদায় মধ্যে অনেকেই গণিত জ্যোতিষে অনভিজ্ঞ অতএব প্রথমতঃ আমরা সূর্য্যের গতির বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া কথঞ্চিৎ বাহুল্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

* "সম রাত্রিন্দিবেকালে বিষুবদ্বিষুবঞ্চতৎ।" অমর সিংহ।

† "বিষুবৎক্রান্তি বলয়য়োঃ সুসম্পাতঃ ক্রান্তিপাতঃস্যাৎ॥"

ভাঃ ভূগোলধ্যায়।

দুইবার মাত্র হয় অর্থাৎ প্রথম মীনরাশি এবং মেষরাশির সঙ্গম স্থান, দ্বিতীয় কন্যা এবং তুলারাশির সঙ্গমস্থান, প্রথমোক্তটি মহা বিষুব এবং দ্বিতীয় জলবিষুব সংক্রমণ। সূর্য্য যে সময়ে এই রেখায় ভ্রমণ করেন, তখন প্রোক্ত বিষুব রেখার উত্তর দক্ষিণস্থ ৬৬ অক্ষাংশের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে দিবা এবং রাত্রির মান সমান হয়। এই উভয় সঙ্গমস্থান মধ্যে সূর্য্যের ক্রান্তি বৃদ্ধির সময় মহাবিষুব সংক্রমণ, অতএব এই স্থান হইতে অস্মদ্দেশীয় বৎসর গণনারম্ভ হইতেছে।

প্রাচীন জ্যোতিষিক ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে এই বিষুব সংক্রমণ কোন সময়ে আশ্বিন, কোন সময়ে কার্ত্তিক ইত্যাদিক্রমে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্যোতির্বিদ্‌গণ এরূপ ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে দেখাইয়াছেন যে প্রোক্ত বিষুব রেখা ৬৬ বৎসর অন্তে এক অংশ (একদিন) করিয়া সরিয়া যায়, অতএব বর্ত্তমান সময়ে ১০ দশই চৈত্র এবং ১০ দশই আশ্বিন ক্রান্তিপাত (দিবা রাত্রির মান সমান) হইতেছে।

কোন সময়ে চান্দ্রিক গণনায় আশ্বিন মাসে মহাবিষুব সংক্রমণ হইয়াছে যথা 'দাক্ষ্যায়ণ্যোশ্বিনীত্যাদি তারা অশ্বযুগশ্বিনী রাধা বিশাখা" এই অমর কৃত নামানুশাসন দ্বারা অশ্বিনী নক্ষত্রের নাম করণ প্রথম উল্লেখ করার কারণ ঐ সময় বৎসর গণনা প্রচলিত ছিল। "রাধা বিশাখা" ইহাদ্বারা বৈশাখও বুঝিতে হইবে।

"তেষাং চ সর্ব্বেষাং নক্ষত্রাণাং কর্ম্মসু কৃত্তিকাঃ প্রথমমাচক্ষ্যতে" এই গর্গোক্ত বচন দ্বারা কার্ত্তিক। এবং 'আগ্রহায়ণী' এই নাম দ্বারা মার্গশীর্ষ "পৌষস্তৈষ সহস্যবৎ" এই হেমচন্দ্রকৃত নামানুশাসন দ্বারা প্রোক্ত পৌষ মাসে, ঋঃ জোতিষভাষ্যে 'মাঘ শুক্ল প্রপন্নস্য পৌষকৃষ্ণ" ইত্যাদি এবং সোমাকর কল্প সূত্রে 'মাঘ্যাঃ পৌর্ণমাস্যা শ্চতুরহঃ পুরস্তাৎ সম্বৎসরায় দীক্ষ্যন্তে" ইহা দ্বারা মাঘমাসে, শতপথ

ব্রাহ্মণে, যা বৈষা ফাল্গুণী পৌর্ণমাসী সংবৎসরস্য প্রথমা রাত্রিঃ” ইত্যাদি। এই বচন সমূহের তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে এই প্রকার বিষুব রেখার অস্থিরতাই বৎসরারম্ভের অস্থিরতা সম্পাদক, এবম্বিধ বৎসর পরিবর্ত্তনের সহিত অয়ন ঋতু প্রভৃতিরও পরিবর্ত্তন ঘটনা হইয়াছিল।

ত্রিখণ্ডীকৃত খগোলের মধ্যখণ্ডস্থ অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭ সপ্ত-বিংশতি অচল নক্ষত্র দ্বারা কল্পিত ‘রাশিচক্র’ ইহার সীমা উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটী ধ্রুব নক্ষত্র দ্বারা চিহ্নিত। প্রোক্ত অচল ২৭ সপ্ত বিংশতি নক্ষত্রকে ১২শ অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক অংশে এক একটী রাশি কল্পনা দ্বারা মেষাদি দ্বাদশটী রাশি কল্পিত, সূর্য্য সম্বৎসর মধ্যে মেষ হইতে বৃষ ইত্যাদি ক্রমে ভ্রমণানন্তর মীনরাশি অতিক্রম করিয়া পান্ত স্থানে আসিলে বৎসর পূর্ণ হয়, এই সংবৎসর কালে ২ দুইটী অয়ন—যথা উত্তরায়ণ বা আদান, ও দক্ষিণায়ণ বা বিসর্গ, উত্তরায়ণে মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ, মিথুন এই ছয় রাশি। দক্ষিণায়ণে কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু এই ছয় রাশি। অয়ন শব্দে সূর্য্যের গতি বুঝিতে হইবে অর্থাৎ সূর্য্যের উত্তর ক্রান্তিতে গতির নাম উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণ ক্রান্তিতে ভ্রমণের নাম দক্ষিণায়ণ এই অয়ন দ্বয়ে ৬ ঋতু। যথা হিম, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ। তন্মধ্যে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এই ত্রিবিধ ঋতু প্রধান। অপর শিশির, বসন্ত, শরৎ এই তিন ঋতু পূর্ব্বোক্ত ঋতু ত্রয়ের মধ্য-বর্ত্তি-কাল, অপ্রধান।

কথিত ঋতু বিভাগের ফল ভূগোল পৃষ্ঠের সকল স্থানে একরূপ না হইয়া বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে ফল প্রাপ্ত হয়, কেবল ভারতবর্ষ প্রদেশে অপর্য্যাপ্ত রূপে বিভক্ত ঋতুগণ বিভক্ত ফলপ্রদ।

গণিত ক্রিয়ার সুবিধার নিমিত্ত জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ভূগোলক্ষেত্র ৩৬০ তিনশত ষাইট অক্ষাংশে বিভক্ত করিয়া পৃথিবীর কেন্দ্রস্থানীয়

পূর্ব্বোক্ত বিষুব রেখাদ্বারা তুল্যাংশে বিভাগ করত দক্ষিণ গোলে ৬ ছয় রাশি অন্তর ১৮০অংশ, উত্তরে ৬রাশি অন্তর ১৮০অংশ স্থাপন করিয়াছেন, এই অক্ষাংশ দ্বারা গণনা করিলে দেখিবেন যে ভারত ক্ষেত্র দ্বিখণ্ডীকৃত ভূগোল ক্ষেত্রের উত্তর গোলার্দ্ধে বিষুব রেখার ২২ অংশ উত্তরে ভূমণ্ডলস্থ গ্রীষ্ম মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী উত্তর অয়নান্ত বৃত্তের উপরে অবস্থিত, সুতরাং এস্থানবাসীদের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সূর্য্য সন্তাপীয় ফলের ইতর বিশেষের বিলক্ষণ সম্ভব। (১)

পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্রগোল (রাশিচক্র) কল্পিত বিষুববৃত্তের উপরিভাগে পশ্চিমাভিমুখে সদাই ভ্রমণশীল সুতরাং নিরক্ষ দেশবাসীদিগের দিবা রাত্রির মান সকল সময়ে সমান এবং ঐরূপ সমানতা প্রযুক্ত তথায় ঋতুর কোন ইতর বিশেষ নাই (স) তদ্ভিন্ন সূর্য্য যে গোলে থাকিবে সেই গোলেই সূর্য্যের ক্রান্তি বৃদ্ধি হেতু দিবামান বৃদ্ধি রাত্রিমান হ্রাস এবং ঋতুর নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হইবে এই বিষয় সাধারণের সহজ বোধের নিমিত্তে অস্মদ্দেশীয় জ্যোতিষিক

(১) এই অক্ষাংশ গণনা বিষুব রেখা হইতে আরব্ধ হইয়া ১৮০ পর্য্যন্ত উভয় গোলে শেষ হইয়াছে—কারণ বিষুব রেখা অক্ষাংশ-হীন অতএব ইহার নামান্তর "নিরক্ষবৃত্ত"।

(স) ভারতীয় জ্যোতিবিক গণ নিরক্ষ দেশ গণনায় লঙ্কা দ্বীপ স্থির করিয়া গিয়াছেন বর্ত্তমান ভূগোলচিত্রে ৭ অংশ উত্তরে অঙ্কিত, সমুদ্র গর্ভস্থ স্থল বহু শতাব্দীর পর ন্যূনাধিক হওয়া বিচিত্র নাই। আমাদিগের প্রাচীন ইতিহাস রামায়ণেও বর্ণিত আছে যে রাবণরাজার শাসনে তথায় বসন্তকাল অব্যাহত ছিল।

"লঙ্কাকুমধ্যে যম কোটিরস্যাঃ প্রাক্ পশ্চিমে রোমক পত্তনঞ্চ" ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত শিরোমণিঃ।

"সব্যং ভ্রমতি দেবানাং অপসব্যং সুরদ্বিষাং উপবিষ্টাৎ ভগোলোঽয়ং ব্যক্ষে পশ্চান্মুখঃসদা অতস্তত্রদিনং ত্রিংশন্নাড়িকং শর্ব্বরীতথা" ইত্যাদি।

সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ।

প্রমাণানুসারে একটি মানচিত্র দেওয়া গেল, মহোদয় পাঠক প্রমাণ সহ দৃষ্টি করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। (২)

যে দেশ নিরক্ষ দেশ হইতে ৬৬ অক্ষাংশের মধ্যবর্ত্তী ঐ সকল দেশেই পর্য্যায় ক্রমে ষষ্টি দণ্ডের মধ্যে দিবা এবং রাত্রির আবির্ভাব হয় তদ্ভিন্ন (৬৬ অক্ষাংশের অন্তর মেরু পর্য্যন্ত) স্থানান্তরে ক্রমে ২।৩।৪।৬ মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যের তাপ ভোগ করে আবার ঐ নিয়মে অন্ধকার থাকে। কারণ গোল পদার্থের উপরিভাগে আলোক পাত হইলে তাহা চতুর্থাংশের অধিক প্রসারিত হয় না।(ক)।

যে ব্যক্তি যে স্থানে অবস্থিত তাহার বামে ৯০ অংশ এবং দক্ষিণে ৯০ অংশ পর্য্যন্ত দৃষ্টি পথে থাকিবে, সুতরাং তাহার ক্ষিতিজ বৃত্ত ৯০ অংশ পর্য্যন্ত। সূর্য্যের উদয় হইতে অস্তদর্শন পর্য্যন্ত বৃত্তকে "ক্ষিতিজবৃত্ত" কহে। সূর্য্য এইবৃত্তের অধঃস্থ হইলে "রাত্রি" ঊর্দ্ধে থাকিলে "দিবা"। অর্থাৎ যে কোন দণ্ডায়মান ব্যক্তি তাহার পায়ের সমান সূর্য্যের উদয় ও অস্ত দেখিবে, বাস্তবিক তাহাই ক্ষিতিজ। সূর্য্য যে পথে ভ্রমণ করিয়া দিবা এবং রাত্রি সম্পন্ন করে তাহার নাম "অহোরাত্রবৃত্ত" এই বৃত্তের যে অংশ ক্ষিতিজ বৃত্তের ঊর্দ্ধে থাকিবে তাহা দিবা এবং যাহা অধোগত অংশ তাহা রাত্রি। এই বৃত্ত নিরক্ষ বৃত্তের সমান্তরাল, সূর্য্যের গতি অনুসারে যে স্থানে ইচ্ছা অঙ্কিত করিতে পারিবে *।

(২) ক্রান্তি বৃদ্ধির তাৎপর্য্য এই যে সূর্য্য উত্তর ক্রান্তিতে কি দক্ষিণ ক্রান্তিতে ২৪ অংশের অধিক অগ্রসর হইতে পারে না, উত্তরে ২৪ অংশ সায়ন মিথুন পর্য্যন্ত গমন করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া সায়ন মকর পর্য্যন্ত গমন করে।

(ক) "লম্বাধিকা ক্রান্তিরুদক্ চ যাবত্তাবদ্দিনং সন্ততমেব তত্র"।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত গোলাধ্যায়।

* "অতশ্চ যাম্যো দিবসো মহানৃস্যাৎ রাত্রিলঘুর্ব্যস্তমতশ্চ যাম্যো হ্যরাত্র

১। যে সময় সূর্য্য উত্তর গোলে মিথুনের শেষ (আষাঢ় মাসের শেষ উত্তর অয়নান্ত বৃত্তের উপরে ভ্রমণ করিবে ঐ সময় পৃথ্বী মণ্ডলের উত্তর গোলে ২২ অংশে (কলিকাতা প্রভৃতিস্থানে) স্থিত "ক" নামক কোন ব্যক্তি তাহার বামে এবং দক্ষিণে মান চিত্রের ৬৬ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিতে পাইবে, সুতরাং তাহার ক্ষিতিজ বৃত্ত ঐ ৬৬ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত, এই মানচিত্রে যে সূর্য্যের "অহোরাত্রবৃত্ত" অঙ্কিত আছে তৎ প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে "অহোরাত্রবৃত্তের" "দিদি" স্থান ক্ষিতিজ দ্বারা কর্ত্তন হইয়াছে, পূর্ব্বে বলিয়াছি ক্ষিতিজের অধস্থ "রাত্রি" সুতরাং এই বৃত্তের "দিদি" দ্বারা কর্ত্তিত অধোভাগ অতিকম, ঊর্দ্ধ দিবার ভাগ প্রায় ত্রিভাগ। বস্তুতঃ আষাঢ় মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্ব সপ্তাহে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানিক লোকদিগের সম্বন্ধে দিবা মান নিতান্ত বেশী।

২। এই প্রকার দক্ষিণ গোলে সূর্য্য যখন ধনুরাশির অন্তে (মাঘমাসে) মকরের প্রথম দক্ষিণায়ণের চরম সীমায় ভ্রমণ করিবে, সেই দিন সূর্য্যের "অহোরাত্র বৃত্তের" উ, উ স্থান ক্ষিতিজ দ্বারা কর্ত্তিত হইয়াছে দেখিবে, সুতরাং পৌষমাসের শেষ মাঘ মাসের প্রথম কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে দিবামান অতিঅল্প, রাত্রি মান বৃহৎ হইবে।

৩। প্রথমোক্ত স্থানে ভ্রমণশীল সূর্য্যকে যদি ভূকক্ষার ৬৬ অক্ষাংশস্থিত "শ" নামক দণ্ডায়মান ব্যক্তি দর্শন করে, তবে তাহার ক্ষিতিজ দ্বারা সূর্য্যের অহোরাত্রবৃত্তের "ম" বিন্দু স্পর্শ মাত্র করিবে, সুতরাং তাহার পক্ষে ঐ সময় রাত্রি দর্শন বিরল, কেবল অস্তোন্মুখ সন্ধ্যার ন্যায় ঘোরমাত্র দেখিয়াই পুনরায় সূর্য্য দেখিতে পাইবে।

বৃত্তে ক্ষিতিজাদধঃস্থে রাত্রির্যতঃ স্যাদ্দিনমান মূর্দ্ধং। সদা সমত্বংহ্যনিশো নিরক্ষে" ইত্যাদি গোলাধ্যায়।

এই প্রকার দক্ষিণ গোলস্থ ৬৬ অক্ষাংশ বাসির পক্ষে "চ" বিন্দু স্পর্শ করায় কেবল উদয়োন্মুখ দর্শন করিয়াই অন্ধকার দেখিবে।

বিশ্বনিয়ন্তা করুণাময়ের অব্যাহত নিয়তির অধীন অনন্ত জগতে প্রতি অনুপলে কত যে অনন্ত ফল ফলিতেছে তাহা পরিমিত ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জ্ঞানের অতীন্দ্রিয়, কেবল বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্ব্বিদ্গণ এবং আয়ুর্ব্বেদিকগণ অপরিমিতজ্ঞান প্রবাহের সহায়তায় অতি সামান্যাকারে বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি উপস্থিত করিয়া প্রবল তমসাচ্ছন্ন গিরিগহ্বরে দীপালোক প্রদানের ন্যায় বিজ্ঞান-বিমুখ ব্যক্তিগণের হৃদয়ক্ষেত্রস্থ অন্ধকার দূরীকরণ-মানসে অজ্ঞান-তিমিরা-পহারক প্রদীপ শিখার ন্যায় যে কিছু লিপি নিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা সেই মহাত্মগণের উপদেশাত্মক বচন-পরম্পরা অবলম্বন পূর্ব্বক সাধারণের অববোধার্থ জ্যোতির্বিক সৌরিক ব্যাপার যৎ-কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম। বাস্তবিক বিশ্বগোলকের ক্রিয়ার সহিত সৌরিক ক্রিয়ার অবিনাভাবে আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের সমন্বয় বা প্রাণি-নিচয়ের শারীরিক যাবতীয় ক্রিয়া নির্ব্বাহের অভিন্নতা প্রদর্শন করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য রহিল।

পৃথিবীর দৃঢ়াকর্ষণে কষিত জল এবং বায়ু কদম্বকুসুমের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে ওতঃপ্রোতভাবে সংসক্ত। সুতরাং জাগতিক স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সকলও প্রোক্তবিধ জল ও বায়ুর অভ্যন্তরে ডুবিয়া থাকার ন্যায় রহিয়াছে। এই আবহমানা ভূবায়ু ভূমণ্ডলের ঊর্দ্ধে দ্বাদশ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং এই বায়ুর আশ্রয়েই বারিসমূহ শূন্য মার্গ অবলম্বনে গগনচারী অভ্র নামে অভিহিত, এই বায়ুই মেঘের নেতা ও জীবগণের জীবন *। (ক্রমশঃ)

* "আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরুস্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা। আকৃষ্যতে"০০০। ভাস্করাচার্য্যবৌদ্ধবিচার।

"ভূমের্বহির্দ্বাদশযোজনানি ভূ-বায়ুরত্রাম্বুদবিদ্যুদাদ্যং"। ভূগোলাধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদ কত কালের ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তির শেষ)

পূর্ব্বের অনুসন্ধানে প্রতিপাদিত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদীয় বস্তু-নিচয় বেদ-সমকালিক অথবা অনাদি। কিন্তু, সেই সকল বস্তু সংগৃহীত হইয়া কোন্ সময়ে "আয়ুর্ব্বেদ" আখ্যায় প্রতিষ্ঠিত বা প্রচারিত হইয়াছিল—তাহার কোন ইয়ত্তাবধারণ বা সুনির্ণয় করা হয় নাই। সুতরাং আজ আমরা এতৎ প্রবন্ধে ঐ অংশেরই অনুসন্ধান করিব।

তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও মূল-বেদ-মধ্যে 'আয়ুর্ব্বেদ' এই সংজ্ঞাশব্দ দেখিতে পাইবেন না। কাযে কাযেই স্বীকার করিতে হইবে, আয়ুর্ব্বেদ শব্দটী বেদ শব্দের পরভবিক এবং আয়ুর্ব্বেদ নামক সংহিতা গ্রন্থ, মূল বেদ প্রচারের অনেক কাল পরে আত্মলাভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ উপবেদ এই নাম শুনিলেও উপবেদকে মূল বেদের পরজন্মা বলিয়া প্রতীতি হয়।

বেদে আয়ুর্ব্বেদ শব্দ নাই বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ মূলবেদের পরবর্ত্তী, এই সিদ্ধান্তে বোধ হয় কাহারও কোন প্রতিবাদ কি কোন আপত্তি উপস্থিত হইবে না। আপত্তি না হউক, কিন্তু প্রশ্ন হইবে। "আয়ুর্ব্বেদ তবে কত কালের ? মূল বেদের কত কাল পরে আয়ুর্ব্বেদ সংহিতার জন্ম ?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে তাহার প্রত্যুত্তরার্থ যাহা বলিতে হইবে তাহা এই:—

বেদমধ্যে আয়ুর্ব্বেদ শব্দ না থাকুক, কিঞ্চিৎন্যূন ৪০০০ বৎসরের মহাভারত গ্রন্থে, উক্ত শব্দের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। যথা—

"আয়ুর্ব্বেদবিদস্তস্মাৎ ত্রিধাতুং মাং প্রচক্ষতে।" শান্তি, মোক্ষ, ১৩৭।

"কচ্চিত্তে কুশলা বৈদ্যা অষ্টাঙ্গেচ চিকিৎসিতে।" সভা ৩৫।

"দেবর্ষিচরিতং গার্গ্যঃ কৃষ্ণাত্রেয়শ্চিকিৎসিতম্।" শান্তি, মোক্ষ, ১৩৭।

এই কয়েকটী প্রমাণের দ্বারা জানা গেল যে, আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র,—আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্র, অন্যূন ৪০০০ হাজার বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, তৎশিষ্য অক্ষপাদ গৌতম ; ইনিও স্বকৃত ন্যায়সূত্রে আয়ুর্ব্বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। যথাঃ—

"মন্ত্রায়ুর্ব্বেদপ্রামাণ্যাৎ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ।" ২, ১, ৬৭।

এই প্রমাণটী আয়ুর্ব্বেদের মহাভারত অপেক্ষা বহু পুরাতনতা পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এমন কি আমরা এই সকল প্রমাণের দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের যতদূর ইচ্ছা ততদূর পুরাতনত্ব সমর্থন করিতে পারি। (ইহা বুঝিতে হইবে যে মহাভারতাদি গ্রন্থের পুর্ব্ব হইতে বেদ সংহিতা পর্য্যন্তই আমরা যাইব)।

তিষ্ঠতু। এ-ত গেল মূল আয়ুর্ব্বেদের কথা। প্রজাপতিকৃত মূল আয়ুর্ব্বেদ এখন নাই ; সুতরাং তৎপ্রসঙ্গে অধিক বাক্য ব্যয় করা এক্ষণে বৃথা। এখন আমরা যাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া অভিহিত করি, তাহাও অল্প পুরাতন নহে। প্রজাপতিকৃত মূল আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের পর, ধন্বন্তরি-শিষ্য সুশ্রুত প্রভৃতি কতিপয় ঋষি এবং পুনর্ব্বসু শিষ্য অগ্নিবেশ প্রভৃতি অন্য ছয় জন ঋষি পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। সেই সকল সংহিতাই আমরা পাইতেছি এবং সেইগুলিকেই আমরা এখন আয়ুর্ব্বেদ নামে অভিহিত করিতেছি। ঐ সকল সংহিতার মধ্যে সুশ্রুত সংহিতা ও চরক-সংহিতা এক্ষণে সুপ্রাপ্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; সুতরাং এই দুই সংহিতার উৎপত্তিকাল আমাদের অনুসন্ধেয়। এই দুই সংহিতার কাল নির্ণীত হইলে, তৎসঙ্গে অন্যান্য সংহিতারও কাল নির্ণীত হইবে।

সুশ্রুত ও চরক এই দুই পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে। সুশ্রুত অগ্রে না চরক অগ্রে রচিত হইয়াছিল, ইহার মীমাংসা করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। সুশ্রুত গ্রন্থ খানি কতকালের ? এ প্রশ্নের

সদুত্তর দান করাও বড় সহজ ব্যাপার নহে। যাহাই হউক, এই সকল তথ্য লাভের জন্য আমরা যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিব; তাহাতে যতদূর সত্য লাভের সুসম্ভাবনা, এ প্রবন্ধে ততদূর সত্যই লব্ধ হইবে।

প্রথম সুশ্রুত সংহিতা।—সুশ্রুত সংহিতা সম্ভবতঃ মহাভারত অপেক্ষা পুরাতন। সুশ্রুতগুরু ধন্বন্তরি যখন মহাভারতবক্তা ঋষির নিকট সমধিক পুরাতন বলিয়া গণ্য, তখন আর ধন্বন্তরি-প্রোক্ত ও সুশ্রুত-শ্রুত উপদেশ মহাভারত অপেক্ষা পুরাতন নহে; ইহা বলা যায়না। মহাভারত বক্তা ঋষি ধন্বন্তরিকে ও তৎশিষ্য সুশ্রুতকে পুরাতন বলিয়াই জ্ঞাত ছিলেন। যথা—

" ধন্বন্তরিস্ততো দেবো বপুষ্মানুদতিষ্ঠত।
শ্বেতং কমণ্ডলুং বিভ্রদমৃতং যত্র তিষ্ঠতি।" আদি, ১৫ অঃ।

"ততো ব্রাহ্মণতাং যাতো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
ক্ষত্রিয়ঃ সোঽপ্যথ তথা ব্রহ্মবংশস্য কারকঃ॥
তস্য পুত্রা মহাত্মানো ব্রহ্মবংশবিবর্দ্ধনাঃ।
তপস্বিনো ব্রহ্মবিদো গোত্রকর্ত্তার এব চ॥
মধুচ্ছন্দশ্চ ভগবান্ দেবরাতশ্চ বীর্য্যবান্।
অক্ষীণশ্চ শকুন্তশ্চ বভ্রুঃ কালপথস্তথা॥

* * * *

শ্যামায়নোঽথ গার্গ্যশ্চ জাবলিঃ সুশ্রুতস্তথা।
বিশ্বামিত্রাত্মজাঃ সর্ব্বে মুনয়োব্রহ্মবাদিনঃ॥" অনুশাসন ৪ অঃ।

মহাভারত বক্তা ঋষি ধন্বন্তরিকে সমুদ্রমন্থন সমুৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ধন্বন্তরি তাঁহার মতে বহু পুরাতন এবং সুশ্রুত মুনিকে বিশ্বামিত্রাত্মজ বলিয়া বর্ণন করায় তন্মতে ইনি দ্বাপর যুগের লোক, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। কেন না উক্ত মহাভারতের অন্য এক স্থানে লিখিত আছে যে, বিশ্বামিত্র

মুনি ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিকালে জীবিত ছিলেন। * অতএব, মূল সুশ্রুতসংহিতা যে মহাভারত অপেক্ষা পুরাতন, তৎপক্ষে সংশয় করিবার কোন কারণ নাই।

আমরা মহাভারত পর্য্যালোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্ত স্থাপনা করিলাম; সে সিদ্ধান্ত পাণিনিকৃত গ্রন্থাবলির দ্বারা অবিচাল্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে পারি। ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন, ব্যাকরণসূত্রপ্রণেতা পাণিনি মুনি বুদ্ধদেব শাক্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত গোলণ্ডষ্টুকর অনুমান করেন, পাণিনি মুনি খৃঃ অন্যূন ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তন্মতানুসারে ইনি অন্যূন ২৮০০০ আটাইস শত বৎসরের পুরাতন হইতেছেন; কিন্তু আমরা ইহাঁকে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক পুরাতন বলিতে ইচ্ছুক। যাহাই হউক, ত্রিসহস্র বৎসরের পুরাতন পাণিনীয় গ্রন্থে আমরা যখন "সুশ্রুতেন প্রোক্তং সৌশ্রুতং" এতদ্রূপ নির্ব্বচন দেখিতে পাই, তখন, আর আমরা মহাভারতোক্ত সুশ্রুত মুনিকে আয়ুর্ব্বেদবেত্তা সুশ্রুতমুনিকে এক বা অভিন্ন না বলিয়া থাকিতে পারিনা এবং উহাঁকে মহাভারত গ্রন্থ অপেক্ষা বহু প্রাচীন মনে না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিনা। যদিও "সুশ্রুতেন প্রোক্তং সৌশ্রুতম্" এই নির্ব্বচন সাক্ষাৎ পাণিনিকৃত নহে, যদিও উহা কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিকোক্তি; তথাপি, উক্ত নির্ব্বচন আমাদের উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে অন্তরায়িত নহে। কেননা, পাণিনি ও কাত্যায়ন, ইহাঁরা এক সময়ের লোক। প্রথমে ইহাঁরা উভয়েই উপবর্ষ পণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন, একত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; পরে শিব আরাধনা ফলে পাণিনি কিছু অধিক ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন; এইমাত্র প্রভেদ।†

* "ত্রেতাদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।" অনুশাসনপর্ব্ব

† বৃহৎ কথা ও কথা সরিৎসাগরে দেখ।

সুতরাং পাণিনির কথা আর কাত্যায়নোক্তি কালপ্রমাপকতা পক্ষে সমান বা তুল্যবল, ইহা বিনাসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

উল্লিখিত প্রমাণসমূহের দ্বারা এই মাত্র জানা গেল যে, ধন্বন্তরি-শিষ্য ও বিশ্বামিত্র তনয় সুশ্রুত মুনি এবং তৎকৃত আয়ুর্ব্বেদসংহিতা মহাভারতাদি গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বেদপ্রচারের পরবর্ত্তী। ত্রেতার পরে এবং দ্বাপরের প্রারম্ভে উক্ত সংহিতার প্রচার ছিল; সুতরাং তাহা অন্যূন দশ সহস্র বৎসরের পুরাতন। "দশ সহস্র বৎসরের পুরাতন" ইহা শুনিয়া মনে করিবেন না যে, আমরা বর্ত্তমান সুশ্রুত-সংহিতাকে দশ হাজার বৎসরের পুরাতন বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারিব। কোন ক্রমেই আমরা বর্ত্তমান সুশ্রুত-সংহিতাকে অত অধিক পুরাতন বলিতে সক্ষম নহি। তাহার কারণ এই যে, বর্ত্তমান সুশ্রুত-সংহিতায় ব্যাসপ্রশিষ্য শৌনকের ও শাক্যসিংহশিষ্য সুভুতির মত সংগৃহীত হইয়াছে। এই দুই অপেক্ষাকৃত নবীন মতের প্রবেশ থাকায় বর্ত্তমান সুশ্রুতকে আমরা ব্যাসের কিম্বা মহা-ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করিতে পারি না। ব্যাসকৃত মহাভারত ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন দ্বারা রাজা জনমেজয়ের রাজ্য কালে প্রচারিত হইয়াছিল। অনন্তর সৌতি নামক জনৈক পুরাণ বক্তা মুনি নৈমিষারণ্যবাসী শৌনক মুনিকে উহা শ্রবণ করান। এই শৌনক মুনি ব্যাসের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ ও অনুশিষ্য। যথা—

ব্যাস
।
সুমন্ত
।
কবন্ধ
।
বেদদর্শ
।
পথ্য
।
শৌনক

এই শৌনক মুনি ব্যাসের অথর্ব্ববেদীয় সুমন্ত নামক শিষ্যের শিষ্য এবং ইনিও একজন প্রধান শাখাভেদপ্রবর্ত্তক। ইনি এক জন প্রধান আথর্ব্বণিক ও অথর্ব্বসম্প্রদায়ের গুরু অথবা শাখাপ্রবর্ত্তক ঋষি। ইনিই বর্ত্তমান "শৌনকী সংহিতা" নামক অথর্ব্ব সংহিতার প্রণেতা। আজ যে আমরা মুদ্রিত অথর্ব্ববেদ দেখিতেছি তাহা সেই শৌনকীসংহিতা। বর্ত্তমান সুশ্রুত গ্রন্থে যখন শৌনকীসংহিতার মত ও তৎ প্রণেতা শৌনকের উল্লেখ আছে, তখন আর আমরা কোন ক্রমেই বর্ত্তমান সুশ্রুত-সংহিতাকে মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অবধারণ করিতে পারি না। যথা—

"শির ইত্যাহ শৌনকঃ।" সুশ্রুত, শারীরস্থান।

অর্থ এই যে, শৌনক বলেন, গর্ভজীবের সর্ব্বাগ্রে মস্তক গঠিত হয়। এই মতের অনুরূপ কথা আমরা মুদ্রিত ও হস্তলিখিত শৌনকী সংহিতাতেও দেখিতে পাই। যথা—

"প্রজাপতিষ্ট্বা বধ্নাৎ প্রথমমস্তৃতং বীর্য্যায় কং।
তং তে বধ্নাম্যায়ুষে বর্চ্চস ওজসে চ বলায় চাস্তৃতস্ত্বাভিরক্ষতু।
১৯, ৪৫, ৪৬, ৫ অনুবাক।

প্রজাপতি তোমাকে বন্ধন করিয়া ছিলেন, বীর্য্যের নিমিত্ত ও তেজঃ প্রভৃতির নিমিত্ত প্রথমে তোমার ক অর্থাৎ মস্তক স্তৃত অর্থাৎ গঠিত করিয়া ছিলেন।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, বর্ত্তমান সুশ্রুত গ্রন্থে যে শৌনকের মতের উল্লেখ করিয়াছেন,সেই শৌনকও সে মত,শৌনকী-সংহিতা নামক অথর্ব্বসংহিতা প্রণেতা ও ব্যাসপ্রশিষ্য শৌনকের সহিত সমান কি না। সুশ্রুত সংগৃহীত শৌনক মত যখন শৌনকী শাখা সংহিতায় দৃষ্ট হইতেছে,তখন অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে,

* শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ দেখ।

বর্ত্তমান সুশ্রুত শৌনকীসংহিতা হইতেই শৌনক মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং বর্ত্তমান সুশ্রুত ব্যাসপ্রশিষ্য শৌনক অপেক্ষা অপ্রাচীন ; মহাভারত অপেক্ষা নবীন। বর্ত্তমান সুশ্রুতের মহাভারত অপেক্ষা ও পাণিনি অপেক্ষা নবতা দেখাইবার আরও একটী প্রবল চিহ্ন আছে। কি ? তাহা বলিতেছি।

বর্ত্তমান সুশ্রুত বলিতেছেন,—

মধ্যশরীর মিতি সুভূতিগৌতমঃ। সুশ্রুত, শারীরস্থান।

গৌতম সুভূতি বলেন, গর্ভশিশুর অগ্রে মধ্যশরীর হয়। বর্ত্তমান সুশ্রুতে সুভূতি গৌতমের মত সংগৃহীত হওয়ায় ইহার বহুপ্রাচীনতা পক্ষ নষ্ট হইয়া গিয়া শাক্যসিংহের পরবর্ত্তিতাই সপ্রমাণ হইতেছে। বৌদ্ধ বৌদ্ধদিগকে গৌতম বিশেষণ দিয়া উল্লেখ করেন, ইহা সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রেই জানেন। অমরসিংহ যেমন বৌদ্ধ ; তেমনি, বর্ত্তমান সুশ্রুতের লেখকও বৌদ্ধ ; তাই তিনি আচার্য্য সুভূতিকে গৌতম বিশেষণে উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য্য সুভূতি কে ? যদি তাহার জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে তিনি বজ্রচ্ছেদিকা, মহাবস্তু অবদানং ও সুখাবতী ব্যূহ প্রভৃতি পুরাতন বৌদ্ধগ্রন্থ দেখিবেন ; তাহাতে দেখিতে পাইবেন ; আচার্য্য সুভূতি অথবা গৌতম সুভূতি ভগবান্ শাক্যসিংহের সাক্ষাৎ শিষ্য। গৌতম সুভূতি মহান্ জ্ঞানী ছিলেন। শারীরতত্ত্বে যে ইহাঁর সমধিক নৈপুণ্য ছিল, তৎসম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সুভূতিই স্বশাস্ত্রে ও পরশাস্ত্রে সুবিখ্যাত ; এতদ্ভিন্ন অন্য কোন সুভূতির অস্তিত্ব আমারা দেখিতে পাই না। অতএব, বর্ত্তমান সুশ্রুতে যখন শাক্য শিষ্যের মত সংগৃহীত থাকা দৃষ্ট হইতেছে, তখন আর ইহাকে মহাভারত অপেক্ষা পুরাতন বলা দূরে থাকুক, পাণিনি অপেক্ষাও পুরাতন বলিতে পারি না।

তবে এ সুশ্রুত কত কালের ? এরূপ প্রশ্ন হইলে তাহার সদুত্তর

প্রদানার্থ নিম্নলিখিত আলোচনা ফলপ্রদ হইতে পারে। বর্ত্তমান সুশ্রুতের প্রারম্ভপত্রেই লিখিত আছে যে,—

"যথোবাচ ভগবান্ ধন্বন্তরিঃ সুশ্রুতায়।"

ভগবান্ ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমি সেই রূপই ব্যাখ্যা করিব।

এই প্রতিজ্ঞা বাক্য বা প্রারম্ভ বাক্য শুনিবা মাত্র কাহার না প্রতীতি হইবে যে, ধন্বন্তরি ও সুশ্রুতমুনি এই দুই ব্যক্তি ছাড়া বর্ত্তমান সুশ্রুত গ্রন্থের সহিত অন্য এক তৃতীয় ব্যক্তির সংশ্রব আছে, অবশ্যই কোন সুযোগ্য ব্যক্তি লুপ্তকল্প মূল সুশ্রুত সংহিতার সংস্কার করিয়া ছিলেন। যদিও টীকাকার চক্রপাণিদত্ত উক্ত বাক্যের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তথাপি তাহা বাক্ চাতুর্য্য ভিন্ন অন্য কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুসন্ধানের পরিপোষক নহে। সেই জন্যই অন্য টীকাকার ডল্লনাচার্য্য বলিয়াছেন, "প্রতিসংস্কারকর্ত্তা নাগার্জ্জুন এব।" নাগার্জ্জুন নামক আচার্য্যই মূল সুশ্রুত সংহিতার প্রতি সংস্কার করিয়া ছিলেন।

নাগার্জ্জুন সুশ্রুত সংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা, এ কথা অসম্ভব নহে। কেন না, লৌহার্ণব প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থে নাগার্জ্জুনের গ্রন্থ-কর্ত্তৃত্ব বোধক অনেক প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যায়। বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর নামক একখানি জীর্ণগ্রন্থে "ক্ষুদ্র বজ্রক নামানং প্রাহ নাগার্জ্জুনোমুনিঃ।" নাগার্জ্জুনকে মুনি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ নামক সায়নীয় গ্রন্থেও নাগার্জ্জুন মুনি পাণ্ডিত্যসূচক মতের উল্লেখ আছে। অতএব, আচার্য্য নাগার্জ্জুন যখন একজন খ্যাত-নামা পণ্ডিত, তখন আর তাঁহাকে সুশ্রুত প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিতে কোন রূপ বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে না।

রাজতরঙ্গিণী নামক ইতিহাসের লেখক কহ্লন পণ্ডিত বলেন, নাগার্জ্জুন এক জন কাশ্মীরদেশীয় মণ্ডলেশ্বর রাজা, তিনি বৌদ্ধ-

ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বনাশ্রয়ী মুনি হইয়াছিলেন। ভগবান্ শাক্য-সিংহের মৃত্যুর ১৫০ বৎসর পরে এবং মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ইনি জীবিত ছিলেন এবং অনেক শত গ্রন্থ প্রচার করিয়া ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর নাগার্জ্জুন আর সুশ্রুতপ্রতিসংস্কর্ত্তা নাগার্জ্জুন যদি এক বা অভিন্ন ব্যক্তি হন, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি, বর্ত্তমান সুশ্রুত সংহিতা, যাহা আমরা আজি কালি অধ্যয়ন করিতেছি, মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রচার করিতেছি, তাহা অন্যূন ২৪০০ চব্বিশ শত বৎসরের পুরাতন বস্তু এবং সেই জন্যই বর্ত্তমান সুশ্রুতে শৌনকের মত ও স্বভুতির মত এবং অন্যান্য অপ্রাচীন কথা উল্লিখিত বা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্য এক নাগার্জ্জুন ছিলেন, তিনিও বৌদ্ধ, ও গ্রন্থাকার। পরন্তু এ নাগার্জ্জুন অপেক্ষাকৃত নব্য।

সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত।

আয়ুর্ব্বেদীয় বস্তু ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান অনাদি অথবা বেদসম-কালিক। তাহার সংহিতাকারে প্রকাশ বেদসংহিতার পরে ও মহাভারতাদি ইতিহাসগ্রন্থের পূর্ব্বে। সেই প্রাচীন প্রাজাপত্য সংহিতার সার সঙ্কলন স্বরূপ সৌশ্রুত সংহিতাখানিও মহাভারতাদি অপেক্ষা পুরাতন। ইহার আনুমানিক কাল অন্যূন ১০০০০ বৎসর। সে পুরাতন সুশ্রুত সংহিতা প্রতিসংস্কৃত হইয়া নাগার্জ্জুন মুনি কর্ত্তৃক চন্দ্রগুপ্তের কিছু পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমান সুশ্রুতসংহিতা অনধিক ২৪০০ চব্বিশ শত বৎসরের পুরাতন।

দ্বিতীয় চরকসংহিতা।—সুশ্রুতসংহিতার ন্যায় চরকসংহিতাও বহু পুরাতন এবং তাহাও দৃঢ়বল নামক জনৈক পঞ্জাবী পণ্ডিত কর্ত্তৃক এক প্রকার পুনঃ প্রতিসংস্কৃত। চরকের প্রাচীনত্ব বোধক

বিস্পষ্ট প্রমাণ কাশীখণ্ড মধ্যে পাওয়া যায়, * পাণিনীয় গ্রন্থে ও যথেষ্ট পাওয়া যায়। নিম্নে তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইল, দেখুন, চরকসংহিতা কি পরিমাণে পুরাতন।

চরক গুরু অগ্নিবেশ, তদীয় গুরু পুনর্ব্বসু। মহাভারতবক্তা ঋষি পুনর্ব্বসুকে (ইহাঁরই অন্য নাম আত্রেয়) অথবা আত্রেয় ঋষিকে জানিতেন এবং আত্রেয়কৃত চিকিৎসা গ্রন্থও জ্ঞাত ছিলেন। যথা,—

"দেবর্ষিচরিতং গার্গ্যঃ কৃষ্ণাত্রেয়শ্চিকিৎসিতম্।" শান্তি, ১৬৭।

গার্গ্যমুনি দেবচরিত ও ঋষিচরিত বর্ণন করিয়াছেন, আত্রেয় মুনি চিকিৎসা শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারত গ্রন্থে আরও এক কথা আছে। চিকিৎসক কাশ্যপ মুনি সর্পদষ্ট পরীক্ষিতকে চিকিৎসা করিবার জন্য গমন করিলেন।

এই কাশ্যপ যে আত্রেয় মুনির পরিচিত তাহা চরকসংহিতাতেই প্রব্যক্ত আছে। অতএব, আত্রেয়ভাষিত, কাশ্যপকথিত, ও হারীতপ্রোক্ত চিকিৎসা শাস্ত্র সকল মহাভারত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পুরাতন অথবা মহাভারতের তুল্যকালিক বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

আত্রেয়ভাষিত শাস্ত্রই যে অগ্নিবেশ মুনির দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তিনি যে আত্রেয় মুনির শিষ্য, ইহা বোধ হয় চরকপাঠী মাত্রই অবগত আছেন। সুতরাং আত্রেয় ও অগ্নিবেশ এক সময়ের ব্যক্তি, ইহা বলা বাহুল্য। পক্ষান্তরে ইহাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, অগ্নিবেশ-পরিচিত কাশ্যপ মুনি যখন রাজা পরীক্ষিতের চিকিৎসার্থ উদ্যোগী হইয়া ছিলেন, অবশ্যই তখন তাঁহারা পরস্পর তুল্য কালিক। অর্থাৎ আত্রেয়, অগ্নিবেশ ও কাশ্যপ, ইহাঁরা সকলেই

* ধন্বো ধন্বন্তরির্নাত্র চরকশ্চরতীহ ন।
নাসত্যাবপি নো শক্তাবত্র চিন্তাজ্বরে কিল ॥

কাশীখং

রাজা পরীক্ষিতের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং ইহাঁদের শাস্ত্রও তৎকালে প্রচারিত ছিল।

আত্রেয়-শাস্ত্র প্রথমতঃ অগ্নিবেশ কর্ত্তক সংস্কৃত হইয়া প্রচার গামী হইয়াছিল। অনন্তর তাহা অর্থাৎ সেই অগ্নিবেশকৃত সংহিতা চরকমুনি কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়া চরকসংহিতা নামে প্রচারিত হইয়াছিল। সেই জন্যই শেষ প্রতিসংস্কর্ত্তা পুরুষ "অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরকপ্রতিসংস্কৃতে।" এই উল্লেখ করিয়াছেন।

আত্রেয়, অগ্নিবেশ, চরক, ইহাঁরা যে সমধিক প্রাচীন, অথবা ভারতবক্তা ঋষির তুল্যকালিক, তাহা আপনারা ত্রিসহস্র বৎসরের পুরাতন পাণিনীয় শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারিবেন। অনধিক ত্রিসহস্র বৎসরের পুরাতন পাণিনিমুনি স্বকৃত গণপাঠে আত্রেয় ও অগ্নিবেশ দুই মহামুনির উল্লেখ করিয়া উহাঁদের প্রাচীনত্ব পক্ষ সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। যথা—

"গর্গাদিগণ—গর্গ, বৎস, সংকৃতি, অজ, ব্যাঘ্রপাত্, বিদভৃৎ, প্রাচীন, যোগ, অগস্তি, পুলস্তি, রেভ, অগ্নিবেশ, শঙ্খ—" ইত্যাদি *।

"কঠচরকাল্লুক"—এই সূত্রের দ্বারা পাণিনি মুনি চরক শব্দের উত্তরে প্রোক্তার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া তাহার লোপ করিতে বলিয়াছেন। ভাষ্যকার তাহার উদাহরণে বলিয়াছেন, "চরকেন প্রোক্ত মধীতে চরকঃ।" অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি চরক প্রোক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, সে চরক। অতএব; যে চরক ও যে অগ্নিবেশ পাণিনির নিকট পুরাতন, সে চরক ও সে অগ্নিবেশ যে মহাভারতের তুল্য কালিক, তৎপক্ষে কোন ও প্রকার সংশয় উত্থাপন করিবার সুপ্রশস্ত পথ নাই। অপিচ, আত্রেয় শাস্ত্র, অগ্নিবেশের শাস্ত্র ও চরকের সংহিতা, এ সমস্তই যে কলিপ্রারম্ভে প্রস্তুত হইয়াছিল

* "কঠচরকাল্লুক।" সূত্র পাঠ দেখ।

"গর্গাদিভ্যোযঞ্" এই সূত্রের কত্যায়ন বার্ত্তিক ও পাতঞ্জল ভাষ্য দেখ

তাহা আমরা চরকোক্ত আয়ুঃপ্রমাণবিনির্ণয় দেখিয়া অনুমান করিতে পারি। 'বর্ষশতং খল্বায়ুষঃ প্রমাণ মস্মিন্‌কালে *।' এই উক্তির দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে সংহিতা বক্তা ঋষি কলিকালের লোক। সুতরাং কলি প্রথমে কি কলি সন্ধিতে এই চরকশাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

উল্লিখিত প্রমাণের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আত্রের, কাশ্যপ ও অগ্নিবেশাদির শাস্ত্র, রাজা পরীক্ষিতের রাজ্যকালে প্রচারিত ছিল এবং চরকের শাস্ত্র তাহার অত্যল্পকাল পরে প্রস্তুত হইয়াছিল। চক্রপাণিদত্ত লিখিয়াছেন,—

"পাতঞ্জল কৃতেভাষ্যে——"

পাতঞ্জল মুনি চরক প্রতিসংস্কৃত শাস্ত্রের উপর একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কেবল চক্রপাণি লেখেন নাই, ভোজ রাজও একথা লিখিয়াছেন এবং মধ্য কৌমুদী ব্যাকরণকারও উক্ত কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং চরক সংহিতা পুস্তক, পাণিনি ও ভাষ্যকার পতঞ্জলি মুনির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ভাষ্যকার পাতঞ্জলি পাণিনিমুনির অত্যল্পকাল পরেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা অন্যান্য বহু প্রমাণের দ্বারা অনুমিত হইয়াছে। এই সকল তথ্য পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, প্রকৃত চরক সংহিতা গ্রন্থ,পাণিনির শাস্ত্রের পূর্ব্বে মহাভারত শাস্ত্রের সময়ে জন্মলাভ করিয়াছিল। এখন আমরা সে চরক পাইতেছি না। কেন না, সে চরক আবার দৃঢ়বলনামক জনৈক পাঞ্জাবী পণ্ডিতের দ্বারা পুনঃপ্রতি সংস্কৃত হইয়া সমধিক রূপান্তরিত হইয়াছে। যথা ;—

"ইদমন্যূন শব্দার্থং—দোষ বিবর্জ্জিতম্।
অখণ্ডার্থং দৃঢ় বলোজাতঃ পঞ্চনদে পুরে ॥

* ৬ শারীর দেশ।

কৃত্বা বহুভ্যস্তন্ত্রেভ্যো বিশেষাচ্চ বলোচ্চয়ম্ ।
সপ্তদশৌষধাধ্যায়ান্ সিদ্ধিকল্পৈরপূরয়ৎ ॥”

এই দৃঢ়বল কে ? কোন্ সময়ের লোকে ? ইহা আমরা অদ্যাপি জানিতে পারিনাই। দৃঢ়বলের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে আমাদের অনেক সংশয় আছে *। তথাপি আমরা দৃঢ়বল সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রতিসংস্কৃত চরকের অধ্যায় পূরক দৃঢ়বল ১৩০০ বৎসরের পূর্ব্বে কোন এক অনিশ্চিত কালে জীবিত ছিলেন। কেন ? তাহা বিবেচনা করুন।

১৩০০ বৎসরের পূর্ব্বে সাহসাঙ্ক নামক জনৈক বিখ্যাত রাজার সভ্য হরিচন্দ্র বর্ত্তমান চরক সংহিতার উপর একখানি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছিলেন, এই সংবাদ আমরা তদ্বংশীয় মহেশ্বর নামক বিশ্বপ্রকাশ গ্রন্থকারের নিকট শুনিতে পাই। চরক ব্যাখ্যাতা হরিচন্দ্রের পৌত্র মহেশ্বর স্বকৃত বিশ্বকোষের প্রারম্ভে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

“শ্রীসাহসাঙ্ক নৃপতে রণবেদ্যবৈদ্য বিদ্যান্তরঙ্গ পদ মদ্বয়মেব বিভ্রৎ।
যশ্চন্দ্র চার-চরিতো হরিচন্দ্র নামা স্বব্যাখ্যয়া চরক তন্ত্র মলঙ্কাকায় ॥”

*   *   *   *

“তস্যাভবৎ স্নুনুরুদারবাচা বাচস্পতি শ্রীললনা বিলাসী।
সর্ব্বৈদ্যবিদ্যানলিনীদিনেশঃ † শ্রীডল্লনঃ সৎকুমুদাকরেন্দুঃ ॥” ইত্যাদি।

বিশ্ব কোষের সমূদায় প্রারম্ভবাক্যের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করিলে চরকটীকাকার হরিচন্দ্র বৈদ্যের বংশাবলি নিম্নলিখিত প্রকারে নির্ণীত হয়।

* কেহ কেহ এই দৃঢ় বল শব্দকে ব্যক্তি বোধক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, দৃঢ় বল শব্দ চরক ব্যক্তির বিশেষণ। আমাদের বিবেচনায় এ কথা অসঙ্গত ও শাস্ত্ররীতির বহির্ভূত।

† “মল্লণঃ” “ডল্লনঃ” ‘উলণঃ” এই তিনপ্রকার পাঠ দৃষ্ট হয়।

সিদ্ধান্ত সংগ্রহ।
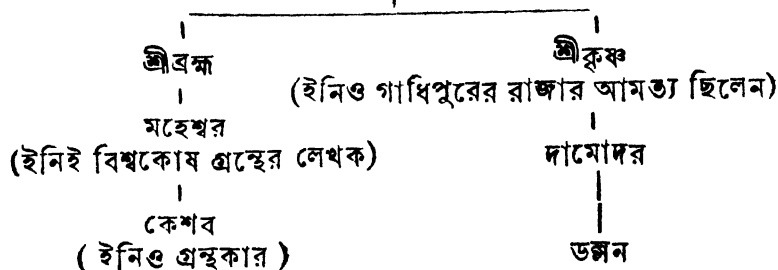
রাজা পরীক্ষিতের রাজ্যকালে অথবা রাজা জনমেজয়ের রাজ্যকালে চরকশাস্ত্র সংকলিত হইয়াছিল। সুতরাং চরকশাস্ত্রের বয়স ৪০০০ বৎসরের অধিক নহে। এখন আমরা যে চরক পাই-তেছি, পড়িতেছি, পড়াইতেছি, মুদ্রাঙ্কিত ও অনুবাদিত করিতেছি, সে চরক দৃঢ়বল নামক জনৈক পঞ্চনদ দেশীয় পণ্ডিতের প্রচারিত। এ চরকের জীবন ১৫০০ বৎসরের পূর্ব্বে ও পতঞ্জলি মুনির পরে, কোন এক আন্তরালিক কালে লুক্কায়িত আছে।

আলোচ্য চরকশাস্ত্রের বিমানস্থানে একটী বচন আছে। যথা—

> সম্বৎসরশতে পূর্ণে যাতি সংবৎসরঃ ক্ষয়ম্।
> দেহিনা মায়ুষঃ কালে যত্র যন্মান মিষ্যতে ॥

এই বচন দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে মানব সৃষ্টির সমকালিক ; সুতরাং ইহা অন্যূন ৩০০০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, উল্লিখিত বচনটী মানব কুলের আয়ু-নির্ণায়ক ভিন্ন শাস্ত্র জীবনের নির্ণায়ক নহে। মানব সৃষ্টির বহুকাল পরে শাস্ত্র সৃষ্টি হইয়াছিল ; অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, আদি সৃষ্টিকালে আয়ুর্ব্বেদোক্ত বস্তু ও তদ্বিষয়ক যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান মানব মনে উদিত ছিল, ক্রমে কতকাল পরে

তত্তাবৎ হইতে শাস্ত্র সংগ্রহ হইয়াছিল। এরূপ বলিলে কোন দোষ হয় না, কিন্তু যেমন মানব তেমনি তাহাদের শাস্ত্র, এরূপ বলা নিতান্ত অসংগত।

উল্লিখিত বচনটীর তাৎপর্য্য এই যে, সত্যযুগের মনুষ্যদিগের অর্থাৎ আদি সৃষ্ট মানবদিগের আয়ু ৪০০ বৎসর ছিল। ক্রমে তাহাদের আয়ু যুগপরিবর্ত্তনের অথবা কাল পরিবর্ত্তনের প্রভাবে শত বৎসর হইয়া পড়িয়াছে। ঋষি সেই হ্রাসক্রম বুঝাইবার জন্য বলিলেন, এক এক শতবৎসর পূর্ণ হয় আর মানবায়ু এক এক বৎসর কমিয়া যায়, এবং ক্রমে হ্রাস হইয়া সম্প্রতিকালে (কলিকালে) মানবায়ু ১০০ বৎসর হইয়াছে সুতরাং কলি প্রারম্ভের পূর্ব্বে অন্যূন ৩০০০০ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, ইহা অবধারিত হইল। সেই অতীত ৩০০০০ আর কলিগতাব্দ কিঞ্চিৎ ন্যূন ৫০০০ সমুদায়ে ৩৫০০০ বৎসর মাত্র বর্ত্তমান যুগ কাল অতিবাহিত হইয়াছে ইহা অবধারিত হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এত অধিক কালের হইলে অবশ্যই বেদসংহিতা মধ্যে কোন না কোন উপলক্ষে উক্ত শব্দের উল্লেখ থাকিত এবং তদ্বোধক প্রমাণান্তরও পাওয়া যাইত। তাহা যখন যায়না ; তখন আর উক্ত শাস্ত্রকে অত অধিককালের বলিয়া অনুমান বা প্রমাণ করা যায় না। তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত বস্তুও তদ্বিষয়ক যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান উক্ত সময় অবগাহন করিয়াছে মাত্র।

দেশীয় লোকের সংস্কার ও আয়ুর্ব্বেদবিদ্যালয়।

স্বাধীন ইচ্ছা স্বাধীন প্রবৃত্তি ও স্বাধীন চেষ্টা মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। স্বাধীন ভাবের ছায়া ভান বা অভিনয়েও হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তাই আজ সাধারণে সকল বিষয়ে স্বাধীনতা লইয়া ব্যস্ত। ধর্ম্ম বল, সামাজিক নীতি বল, রাজশাসন বল, সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবের হুলস্থুল পড়িয়াছে। আজ হিন্দুসমাজের চিররুদ্ধ অবলাগণ অস্ফুটভাষী বালকগণ ও স্বাধীনতার কোলাহলে উন্মত্ত। তাই কখন ও সুরেন্দ্রের কারাবাস কখন বা স্বায়ত্ত শাসন ইত্যাদি ঘটনা লইয়া সামান্য কৃষক পল্লীতেও কলরব শুনা যায়। ভাবিয়া দেখিলে ইহা কিঞ্চিৎ উল্লাসের বিষয় বটে; বহুকাল মূর্চ্ছাপন্ন ভারত সন্তানগণের স্নায়ুশক্তি যে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই তাহার চিহ্ন বটে, কিন্তু ইহাকে প্রকৃত উন্নতি বলা যাইতে পারে না। ভারত সন্তান যে দেশের স্থায়ী মঙ্গল বুঝিতে পারিয়াছে, আপনার স্বত্ব বা স্বার্থ বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার পরিচয় ইহাতে অল্পই আছে। ইহা কেবল হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বা আবেগ মাত্র। প্রকৃত উন্নতির দিগে এক পদও অগ্রসর নয়। কেননা যাহা গৃহস্থগণের নিত্য প্রয়োজনীয়, যাহার অভাবে একবেলাও গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না তাহার জন্যও যদি আমাদিগকে সর্ব্বদা পর মুখাপেক্ষী হইতে হইল, তাহাহইলে আমরা আপন স্বার্থ কি বুঝিলাম? ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ইউনিভারসিটির তাড়নায় প্রতিবৎসর শতশত পণ্ডিতের নাম শুনা যাইতেছে বটে, কিন্তু ইহাদের বিদ্যাশিক্ষা কেবল দাসত্ব শিক্ষারই অনুকূল। উচ্চবেতনের দাসত্ব জুটিলেই বিদ্যা সার্থক এবং জন্ম সার্থক বলিয়া যাহাদের ধারনা,

তাহাদের উন্নতি অনেকদূরে অবস্থিত। প্রতি বৎসর রাশি রাশি পুস্তকের জন্ম হইতেছে বটে; অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহার অধিকাংশই অসার উপন্যাস ও নাটক ইত্যাদি মাত্র। বিজ্ঞান বা শিল্প চর্চ্চা প্রায় দেখিতে পাইবে না। এতৎসম্বন্ধীয় কোন পুস্তক বা কোন পত্রিকার আদরও নাই। যদিও কোন ব্যক্তি বিদেশ হইতে শিল্প বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিয়া আইসেন; তিনি আবার উপযুক্ত অর্থসাহায্যের অভাবে অভ্যস্ত বিদ্যা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না।

ইহার কারণ কি? আমাদের দেশ আজিও বিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতি কার্য্যকরী বিদ্যার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে নাই। ইংলণ্ড প্রভৃতিদেশ যে, কেবল বিজ্ঞানের বলে, শিল্পের কৌশলে, বাণিজ্যের সাহায্যে আমাদের দেশ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উন্নত ও সৌভাগ্যবান্ ইহা কেহ দেখিয়াও দেখেন না। একমাত্র বিজ্ঞানের শক্তিতে ভারতের অকিঞ্চিৎকর তৃণও যে তাহাদিগকে অমূল্যরত্ন উপঢৌকন করিতেছে, ইহা কেহ জানিয়াও জানেন না। আমরা কেবল দেশোন্নতি, স্বাধীনতা ইত্যাদি কতকগুলি আপাত-শ্রুতিসুখদ শব্দ লইয়া হুল স্থূল বাধাইতে পারি,—বক্তৃতার ঘন গর্জ্জন শুনাইতে পারি; কিন্তু প্রকৃত কার্য্যসাধনী বুদ্ধি আমাদের কোথায়? দেশের প্রকৃত উন্নতি কি প্রকারে হয়? প্রকৃত স্বাধীনতার বা পন্থা কি? কি কি উপকরণ চাই? এই সকল বিষয়ে আমরা কয়জন ব্যক্তি চিন্তা করিয়া থাকি? একটা কোন হুজুক উঠিলেই দেশশুদ্ধ লোক কোন বিচার না করিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হই। আজ ম্যাডাম্ ব্লাভাস্কী যোগের হুজুক দেখাইলেন, উচ্চ নীচ শত শত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য হইলাম। কাল একজন বিজ্ঞানের ভাণ করিয়া ধর্ম্মের বক্তৃতা করিলেন, আবাল বৃদ্ধ বনিতা একবারে অন্ধ হইলাম। অমুক দিন এক ফকির আসিয়া জলে ফুৎকার দিলেন সহস্র ব্যক্তি তাঁহার গোঁড়া হইলাম। আজ অমুক

সাহেব অমুক বিষয়ের সুখ্যাতি করিলেন আমরা তাহা অভ্রান্তভাবে গ্রহণ করিলাম। আবার তাহার পর দিবসই আর এক সাহেব সেই বিষয় অকর্ম্মণ্য বলিয়া মীমাংসা করিলেন, আমরাও তাহা অকাট্য বলিয়া গণ্য করিলাম। এইরূপ অদূরদর্শী অসারগ্রাহী অব্যবস্থিত-মতি দেশ যে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর পরিত্যক্ত ভূমি হইবে, ইহা বিচিত্র কি? আমরা সকল বিষয়েই কেবল কালের গতি, ভারতের গ্রহবৈগুণ্য ইত্যাদি অযথা দোষারোপ করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা স্বয়ংই যে অপদার্থ ও কুসংস্কারান্ধ তাহা এক বারও ভাবি না। ফল আমরা আত্মবিষয়ে নিতান্তই দৃষ্টিহীন। সে দিন ইংলণ্ডগতা বিদুষী রমা বাই যথার্থই বলিয়াছেন,--"দেশীয় যুবকেরা ম্যাটসিনিকে নিয়া আস্ফালন করেন, অথচ প্রতাপসিংহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপও করেন না ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ভারতবাসী 'আশ্চর্য্য' মানুষ-জাতির স্বাভাবিক নিয়মের সঙ্গে এই আশ্চর্য্য জন্তুর কোন সম্পর্ক নাই। হতভাগ্য ভারতের এ অবস্থা কতকাল থাকিবে বলিতে পারি না। আমাদের দেশীয়গণের মধ্যে দেশীয় লোকের বড় আদর নাই, ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা সত্যের গবেষণার কথা বলিবার সময় অনেকানেক বার গ্যালিলিউর গুণ-গান করেন, (তিনি স্তবের উপযুক্ত বটেন) কিন্তু ভাস্করাচার্য্যের নাম কয় জনের মুখে শুনা যায়? কত কাল হইল ক্রীয়র সাহেব লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহার স্মরণ চিহ্ন রাখিবার জন্য বোম্বায়ে অল্পকালের মধ্যে অনেক সহস্র টাকা চাঁদা জমিয়া গেল, কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় অধ্যাপক ছত্রের (ইনি বোম্বাই অঞ্চলের অদ্বিতীয় জ্যোতিঃ-শাস্ত্রবেত্তা ও অধ্যাপক ছিলেন) স্মরণ চিহ্ন কোথায়? ইংরাজ প্রভুদিগকে বল্ (Ball) দিতে ধনিগণ উৎসুক, ভারতের উপকার করিতে তাঁহারা কিন্তু কুণ্ঠিত হন।" কেবল রমাবাইর মুখেই যে আমরা একথা শুনিলাম, এমত

নহে। অনেক অনেক শিক্ষিত পুরুষ-প্রবর-মুখেও এরূপ কথা সময়ে সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়। অতি দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহারা বলেন, তাঁহারাও বিদেশীয় ভাবে উন্মত্ত এবং সেই দলেরই পোষক। সুতরাং পলায়মান চোর ধরিতে গিয়া চোরও ধর ধর বলিয়া চীৎকার করার ন্যায় ভাব দাঁড়াইয়াছে। কবে যে আমাদের এই মোহতিমির দূর হইবে ভ্রান্তিনিশার অবসান হইবে,তাহা বলাযায় না। কবে যে আমরা নিজ অভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার পূরণ করিতে পারিব, নিজ প্রয়োজনীয় উপকরণ সকল নিজেরা সংগ্রহ বা প্রস্তুত করিতে শিখিব, তাহারও স্থিরতা নাই। ফলকথা আত্মানুভূতি, আত্মজ্ঞান ও আত্মনির্ভর না জন্মিলে কস্মিন্‌কালেও কোনদেশ উন্নতি-সোপানে অধিরোহণ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। কেবল পরের বিদ্যা, পরের ধন ও পরের বলে জ্ঞানবান্, ধনবান্ ও বলবান্ কত দিন থাকা যায়? দেবমাতৃক দেশের শস্য সম্পত্তির উপর বিশ্বাস কি? দেশকে উন্নত ও আপনাদের অবস্থা ভাল করিতে হইলে আপনাদের সমুদায় আত্মশক্তির উৎকর্ষ করা অগ্রে আবশ্যক।

"পরং প্রযত্নমাতিষ্ঠেৎ তস্মাৎ স্বগুণসম্পদি"

এই মহামন্ত্রে সকলেরই দীক্ষিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা আত্মদোষে মনুষ্যোচিত সমুদায় গুণে বিবর্জ্জিত হইয়াছি। আজ আমরা যে বিষয় প্রতিপাদনের জন্য এই কথা গুলি উত্থাপন করিলাম, তাহা লইয়া আজকাল অনেকেই আন্দোলন করিয়া থাকেন। আমাদের দেশীয় চিকিৎসার যাহাতে পুনরুন্নতি হয়, দেশীয় ঔষধ সকল যাহাতে আমাদের উপকারে আইসে, দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যার যাহাতে সুন্দর চর্চ্চা হয়, আত্মশরীর রক্ষার্থে পরদেশের মুখাপেক্ষী না হইতে হয়, এই বিষয় লইয়া অনেকেই আন্দোলন করিতেছেন, আজ পনর বৎসর অতীত হইল এই কলিকাতা মহানগরীতে সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী নামে এক সভা সংস্থাপিত হয়,সেই সভায় অনেক ধনী এবং

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সংশ্রব ছিল। উক্ত সভার সম্পাদক ও সভ্যগণ আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য একবার পরামর্শ ও চেষ্টা করেন এবং কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার হইতে পারে, এই বিষয়ে প্রধান প্রধান কবিরাজগণের মত সংগ্রহ করেন, কিন্তু সভার অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বেই তাঁহাদের পরামর্শ ও চেষ্টা অন্তর্হিত হয়। তৎপরে কিছু দিন এই বিষয়ে আর বিশেষ উচ্চবাচ্য ছিল না। তৎপরে আজ প্রায় ৫ বৎসর অতীত হইল অম্বষ্ঠ-সম্মিলনী নামে এক বৈদ্যসভা সংস্থাপিত হয়, এই সভার সম্পাদক এবং সভ্যগণও আয়ুর্ব্বেদের পরীক্ষা ও উন্নতির জন্য কথঞ্চিৎ চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাঁদের চেষ্টাও আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন ফলোপধায়িনী হয় নাই। ফলোপধায়ক না হওয়ার যে সকল কারণ আছে, তন্মধ্যে বৈদ্যভিন্ন জাতিকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার না দেওয়াও একটী কারণ। সভা এবিষয় লইয়া অনেক বৈদ্যের নিকট ঐরূপ কার্য্যের মতও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিলেন না। যে সময়ে ব্রাহ্মণগণ ধ্যানে নিমগ্ন, ক্ষত্রিয়গণ রাজকার্য্য-পরায়ণ, শূদ্রগণ দাসত্বে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময়ের সহিত তুলনা করিলে, ভারতের পূর্ব্বতন সামাজিক অবস্থা ও রীতিনীতি কতদূর পরিবর্ত্তিত ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক্ষণে ভারত এক নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছে। সকল বিষয়েই ভারতের নূতনত্ব; সকল জাতিই জ্ঞানলোলুপ; যে পবিত্রবেদে দ্বিজাতিগণেরই সম্পূর্ণ অধিকার ছিল, এক্ষণে ম্লেচ্ছজাতি সেই বেদের অধ্যাপক। জ্ঞানের নিকটে জাতি-বিভাগ আর নাই। যাহার যেমন শক্তি তদনুসারে জ্ঞান উপার্জ্জন করাই এক্ষণে গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং শিক্ষা বিষয়ে ঐরূপ জাতি বিচারের ব্যবস্থা করা বোধ হয় অম্বষ্ঠ-সম্মিলনীর উচিত হয় নাই। তবে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন রুচি-

সম্পন্ন, তাঁহাদের একরুচিতা সম্পাদনার্থে উক্ত সভা চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। এখনও বৈদ্যদের মধ্যে এমন কুসংস্কারাপন্ন লোক আছেন যে, তাঁহাদের সংস্কারের বিষয় আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আয়ুর্ব্বেদ বা চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা বিবেচনা করিয়া সহজেই এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তিই নাই। শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও উপস্থিত রোগের প্রতীকার করাই আয়ুর্ব্বেদের প্রধান উদ্দেশ্য, যখন পবিত্র ব্রাহ্মণ অবধি অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত সকল জাতিই শরীরী এবং সেই শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগনিবারণ সকল জাতির আবশ্যক, তখন শরীরধারী মাত্রেরই এই অমৃতময়ী বিদ্যা পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যে শরীর সর্ব্ব কার্য্যের প্রধান সাধন, তাহার হিতাহিত পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য অন্য ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হওয়া অসভ্য সমাজের লক্ষণ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। মানব সমাজের কথা দূরে থাকুক, বনচর পশু, জলচর মৎস্য ও খেচর পক্ষীদিগকেও যদি আয়ুর্ব্বেদের নিয়ম শিক্ষা দিতে পারা যাইত, তাহা হইলে বোধ হয় জগতের আরও মঙ্গল সাধিত হইত। অতএব আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদপরীক্ষা অথবা আয়ুর্ব্বেদীয় সভায় মনুষ্য সমাজের সর্ব্বসাধারণ জাতির প্রবেশের কোন বাধাই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্ববিধাতার সৃষ্ট চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির উপভোগে যেমন জাতিনির্ব্বিশেষে অধিকার আছে, তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ সমূহের তত্ত্ব পরিজ্ঞান বিষয়েও সর্ব্ব সাধারণের অধিকার তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। চিন্তা করিয়া দেখিলে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পদার্থবিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নয়।

বিশেষতঃ যাঁহারা কোন নূতন বিষয়ের আবিষ্কার বা লুপ্তপ্রায় বিষয়ের উদ্ধার সাধনে যত্নশীল হয়েন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত বিদ্যাবুদ্ধি অথবা ক্ষমতা যতই সংগ্রহ করিতে পারেন ততই

তাঁহাদের কার্য্য-সৌকর্য্য হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ মৃতপ্রায় শাস্ত্র; ইহার এক এক অঙ্গ এত বিস্তীর্ণ, এত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পরিপূর্ণ ও এমন জটিল, যে, পৃথিবীর সমুদায় লোক সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল আয়ুর্ব্বেদের চিন্তা করিলেও কোন কালে এই বিদ্যা পূর্ণাবয়ব হইবে বোধ হয় না। সুতরাং কতিপয় পরিমিত ব্যক্তি এই অপার সাগরের একটী বালুকা কণাও সংগ্রহ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ স্থল।

যাঁহারা মনে করেন, পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে যে কোন বিদ্যা, জাতি সাধারণগত ছিল না, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষত্রিয়ের শস্ত্রবিদ্যা ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই কঠিন নিয়ম বা এই দোষই সমুদায় শাস্ত্রের লোপ পাওয়ার অন্যতম কারণ। যদি বিদ্যা সাধারণজাতিগত হইত, তাহা হইলে উহা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত; সুতরাং এতদূর বিলয়ের সম্ভাবনা ছিল না এবং তাহার অনুসন্ধানের জন্য এত লালায়িত হইতেও হইত না। আজ সমুদায় ভারত পর্য্যটন এবং তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও বৈদ্যশাস্ত্রে একটী প্রকৃত পণ্ডিত পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ স্থল।

যাঁহারা মনে করেন চিকিৎসা অম্বষ্ঠগণেরই বৃত্তি, ইহাতে অন্যের অধিকার নাই, অন্য জাতি এই বৃত্তি অবলম্বন করিলে শাস্ত্রের নিয়ম-লঙ্ঘনজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়, তাঁহাদের ইহা বিবেচনা করা উচিত, যে, শাস্ত্রের যাবতীয় নিয়ম আমাদের মঙ্গলের জন্যই নিবদ্ধ হইয়াছে, আবশ্যকতা অনুসারে দেশকাল পাত্র প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া পুরাতন নিয়ম পরিবর্ত্তন এবং তাহার স্থলে সংসারের মঙ্গল-জনক নূতন নিয়ম স্থাপন করা সম্বন্ধেও আমাদের শাস্ত্রের অতি সরল অনুমতি আছে। নূতন নিয়ম প্রচলন করায় শাস্ত্রের কোন রূপ অবজ্ঞা করা হয় না; বরং তদনুসারে কার্য্য করিলে শাস্ত্রের গৌরবেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এমন দিন গিয়াছে

যে সময় এই ভারতবর্ষে বিবাহের নিয়ম ছিল না; গোমাংসও পবিত্র উপাদেয় খাদ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। তৎপরে ঋষিগণ ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া বিবাহের বিধিস্থাপন ও গোমাংস ভোজন রহিত করিলেন। অতি প্রাচীন কালে ইত্যাকার যে সকল আচার অতি গৌরবের বিষয় বা অনিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল বর্ত্তমান কালে তাহার উল্লেখেও পাপের আশঙ্কা হয়,মুখে আনিলে অনেকের নিকট তিরস্কার ও উপহাস-ভাজন হইতে হয়,কিন্তু জগৎ এমনই পরিবর্ত্তনশীল যে, কালে অন্যান্য পদার্থের ন্যায়, ইহার আচার ব্যবহারেরও পরিবর্ত্তন প্রযোজনীয় হইয়া উঠে,যখন পরিবর্ত্তনের এইরূপ প্রয়োজন অনিবার্য্য হয়, তখন সমাজ অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া থাকে। এইরূপে পূর্ব্বকাল প্রচলিত অনেক নিয়মের পরিবর্ত্তন বর্ত্তমানে পরিলক্ষিত হয়। সমাজের মঙ্গলার্থে সময়ে সময়ে এইরূপ কতশত নূতন নিয়ম স্থাপন এবং পুরাতন নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। চরক এবং সুশ্রুতে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণেরই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকার দেখাযায়; হয় ত সেই সময়ে অম্বষ্ঠজাতির উদ্ভাবনই ছিল না। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রাবল্য হইতেই চিকিৎসাশাস্ত্র অম্বষ্ঠগণের বৃত্তি বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। সুতরাং ইহাও যে প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তিত নিয়ম, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারেন। ফলকথা বেদ, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহে যে সকল বিধি বা নিষেধ দেখা যায়, সংসারের মঙ্গলসাধন ভিন্ন সেই সকলের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আমরাও যদি সাধারণ জাতির প্রতি বৈদ্যশাস্ত্রের অধিকার দান করিয়া শাস্ত্রের উন্নতি এবং সমাজের হিত সাধন হইতে দেখিতে পাই, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে?

কোন কোন ব্যক্তির এইরূপ সংস্কার আছে, যে, নূতন নিয়ম সংস্থাপন এবং পুরাতন নিয়ম পরিবর্ত্তন বিষয়ে ঋষিগণেরই

ক্ষমতা ছিল আমাদের সেই ক্ষমতা কোথায়? তাঁহাদের ইহা বুঝা উচিত, যে,জ্ঞানের প্রবাহ অনন্ত। যতকাল নরসমাজ বিদ্যমান থাকিবে,তত কাল ইহার বিশ্রাম নাই। আধুনিক ব্যক্তিগণের দ্বারাও এমন কত বিদ্যা, কত পদার্থ, কত নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা ঋষিগণ চিন্তা করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহস্থল। সেই সমস্ত দ্বারা কি জগতের উপকার হইতেছে না? অতএব জটাবল্কল ইত্যাদি বেশ-ভূষাকে ঋষি না বলিয়া কেবল মঙ্গলময় বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগকে ঋষি বলিলেই কি ভাল হয় না? দ্রব্যের শক্তি বা নিয়মের গুণ বক্তৃভেদে কখনও প্রকাশ পায় না। তাহার নিজের যে শক্তি বা গুণ আছে তাহাই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন বৈষয়িক নীতিবেত্তারা বলেন যে,—

(১) কোন বিদ্যা বা ব্যবসায় কোন নির্দ্দিষ্ট জাতিগত হইলে অন্য জাতির মধ্যে যাহারা সেই বিদ্যা বা ব্যাবসায়ে স্বাভাবিক প্রতিভা-সম্পন্ন, তাহাদিগকে পাওয়া যায় না। সুতরাং এরূপ নিয়মের দ্বারা সমাজের ক্ষতি হয়।

(২) পরিমিত ব্যক্তি বা জাতির প্রতি কোন বিদ্যা বা ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট থাকিলে তাহা বিস্তারিত হইতে পারে না। কাযেই উহার মূল্যও অধিক হয়, সুতরাং ইহাতেও সমাজের ক্ষতি হয়।

(৩) ব্যবসায় বা বিদ্যা জাতি-সাধারণ-গত না হইলে অর্থ সাধারণ-গত হয় না। এইরূপ যে কোন প্রকারে হউক চিকিৎসা জাতি-সাধারণ-গত হওয়াই উচিত। এই উদার নিয়মের অনুসরণ না করিলে অম্বষ্ঠ সম্মিলনীর পক্ষে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সাধন করা দূরে থাকুক সাধারণের সহানুভূতি পাইবেন কি না সন্দেহের বিষয়। আয়ুর্ব্বেদ সমিতি যে গবর্ণমেণ্ট সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাপিত বিদ্যা মন্দিরের বিশাল দ্বার সকল জাতির জন্যই উন্মুক্ত রহিয়াছে।

আমরা দেশীয় লোকের সংস্কারের কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর অগ্রসর হইলাম। সুতরাং এস্থলে অম্বষ্ঠ-সম্মিলনীর আয়ুর্ব্বেদীয় সভার সঙ্কীর্ণ নিয়মের বিষয় উত্থাপন করা কেহ কেহ হয় ত অনধিকার চর্চ্চা বা অপ্রাসঙ্গিক মনে করিতে পারেন। তাঁহারা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন, উক্ত বিষয়ের উল্লেখ করা আমাদের প্রসঙ্গ-বহির্ভূত নহে। কেন না, যখন আয়ুর্ব্বেদের সঞ্জীবন-সাধন আমাদের সঞ্জীবনীর উদ্দেশ্য, তখন তাহার উন্নতিসম্বন্ধে যাহা কিছু অন্তরায় আছে,——যাহা কিছু কণ্টক আছে, সামান্যই হউক আর বৃহৎই হউক, সে সমুদয়গুলি সাধারণকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু বিঘ্নের ধ্বংস না হইলে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। তবে যদি আমাদের মত উক্ত সভার কোন সভ্যের মনঃপুত না হয়, অথবা আমাদের সংস্কার ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে তিনি কোন প্রকাশ্য পত্রিকায় আমাদের সহিত এ বিষয় লইয়া বিচার করুন। তাহা হইলে বিচার-মুখে সত্য নিষ্কাশিত হইলে, অনেকের ঐরূপ ধারণা তিরোহিত হইতে পারে।

উপরে কতক গুলি বৈদ্যের স্বার্থ-রক্ষার জন্য এক প্রকার সংস্কারের উল্লেখ করা গেল। এতদ্ভিন্ন সকল সম্প্রদায়ের লোকের সংস্কারের বিষয় উত্থাপন করিতে গেলে সংস্কার-কাণ্ড নামে এক বৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠে। সুতরাং এস্থলে আমরা বৈদ্যচিকিৎসাসম্বন্ধে অনেকের মনে যে সকল সংস্কার জন্মিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকটী মাত্রের উল্লেখ করিতেছি।

অনেকে বলেন "বৈদ্যদিগের চিকিৎসা শাস্ত্র অনেক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, সুতরাং উহার চিকিৎসা তৎকালীন মানবগণের পক্ষেই উপযুক্ত ছিল। এখন কালের পরিবর্ত্তনে মনুষ্যের প্রকৃতি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং অনেক প্রকার

নূতন রোগেরও সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং সেই বহুকালের পুরাতন শাস্ত্রানুসারে চিকিৎসা কোন প্রকারেই এখনকার মানবগণের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে না।"

আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র যে অতিপ্রাচীন, এমন কি অনাদি বা অপরিজ্ঞাত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার আদি নির্ণয় হয় না বলিয়াই হিন্দুগণ ইহাকে অনাদি ও নিত্য বলিয়া থাকেন। পরন্তু ইহা অতি প্রাচীন হইলেও সৌত্রিক আকারে লিখিত। শাস্ত্রীয় সূত্র যত কেন প্রাচীন না হউক, যত কেন বয়ঃ-প্রাপ্ত না হউক, তাহাতে প্রকৃত দৃষ্টি জন্মিলে লক্ষ বৎসরের পূর্ব্বের বা পরের ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করা যায়। এবং সূত্রাংশ দৃঢ়ীকৃত হইলে কোন ক্রমেই ইহার সত্য স্খলিত হইতে পারে না। শাস্ত্র সূত্রাকারে উপস্থিত হইলে কতদূর ক্ষমতাপন্ন হয়, ইহা আমরা ঔষধসূত্র নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছি। চিকিৎসা-শাস্ত্র মানব-রচিত কাল্পনিক নিয়ম নহে। উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রাকৃতিক সত্যাংশের সংগ্রহ বা সমষ্টি। সুতরাং যত কাল প্রকৃতি, ততকাল ইহার কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকিবে। জলে পিপাসা-নিবারণ হয়, আহারে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, ইত্যাদি যেমন চিরদিনের জন্যে সত্য, তেমন তেওড়ীতে বিরেচন হয়; অহিফেনে কোষ্ঠ রোধ হয়, ইত্যাদিও তেমন চিরদিনের জন্যে সত্য, তবে চিকিৎসা-শাস্ত্রের সম্পূর্ণ সূত্র নির্ম্মাণ হয় নাই এবং দেশ কাল প্রভৃতি অনুসারে কোন অংশের পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন করিতে হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

সেই সকল পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্ত্তন কি কেবল অশ্রদ্ধাদ্বারা—জ্রূকুটি বিক্ষেপ দ্বারা সংসাধিত হইবে, না সকলের সমবেত চেষ্টায় বহুপরীক্ষান্তে সাধিত হইবে? কোন বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ জনগণের মত সংগ্রহ করিয়া

বিশেষ বিবেচনা সহকারে কার্য্য সাধন আবশ্যক, নতুবা কেবল দোষের উল্লেখ মাত্র করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে কিরূপে সে বিষয়ের উন্নতি হইবে? যদি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে কোন্ কোন্ বিষয়ে কিরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহার সংগ্রহ এবং সাধ্যানুসারে তাহার মীমাংসা জন্য চেষ্টা করিতে সঞ্জীবনী প্রস্তুত আছে, অনুসন্ধিৎসুবর্গের অভিপ্রায় জানিতে পারিলে সঞ্জীবনী কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিবে।

অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে বৈদ্য শাস্ত্রের ঔষধ নিতান্ত 'অন্ধকারে ডেলামারার ন্যায়'। বৈদ্যগণ শবচ্ছেদন করেন না, সুতরাং শারীরিক যন্ত্র বা তাহাদের ক্রিয়ার বিষয় ইহারা কিছুই জানেন না। ইহাদের শাস্ত্রও কেবল অনুমানের উপরে লিখিত, শারীরিক যন্ত্রাদির প্রত্যক্ষের সহিত ইহার কোন সংস্রবই নাই, অতএব উহাদের চিকিৎসা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য।

যাহারা বৈদ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন বা স্পর্শ করেন নাই, তাহাদের ঐরূপ সংস্কার হওয়া বিচিত্র নহে। যে সকল জাতি এইক্ষণে সভ্যতম বলিয়া গণ্য, ইহারা যৎকালে আমমাংস ভোজন করিয়া পশুর ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিত; চিকিৎসাশাস্ত্র কি? ইহাদের কল্পনায়ও উপস্থিত হয় নাই। তৎকালে হিন্দুগণ শারীরিক চর্চ্চার নিমগ্ন ছিলেন। নরদেহ কিরূপে ব্যবচ্ছেদ করিতে হয়, শারীরিক যন্ত্রাদির আকার প্রকার গতিবিধি কিরূপ, এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে ত্রুটি করেন নাই। *

---

* তস্মাৎসমস্তগাত্রমবিষোপহতমদীর্ঘব্যাধি-পীড়িতমবর্ষশতিকং নিঃসৃষ্টান্ত্র-পুরীষং পুরুষম্ বহন্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধং পঞ্জরস্থং মুঞ্জবল্কলকুশশণাদীনামন্যতমেনাবেষ্টিতাঙ্গমপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ সম্যক্প্রকুথিতঞ্চোদ্ধৃত্য ততো দেহং সপ্তরাত্রাদুশীরবালবেণুবল্কলকূর্চানামন্যতমেন শনৈঃশনৈরবঘর্ষয়ংস্ত্বগাদীন্ সর্ব্বানেববাহ্যাভ্যন্তরাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষান্ যথোক্তান্ লক্ষয়েচ্চক্ষুষা।

যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া ইংলণ্ড অল্পদিন মাত্র জ্ঞাত হইয়াছেন, যদ্দ্বারা ইংরাজীচিকিৎসার পূর্ব্বস্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহা হিন্দুগণ অনেক সহস্র বৎসর পুর্ব্বে পরিজ্ঞাত ছিলেন। হিন্দুগণের শাস্ত্র যাহারা কাল্পনিক বলেন, তাহাদের ভ্রান্তি ভিন্ন কিছুই নহে।

আজি কালি কতকগুলি ব্যক্তির এইরূপ সংস্কার দাঁড়াইয়াছে যে, "বৈদ্যচিকিৎসা বৈজ্ঞানিক নহে। উহা যৎপরোনাস্তি ভ্রম-সঙ্কুল।" যাহারা এইরূপ বলেন, তাহারা বৈদ্যশাস্ত্র কখন স্পর্শও করেন নাই, কেবল হুজুকের কলরবেই চালিত ও সাহেবী সিদ্ধান্তে অন্ধ। ইংরাজের ন্যায় স্বার্থপরায়ণ জাতি জগতে আর নাই বলিলেও হয়। ইহারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য না করিতে পারেন এমন কার্য্য নাই। হিন্দুচিকিৎসার প্রাদুর্ভাব হইলে ইহাদের স্বার্থের হানি হইবে, ইংরাজীচিকিৎসার কল্যাণে প্রতি বৎসর যে লক্ষ লক্ষ টাকা নিজেদের উদরসাৎ হইতেছে, তাহার মূলে কুঠারাঘাত পড়িবেক, সুতরাং পাকে প্রকারে যেরূপেই হউক আমাদের চিকিৎসায় যে দোষারোপ করিবেন, অসার ও অপদার্থ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, ইহাও তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

দৈহিক উপকরণের অযথা হ্রাস বৃদ্ধি অথবা ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকদিগের মতে দৈহিক তাড়িতের (পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসাঃ) অসামঞ্জস্যে (Disturbance of the Equilibrium of the Animal Magnatism) যে রোগ উৎপন্ন হয় তাহা আর্য্য ঋষিগণ সহস্র বৎসর পুর্ব্বে উপলব্ধি করিয়া সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। কালে বিদ্যার-জ্যোতিঃ যতই বৃদ্ধি পাইতেছে উক্ত জ্ঞান-গর্ভ বাক্যের মহিমা ততই প্রতিপাদন করিতেছে। যে রোগের প্রতি দেখ না কেন উহা অসমতার পরিণাম মাত্র।.. শোণিতে জলীয় ভাগ অধিক হইলে উহা রোগ, লৌহের অংশ অল্প হইলে রোগ। পাকস্থলীতে অম্লের আধিক্য

হইলে রোগ, অম্লের অল্পতাও রোগ। মস্তিষ্কে শোণিত প্রবাহ অধিক হইলে রোগ, অল্প হইলেও রোগ—অধিক স্নিগ্ধতাও রোগ, অধিক রুক্ষতাও রোগ।

হ্রাসের বৃদ্ধি, বৃদ্ধির হ্রাস, সমতার বিধান যে চিকিৎসার মূল ভিত্তি; তাহা বিজ্ঞান সম্মত নয় কেন? কোন অশিক্ষিত লোকের মুখে জ্বরাদি কোন রোগের উৎপত্তিবিষয়ক রূপকে লিখিত শ্লোক বিশেষের ব্যাখ্যা শুনিয়া ইহাকে অবৈজ্ঞানিক বলা ধৃষ্টতার কর্ম্ম ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বৈদ্যক চিকিৎসার অষ্টাঙ্গ অনুসন্ধান কর, দেখিবে শিক্ষা প্রদানের প্রকৃষ্ট পদ্ধতির অভাবেই ইহা অন্ধকারময় ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতিতেই কতকগুলি কুসংস্কারাপন্ন লোক আছেন। যে ইংরাজজাতি আজ বিজ্ঞান লইয়া এত গৌরব ও আস্ফালন করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে চিকিৎসাবিষয়ে কতদূর কুসংস্কার আছে, তাহা শুনিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। একজন ইংরাজসমাজ-লেখক বলেন—

"শিরো-বেদনা-রোগ সম্বন্ধে ইংরাজদিগের এই কুসংস্কার আছে যে মাথার চুল কাটিয়া যদি কেহ পথে ফেলিয়া দেয় এবং একটা পাখী যদি সেই চুলের কয়েকটী মুখে করিয়া উড়িয়া যায়, তাহা হইলে ভয়ানক শিরো-বেদনা হয়। সসেক্স জিলার ইংরাজ কৃষক-দিগের মধ্যে এই কুসংস্কারের বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। এই কুসংস্কারে বিশ্বাসী ইংরাজগণ মাথার চুল কাটিয়া তাহা অনাবৃত স্থানে ফেলিয়া দিতে দেয় না।"

স্ত্রীলোকদিগের হিষ্টিরিয়া রোগ সম্বন্ধেও অনেক ইংরাজের কুসংস্কার আছে। তাঁহাদিগের বিশ্বাস আছে যে অনেক ঔষধে এ রোগের কিছু হয় না। তুক্ তাক্ই ইহার প্রকৃত ঔষধ। এ রোগের আরোগ্য জন্য তুক্ তাক্ করিতে পারে, ইংলণ্ডের পাড়া-গাঁয়ে এরূপ বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দেখা যায়। এ রোগের আরোগ্য

সম্বন্ধে আর একটী কুসংস্কারাত্মক উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। রোগী কয়েকটী পুরুষের নিকট হইতে কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া যদি একটী অঙ্গুরীয় ক্রয় করিয়া পরিধান করে, তাহা হইলে হিষ্টিরিয়া-রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোক আরোগ্য হয়, এ কুসংস্কার ইংলণ্ডের অনেক স্থলে প্রচলিত দেখা যায়।

পাণ্ডুরোগের আরোগ্য জন্য কোন কোন ইংরাজ এই কুসংস্কার-মূলক উপায়টী অবলম্বন করিয়া থাকেন ;—ছাই ও মাটী লইয়া কতকগুলা গোল্লা পাকাইয়া তাহা গোবরের গাদার নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া আসিতে হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা পাণ্ডুরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে, এরূপ বিশ্বাসসম্পন্ন ইংরাজ আজও অনেক দেখা যায়।

কর্ণওয়াল জিলার লোকের বিশ্বাস যে খোঁড়া ব্যক্তি যদি এক রাত্রি একটা প্রস্তরের উপর শয়ন করিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে সে আর খোঁড়া থাকে না। আজও ঐ জিলার কোন কোন খোঁড়া লোক ঐ উপায়ে আরোগ্য লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

অদ্যাপি ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে কোন কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকে তুক্ তাক্ করিবার ক্ষমতার ভাণ করিয়া থাকে। অনেকে ইহাদিগের কথা বিশ্বাস করিয়া ইহাদিগের নিকট রোগ আরোগ্য হইবার জন্য আসিয়া থাকে। শরীরে কোন স্থানে বেদনা হইলে ইহারা মন্ত্র-পূত এক প্রকার সুক্ষ্ম রজ্জু দেয়। সেই রজ্জু যেখানে বেদনা হয়, সেই স্থানে পরিধান করিতে হয়।

পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইলে অনেক ইংরাজ ভিক্ষালব্ধ অর্থে অঙ্গুরীয় ক্রয় করিয়া পরিধান করিয়া থাকে। পেটবেদনা হইলে পেটের উপর ক্রশ্ রক্ষা করা আরোগ্যের একটী উপায়, ইহাও অদ্যাপি অনেক ইংরাজের বিশ্বাস। কোন স্থানে আঘাত লাগিলে

আহত স্থানের উপরে একটী সূতা বাঁধিয়া নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটী উচ্চারণ করিলে তাহা আরোগ্য হইয়া থাকে, এই কুসংস্কার ইংলণ্ডের অনেক স্থানে অদ্যাপি প্রচলিত ;—

Our Saviour rade,
His forefoot slade,
Our Saviour lighted down ;
Sinew to sinew—joint to joint,
Blood to blood, and bone to bone,
Mend thou in God's name.

চক্ষুতে আঞ্জনি হইলে তাহা আরোগ্য করিবার জন্য কুসংস্কারাপন্ন ইংরাজগণ নিম্নলিখিত প্রকার উপায় অবলম্বন করেন ;—শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চন্দ্র দেখিয়া একটী কৃষ্ণকায় বিড়ালের লেজ ধরিয়া তাহার গাত্র হইতে একটা লোম তুলিয়া লইয়া তাহা আঞ্জনির উপর মর্দ্দন করিতে হয়। দন্তশূল রোগ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অনেক ইংরাজ মৃত ব্যক্তির একটী দন্ত লইয়া তাহা গলদেশে পরিধান করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এক খানি বাইবেল গ্রন্থের এক পার্শ্বে খ্রীষ্ট-কর্ত্তৃক পিটারের দন্তশূল রোগের আরোগ্যের বৃত্তান্ত লিখিয়া তাহা সঙ্গে রাখিলে দন্তশূল রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা যায়, অনেক ইংরাজ এই কুসংস্কারানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন।

ইংলণ্ডের কোন কোন স্থানের লোকদিগের বিশ্বাস যে কোন ব্যক্তি বিকার রোগাক্রান্ত হইলে তাহার পাদদেশে ভেড়ার চামড়া রাখিলে তাহা রোগীর শরীর হইতে সকল রোগ আকর্ষণ করিয়া লইবে। আবার কোন কোন স্থানের ইংরাজগণ ঐ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পাদদেশে মৃত গরুর প্লীহা রাখিয়া দেয়, বিশ্বাস ঐরূপ করিলে রোগ আরোগ্য হইবে। কোন কারণে উদর স্ফীত হইলে

অনেকে গির্জ্জাঘরে অর্থ যাচ্ঞা করণার্থ ব্যবহৃত কাচপাত্র উদরের উপর রাখিয়া দেয়। নর্ফোক জিলার লোকদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস কিছু অধিক প্রচলিত দেখা যায়।

ঘুঙারি কাশী ছেলেদিগের একটী প্রধান রোগ। এই রোগ আরোগ্য করণার্থ অনেক ইংরাজ নানা কুসংস্কারাত্মক উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের কোন কোন জিলার লোক কোন ছেলের ঘুঙারি হইলে তাহাকে আরোগ্য করিবার জন্য একটী গাধার পৃষ্ঠের উপর ও উদরের তল দিয়া তাহাকে তিন বার ঘুরাইয়া লয়। আবার কোন কোন স্থানে এইরূপ কুসংস্কার আছে ;— যে ছেলের ঘুঙারি হইয়াছে, তাহার পিতা একটী মাকড়সা ধরিয়া আনিয়া তাহা রোগীর মস্তকের উপর রাখিয়া তিন বার এই মন্ত্রটী উচ্চারণ করে ;—

"Spider, as you waste away
Hooping-cough no longer stay."

তৎপরে মাকড়সাটী একটী থলির মধ্যে পুরিয়া ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। লোকের বিশ্বাস যে মাকড়সা মরিয়া যেমন তাহার দেহ শুষ্ক হইয়া যাইতে থাকে, তেমনি ছেলের ঘুঙারি আরোগ্য হইতে থাকে। চেশায়ার জিলার লোকদিগের বিশ্বাস যে একটা বেঙ্ বা বেঙাচির মুখ রোগীর মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে সে আরোগ্য হইয়া থাকে। আবার নর্ফোক জিলাবাসিগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, যে ঘুঙারি কাশী রোগাক্রান্ত ছেলেটীকে গুজবেরী বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে তিন বার টানিয়া লইয়া বেড়াইলে সে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে! সফোক জিলাবাসিগণের কুসংস্কার আছে যে, এক বাড়ীতে যদি চারি পাঁচটী শিশুর ঘুঙারি কাশী হয় তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে যে শিশুটী সকলের অপেক্ষা অধিক-বয়স্ক, তাহার মাথার কয়েকটী চুল কাটিয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাটীর অন্যান্য শিশু ও

বালক বালিকাদিগকে সেই দুগ্ধ খাওয়াইলে রোগাক্রান্ত শিশুগুলি অল্পকাল মধ্যে রোগমুক্ত হয়। আবার অনেক স্থানের লোক গাধার পৃষ্ঠের কৃষ্ণবর্ণ চুল লইয়া তাহা একটী মাদুলির মধ্যে রাখিয়া শিশুর গলায় পরাইয়া দেয়।

গলগণ্ড রোগের আরোগ্য করণ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের অনেক লোকের অনেক প্রকার কুসংস্কার আছে। এস্থলে দুই একটার উল্লেখ করা যাইতেছে। নর্থেম্পটন্ ও অন্যান্য কয়েকটী জিলার লোকের দৃঢ় সংস্কার যে মৃত ব্যক্তির হস্ত দ্বারা গলগণ্ড স্পর্শ করাইতে পারিলে সেই মৃত ব্যক্তির হস্ত যেমন ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকায় পরিণত হইতে থাকে, তেমনি গলগণ্ড আরোগ্য হইতে থাকে। গ্লষ্টার জিলায় ঘোড়ার লেজের চুলের হার প্রস্তুত করিয়া তাহা গলদেশে পরিধান করাই গলগণ্ড রোগের প্রধান ঔষধ বিবেচিত হইয়া থাকে।

আঁচিল সম্বন্ধে ইংরাজদিগের মধ্যে কতকগুলি কুসংস্কার প্রচলিত আছে। দক্ষিণ হস্তে আঁচিল থাকিলে তাহা বড় সৌভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, আর মুখে আঁচিল থাকিলে তাহা বড় দুঃখ কষ্টের চিহ্ন বিবেচিত হয়। মুখে ও শরীরের কোন স্থানে আঁচিল থাকিলে তাহা দেখিতে বড় বিশ্রী হয় বলিয়া অনেক ইংরাজ তাহা আরোগ্য করিবার জন্য নানা কুসংস্কার-মূলক উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। যাহার শরীরে যতগুলি আঁচিল সে ততগুলি প্রস্তর খণ্ড একটা কাগজের মধ্যে পুরিয়া তাহা এক স্থানে নিক্ষেপ করে, বিশ্বাস এই, যে, যে ব্যক্তি সেই কাগজের মোড়কটী উঠাইয়া লইবে, তাহার শরীরে সেই কয়েকটী আঁচিল হইবে এবং ঐ প্রক্রিয়া অবলম্বনকারী লোক আঁচিল হইতে মুক্ত হইবে। কেহ কেহ বিশ্বাস করে যে, পূর্ণিমার রাত্রে আঁচিলের উপর নয় বার ফুঁ দিলে তাহা আরোগ্য হইয়া থাকে।

এইরূপে রোগের আরোগ্য-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ইংরাজদিগের যে

কত প্রকার কুসংস্কার আছে, তাহা বলা যায় না। ইংরাজদিগের মধ্যে যখন এই প্রকার নানা কুসংস্কার প্রচলিত, তখন তাঁহারা আফ্রিকা বা ভারতবাসীদিগকে কি প্রকারে কুসংস্কারপন্ন বলিতে পারেন?"

পরের দোষ প্রদর্শন করিলে, আত্ম-দোষ কখনও ক্ষালিত হয় না, অথবা নিজের গৌরবও বৃদ্ধি পায় না। আমরা এইরূপে নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহি তবে কিনা কুসংস্কারাপন্ন অশিক্ষিত ব্যক্তি সকল সম্প্রদায়েই আছে। কাল ক্রমে কোন কারণ বশতঃ সেই সকল ব্যক্তির মত যদি কোন গ্রন্থে প্রবিষ্ট বা লিপি-বদ্ধ হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রের প্রতি দোষারোপ করা যাইতে পারে না। প্রাচীন-তম হিন্দু জাতির সভ্যতার সূত্রপাত হইতে এই পর্য্যন্ত কত বিপ্লব, কত বিঘ্ন কত বিপর্য্যয় ইত্যাদি ঘটিয়াছে, কে বলিতে পারে? সেই বিপ্লবাদি-সঙ্কুল অসীম কাল প্রবাহে কত প্রকার বিভিন্ন সংস্কার ও রুচি-সম্পন্ন লোক হিন্দু সম্প্রদায়ে জন্ম লাভ বা প্রবেশ করিয়াছেন, তাহারই বা ইয়ত্তা কি? ইহাঁদের কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক বিশেষ কোন ভ্রমাত্মক মত কোন শাস্ত্রে প্রবিষ্ট না হওয়ার কোন কথাই নাই। এরূপ ঘটে বলিয়া সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ সৎ ও অসৎ শাস্ত্র পরীক্ষার উপদেশ এবং পদ্ধতি দেখাইয়াছেন, আমরা সেই পরীক্ষা পদ্ধতি স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। যাহা হউক আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে অধিকন্তু বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞান বল, যন্ত্র বল, অথবা যাহাই বল সকলেরই উদ্দেশ্য চিকিৎসা। বিজ্ঞান, চিকিৎসার সর্ব্বাংশে প্রবেশ করিতে পারে না। যন্ত্রও ইহার সমুদয় তত্ত্ব বলিয়া দিতে পারে না। সরল কথায় বলিতে গেলে ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষার উপর ইহার সত্যাংশ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ইংরেজ! তোমরা বিজ্ঞানের অভিমান করিতেছ, যন্ত্রের বল দেখাইতেছ, কিন্তু তোমাদের বিজ্ঞান, যন্ত্র, বিদ্যাবুদ্ধি

এবং চিকিৎসা যে স্থলে বিমুখ হইতেছে এমন সংস্র স্থলে নিরীহ এবং তোমাদের নিকটে কাণ্ডজ্ঞান-হীন কবিরাজগণ কিরূপ কৃত-কার্য্য হইতেছেন, তোমাদের অনুসন্ধান এবং স্মরণার্থে আজ কয়েকটী উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি এই সকল দৃষ্টান্ত অতি অল্প দিনেই ঘটিয়াছে, তোমরা স্বার্থের প্রলোভনে, কুতর্কের কুহকে কাকতালীয়-সংযোগ বলিবে কি না বলিতে পারি না।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বঙ্কবিহারী মুনসীর তিন বৎসর বয়সের সময় জ্বর হয় এবং জ্বরের সহিত উদরাময় থাকে ; প্রথমে যখন পীড়ার অতিশয় বৃদ্ধি হয়, সেই সময় এই স্থানের বিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ সেন ডাক্তার মহাশয় চিকিৎসা করিয়া একপ্রকার আরোগ্য করেন, কিন্তু সে আরোগ্য অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কিছু দিন পরেই পুনরায় জ্বর উদরাময়, সর্ব্বদা পেটের ফাঁপ, কাস, ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল রোগ ও উপসর্গ উপস্থিত হইয়া প্রায় দুই বৎসর যাতনা প্রদান করে। এই অবস্থায় যে যে ডাক্তার বা কবিরাজ মহাশয় দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াছিলাম, এবং যাঁহা দ্বারা যে পরিমাণে উপকার হইয়াছিল তাহা নিম্নে লিখিলাম।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, হাং সাং কলিকাতান্তর্গত কম্বলিয়া-টোলা ; ইনি বাঙ্গালা চিকিৎসা করেন। ইহাঁরই সুচিকিৎসা দ্বারা ও জগদীশ্বরের কৃপায় দুই বৎসরের পর আমার প্রাণাধিক পুত্রের জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। ইনি চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দুই সপ্তাহের মধ্যে উপকার দেখা-ইয়াছিলেন। চারি মাস চিকিৎসা দ্বারা এবং ঔষধ ও সুপথ্যের ব্যবস্থা দিয়া পুত্রটীকে নীরোগ করিয়া আমার শারীরিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের সার্থকতা করিয়াছেন এবং পুত্রটী জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমার পুত্রটীর বয়ঃক্রম সাত বৎসর।

শ্রীনফরচন্দ্র মুনসী

সাং উত্তরপাড়া। হুগলি।

সম্মানভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয়
চিকিৎসাশাস্ত্র-পারগতেষু—

নিবেদনমিদং

মহাশয়! আমার পরিবারের চক্ষুর পীড়া প্রায় দুই বৎসরের অধিক কাল হওয়াতে আমাকে যারপরনাই বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, এবং রোগীকেও উত্তরোত্তর উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যখন রোগের প্রথম সূচনা প্রকাশিত হয়, তখন কেবল চক্ষু হইতে জলস্রাব ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় নাই, সুতরাং সামান্য ও সহজে আরোগ্য হইবে বলিয়া অবধারণ করি; কিন্তু ক্রমে উহা যেমন বহুকালব্যাপক হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্য যন্ত্রণাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ক্রমশঃই চক্ষু রক্তবর্ণ ও উহাতে অসহ্য বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল। শেষে অবস্থা এমনি দাঁড়াইল যে দৃষ্টিহীন হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আমার ও কতিপয় আত্মীয়দিগের চিরসংস্কার ও বিশ্বাসানুসারে ইংরেজি চিকিৎসাই চক্ষুরোগের উপকারী ও বিশেষ ফলদায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়; এবং তদনুসারে এখানকার প্রধান প্রধান ডাক্তারদিগের দ্বারা চিকিৎসা করান হয়। কিন্তু যখন দীর্ঘকাল চিকিৎসাধীনে থাকিয়াও কিছুমাত্র উপকার লক্ষিত হইল না, তখন আপনার হস্তে চিকিৎসাভার প্রদান করা হয়। আপনি আপনার অসাধারণ ব্যবসায়-নৈপুণ্য-প্রভাবে অবস্থা আদ্যোপান্ত শ্রবণ ও স্বচক্ষে দর্শন করিয়া স্বল্পদিনে সামান্য সামগ্রী দ্বারা যেরূপে এই যন্ত্রণাদায়ক উৎকট রোগ আরোগ্য করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিস্ময়াবহ ও অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। বলিতে কি, আপনার ন্যায় অল্পবয়স্ক স্থিরমতি সুচিকিৎসকের দীর্ঘ জীবন আমাদের সতত প্রার্থনীয়। ঈশ্বর নিকটে প্রার্থনা, আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ দুঃসাধ্য রোগের হস্ত হইতে রোগীদিগের জীবন রক্ষা করিয়া তাহাদের নিকটে যশোভাজন, ঈশ্বর নিকটে আশীর্ব্বাদলাভ, ও আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে থাকুন। বলা বাহুল্য যে, আমি যত দিন জীবিত থাকিব, আপনার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী রহিলাম। এক্ষণে দেশবিদেশীয় পরিচিত অপরিচিত ব্যক্তিদিগের প্রতি অনুরোধ, যাঁহাদের দেশীয় চিকিৎ-

সায় বিশেষ ফলোপধায়কতা নাই এবং থাকিলেও সেইরূপ চিকিৎসক নাই বলিয়া সংস্কার আছে, তাঁহারা একবার আপনারা বা আপনাদের কোন আত্মীয় পক্ষ দ্বারা কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা-নৈপুণ্য, গভীর দৃষ্টি, ও রোগীর প্রতি বিশেষ যত্নের সহিত তত্ত্বাবধান পরীক্ষা করিলেই, তাঁহাদের পূর্ব্ব সংস্কার অপনয়নের পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না, এবং আর্য্য-চিকিৎসা-গৌরবও অনায়াসে প্রকাশিত হইতে পারিবেক। কিমধিকমিতি—

শ্রীমথুরানাথ দত্ত দাস

মহারাণী হরসুন্দরীর মুনসী,

[illegible]

একটী মারাত্মক রোগ আমাকে প্রায় গ্রাস করিয়াছিল; প্রতিদিন দুগ্ধের ন্যায় প্রস্রাব হইত। [illegible] কোন কোন দিন প্রচুর রক্তও নির্গত হইত, কখন বা ঐ [illegible] হইয়া প্রস্রাবের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বেদনায় আমার প্রাণ কণ্ঠাগত করিত। এই ভয়ানক রোগে আমার শরীর এমত অবসন্ন হইয়াছিল যে কেহই আমার প্রাণের প্রত্যাশা করেন নাই। ইংরাজি চিকিৎসায় আশু উপকার হইবেক এই আশায় আমি এখানকার প্রধান প্রধান বাঙ্গালি ও ইংরাজ ডাক্তারদিগের মত গ্রহণ করিয়া ঔষধ সেবন করি; কিন্তু উক্ত চিকিৎসায় আমার কোন ফল লাভ দূরে থাকুক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই অবস্থায় কোন বিজ্ঞ ডাক্তার চিকিৎসায় নিরাশ ও বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, ইহা ভূতড়িয়া রোগ, কখনই আরোগ্য হইবে না। এই কথা শুনিয়া জীবন-আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসার শরণাগত হই। তাঁহার কৃপায় অল্প দিনের মধ্যেই সুন্দররূপ আরোগ্য লাভ করাতে আমার মুমূর্ষু-দেহে জীবন-সঞ্চার হইয়াছে। ইতি

শ্রীব্রজমোহন ঘোস

সাং নৈহাটী। হাং সাং শোভা-বাজার রাজবাটী।

একদা আমার একটী পুত্রের উদরে প্রবল বেদনা উপস্থিত হয়। তাহার প্রতিকারার্থে ইংরেজি চিকিৎসা অবলম্বন করা হয়। চিকিৎসকগণ নানারূপ প্রতিক্রিয়া করিতে লাগিলেন এবং আশু বেদনা নিবারণার্থে উপর্য্যুপরি বমন ও বিরেচনকারক ঔষধ ও অবশেষে পিচ্‌কারি পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিলেন। কিছুতেই কোনরূপ প্রতিকার দেখা গেল না। ক্রমশঃ বেদনার আধিক্য, উদর স্ফীতি এবং বমন আরম্ভ হইল। এই চিকিৎসায় অত্রত্য প্রধান প্রধান সিবিল সার্জ্জনগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। অবশেষে ইহাঁরা স্থির করিলেন যে, এই বালকটীর আর কোন উপায়ই নাই, কেবল একটীমাত্র উপায় যে মলদ্বারের উপরে আর একটী মলদ্বার প্রস্তুত করিয়া দেওয়া। এই কৃত্রিম মলদ্বার প্রস্তুত করিয়া দিলেও এক শতের মধ্যে দুই একটী রোগী বাঁচিতে পারে। এই বিবেচনা করিয়া বৈকালে অস্ত্র প্রয়োগ করিব বলিয়া তাঁহারা তখন চলিয়া গেলেন। তৎপরে আমি নিরুপায় ও হতাশ হইয়া শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি রোগী দেখিয়া বায়ুর বিকৃতি বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং কোন মতেই অস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত নহে স্থির করিলেন। তাহার পর অন্য কোন ঔষধ না দিয়া কেবল মিশ্রির পানা ও ডেলা মিশ্রি একটুক একটুক করিয়া খাওয়াইতে আরম্ভ করা গেল। সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার সাহেবদের আসিবার পূর্ব্বে অল্প দাস্ত হইল। তাঁহারা সকলে আসিয়া রোগীকে দেখিয়া কৃত্রিম মলদ্বারের আবশ্যকতা নাই বলিয়া চলিয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে দাস্ত হইতে লাগিল এবং অবশেষে নানাপ্রকার বিরেচক ঔষধ ও প্রবল পিচকারির ফলস্বরূপ উদরাময়ের আবির্ভাব হইল। প্রত্যহ ৭০।৮০ বার দাস্ত হইতে লাগিল। মল তরল শুভ্রবর্ণ ও পুঁজসংযুক্ত। ডাক্তারি ঔষধ প্রায় মাসাবধি সেবন করান হইল। কোন উপশম না হইয়া রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ সেবন করাতে উদরাময় আরোগ্য হইল। কবিরাজ মহাশয় সম্পূর্ণরূপ নির্দ্দোষ করিবার নিমিত্ত ছয় সপ্তাহ কাল এক ঔষধ সেবন করান। কবিরাজ মহাশয় এক প্রকার জল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, রোগী কেবল সেই জল পান করিত। এইরূপ ছয় সপ্তাহ কাল ঔষধ সেবন করিয়া সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীপ্রিয়নাথ দত্ত।

কলুটোলার জেনেরেল অফ্ একাউন্টস আপিসের চিফ্ ক্লার্ক, কম্বুলিয়াটোলা।

আমার কোন আত্মীয় বালকের একটী উৎকট রোগ জন্মে; বালকটী প্রতিদিন প্রাতে অজ্ঞান হইয়া দিবা দুই প্রহরের সময় চেতনা লাভ করিত। অজ্ঞান অবস্থায় কোন কোন দিন নানাবিধ প্রলাপ বাক্যও বলিত এবং হস্ত পদাদির আকার কেমন একরূপ বিকট করিয়া ফেলিত। এইরূপে দুই বৎসর কাল রোগ ভোগ করিয়া তাহার শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ইহার চিকিৎসার জন্য প্রধান প্রধান ইংরেজি চিকিৎসকের ব্যবস্থা মতে ঔষধাদি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারায় আমরা তাহার আশা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের হস্তে বালকটীকে সমর্পণ করি। ঈশ্বরেচ্ছায় অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের বিচক্ষণতা ও চিকিৎসা-কৌশলে বালকটী আরোগ্য লাভ করে। এইরূপ অদ্ভুত চিকিৎসা প্রায় দেখা যায় না।

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়

২৩ শে জানুয়ারি　　অরিএন্ট্যাল সেমেনারির সম্পাদক।

সন ১৮৮২ সাল　　কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয়—

প্রিয় মহাশয়,

(১) কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে আমি বাতরোগে আক্রান্ত হইলে যখন সমুদয় চিকিৎসার উপায় ব্যর্থ হইয়াছিল, তখন মহাশয় ঐকান্তিক যত্নের সহিত আমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আপনার ঔষধগুলি অব্যর্থ ও আপনার চিকিৎসাও আশু-প্রতিকারক।

(২) আমার পিতা শ্রীযুত নীলকান্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বহু দিবস হইতে অম্লশূল পীড়ায় কাতর ছিলেন, পশ্চাৎ রক্তামাশয় দেখা দিলে যখন ডাক্তার মহাশয়েরা এককালীন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন মহাশয়ের সাহায্যে তিনি মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

একান্ত বশংবদ

শ্রীযদুনাথ বন্দোপাধ্যায়

বঙ্গাল ব্যাঙ্ক।

আমার জনৈক আত্মীয়ের পায়ের স্থানে স্থানে স্ফীত হইয়া পাকিয়া উঠে। তাহাতে প্রথমতঃ ডাক্তার দ্বারা অস্ত্র করিয়া ঔষধাদি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা এককালে আরোগ্য না হইয়া পুনঃ পুনঃ এক এক স্থানে ঐরূপ হইতে থাকে। পরে সেই সকল স্ফোটক হইতে স্বাভাবিক পুঁয ও রক্ত নির্গত না হইয়া তাহা গভীর ক্ষতরূপে পরিণত হয় এবং তাহার চতুর্দ্দিক্ কৃষ্ণবর্ণ ও বিকৃত আকার ধারণ করে। তাহাতে রক্তদূষিত ক্ষতের ন্যায় বোধ হয়। ঐ আত্মীয়ের পিতার পারদ-দোষে শরীরে নানাস্থানে ক্ষত হইয়াছিল, এবং অনেক বৎসর ডাক্তারি চিকিৎসা ও নানাবিধ ঔষধ সেবনান্তে পরিণামে তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সাজ্ঘাতিক পৈতৃক পীড়া সন্তানে বর্ত্তিতে দেখিয়া আরোগ্য-লাভের পক্ষে আশঙ্কা হয়। বিশেষতঃ, ইউরোপীয় ঔষধের উপর নির্ভর করিতে সাহস হয় না। তজ্জন্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীপ্রপন্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের হস্তে চিকিৎসা-ভার অর্পিত হয়। কয়েক মাস তাঁহার চিকিৎসাধীন থাকিয়া রোগী ক্রমশঃ প্রতিকার বোধ করেন। পরিশেষে কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসার সুদক্ষতায় ঈশ্বরের কৃপায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া স্বাস্থ্যসুখ সম্ভোগ করিতেছেন।

শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত
খাঁটুরা স্কুল ও ব্রাহ্মসমাজ-সম্পাদক।
গোবরডাঙ্গা।

কলিকাতা
২৬ শে মাঘ। ১২৮৮

দুই বৎসর অতীত হইল প্রসবান্তে আমার স্ত্রী দারুণ সূতিকা-রোগে অতি-অল্প-কাল-মধ্যে শয্যাশায়ী হয়েন। সাধ্যমত ইংরাজী চিকিৎসার কিছুই ত্রুটি হয় নাই। এরূপ অবস্থায় যখন আমি দিগ্‌ভ্রান্ত জনের ন্যায় ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলাম, এমন সময়ে আপনি প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় প্রথমতঃ সুপরামর্শ-দান ও তৎপরে সুচিকিৎসা দ্বারা অকাল মৃত্যু হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন।

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী
বোর্ড অব রেবেনিউ।

To

THE EDITORS OF THE "AYURVEDA-SANJIBANI."

Calcutta.

Dear Sirs,

Thank God, I am now blessed with an opportunity of expressing publicly the true faith and implicit confidence I entertain for the principles of the Ayurvedic treatment. It is to be admitted on all hands that in these days the number of men who deplore their own ignorance in hitherto disregarding the native system of treatment is fast increasing. But I am afraid it is too late now, as the indented Western medicine has already told so much upon our constitutions that it would take many long years to repair.

In two of the most serious cases among my family, in which nearly all of the best known Allopathic Doctors practising in this city, both Native and European, miserably failed after long and wearied trial, Babu Harri Prasanna Sen Kaviraj, the worthy son of the illustrious Kaviraj G. P. Sen of Koomartooly, showed an admirable proficiency in his profession, and his medicines acted miraculously:——in a case of 'POLYPUS of two & a half years' standing, during which period the attack came nearly every week notwithstanding all the means employed by the *Pantalooned* professors, Hari Prasanna Babu prescribed a certain medicated oil for application in the nostrils which cured the disease once for all ; and a case of Remittent fever of a serious type, which used to prevail twice in 24 hours, was completely overpowered by a few pills prepared by him, and the patient restored to health in a week. All the *encomium* due to a worthy physician is what words fail to describe. Kaviraj H. P. Sen's keen sense of detecting diseases is worthy of his breeding under so distinguished a parent—his ability in appropriate selection of medicines is praise worthy—and his courteous affability towards patients and people in general is above all praise.

Ever since I have availed of the same medical aid always, and I am well convinced of its usefulness and efficacy. Looking to the progress of the system of the Ayurvedic principles at your hands and the ground they have gained in competition with the Allopathy so strongly supported by Govt. and the growing tendency of the time-taught people to avail themselves of them—although I do not pretend to be either a philosopher or a prophet—I can emphatically assert that those who live after a quarter century more (old as I am) to see, will be happy to find—apart from outdoor practice—the College Hospital itself less frequented by natives.

37 Kasi Mitter's Ghat street, Calcutta, the 10th May 1885. } Yours faithfully Kali Coomar Banerjee.

TO THE EDITORS OF THE "AYURVEDA-SANJIBANI"

Dear Sirs,

I hope you will be good enough to make room, in one of your muchesteemed journals,for the few lines I offer to the public by showing what a decided superiority and efficaciousness do the Aurvedic medicines of indigenous herbs possess over the labelled bottles of Allopathy and infinictesimal doses of Homeopathic medicines of recent inventions.

A member of my family had been a prey to the malignant type of chronic dysentery accompanied with acidity and fever. At the very beginning of the illness, he was, as a matter of course, placed under an Allopathic Physician of vast experience; the treatment lasted for a few months with little or no hope of recovery. The patient was reduced to mere skeleton, and worst symptoms gradually began to appear. The treatment was consequently changed to that of Homoeo: but unfortunately with the same effect. So we began to lose every hope of his recovery.

At last a friend of mine, advised me to try *Ayurvedic treatment*, which I was obliged to do under Kaviraj Hari Prasanna Sen of Koomartooly. But what was our astonishment and

the pleasure of the patient when, after the medicines have been used not more than a week or so, all the evil symptoms began to disappear, and he was thoroughly cured within a few days.

No 4 Gosain.'s Lane, Calcutta, the 11th May 1885. Yours faithfully Naba Krishna Gossami.

To THE EDITOR OF THE "AYURVEDA-SANJIBANI".

Dear Sir,

I congratulate myself upon having found this occasion to testify to the wonderful efficacies of your Ayurvedic medicines and to express as well, my sincere and deepfelt gratitude, which I owe to Kaviraj Bhagabati Prasanna Sen, for the life of a dear relation. My aunt had been suffering from a malignant type of Dysmenorrhoea, attended with excruciating pain in the region of abdomen, and long and constant hysteric fits. No pains were spared to give her, during the period, the best medical aid procurable both Allopathic and Homoeopathic, but without any effect. At last when the disease threatened to terminate fatally,—hands and feet *oedematous* and *general anoemia* prevailing—that she was given up by her medical attendants, some of the leading practetioners of the town, as a hopeless case. As a last resource, so as to leave no room for regret, I applied to the Ayurvedic system of treatment and placed her under the treatment of Kaviraj Bhagabati Prasanna Sen; and the effects were simply miraculous. In three weeks' time all the bad symptoms disappeared and in three weeks more she was all right, no trace of the disease being left.

She is now in the enjoyment of perfect health, and never since, (it is now about (8) eight months,) she has been unwell. Her cure is an instance of the innumerable triumphs achieved daily by our Ayurvedic treatment over other forms of scientific treatment, and I confidently hope that our friends and countrymen would do well to give preference to our own medical science before

others, and reap the benefit of it. But alas ! in these days of blind faith in the western civilization, no amount of evidences, I fear, but bitter family experiences will teach us to value the suitability of our native medicines to native constitutions, before foreign ones. With high respect for your patriotic efforts—

Kushtiya. I remain, Dear Mr. Editor, your most obdt. svt.
the 25th April 1885 Paresh Nath Sarkar, B. A ,

To

THE EDITORS OF THE "AYURVEDA-SANJIBANI."

Calcutta, the 10th May 1885.

Dear Sirs,

I feel much pleasure to inform you that my wife fell sick on her child-bed with copious discharge of blood and faintness through exhaustion. Accordingly I called at a doctor of the Cotton street , he finding it a serious case advised me to bring a better surgeon. So one of the best surgeons of the town and several other doctors with a midwife were called and attended my wife. She was delivered of a dead child ; and simultaneously had an attack of prolaptic fever attended with free discharge of blood, which the utmost efforts of the doctors could not relieve. So after some days seeing her gradually worse and worse, I was advised by some of my friends to call in the aid of Kaviraj B. P. Sen for native Ayurvedic treatment. Under his treatment she rapidly recovered within eight days, and ever since she has had no complaints whatever. I had several other cases treated by him with uniform good results.

I bring to you my firm faith in the Ayurvedic form of treatment, and would confidently recommend the general public to treat cases such as above through the Ayurvedic treatment, and hope the result shall be crowned with success.

No 8 Mullick street, } Yours truly
The 10 May 1885. } Muralidhar Kshettry, Banker.

To

THE EDITOR OF THE "AYURVEDA-SANJIBANI."

Dear Sirs,

It affords me the greatest pleasure to inform you that my daughter, who was suffering from an obstinate attack of fever with the complication of liver complaints, and was put under the treatment of good Allopathists of this vast Metropolis without any good result, has now perfectly recovered her health under the judicious treatment of Babu Bhagabati Prasanna Sen according to the principles of the Hindu Medical Science. This has led me to believe that the native way of treatment is more suitable to us (the natives) for more reasons than one, and that if our countrymen invoke the aid of the Ayurvedic system of treatment instead of putting themselves under the treatment of the Western system of Medical science, they can easily derive benefit at a less cost and risk.

12-5-85 } Yours faithfully
Cossipore. } Haridas Mitter.

To

THE EDITORS OF THE "AYURVEDA-SANJIBANI."

Calcutta.

Dear Sirs,

I am very happy to avail myself of this opportunity of expressing my heartfelt sympathy for the native Ayurvedic treatment, which I have, on more than one occasion, tested the unimpeachable proofs of.

Recently my mother had an attack of a violent brain disease and the case was given up as hopeless by the eminent Allopathic and Homeopathic practitioners of the day. But fortunately in making it over to our native treatment under Kaviraj Hari Prasanna Sen of Koomartooly she has since been all right. I have many other test cases to cite, but they would be too long to be included in your esteemed journal.

There are very few cases, in which I took to the aid of Allopathy or other systems prevailing in this country, up till now. Although my opinion will not at all be an authoritative one in a matter like unto this, yet I shall not hesitate to admit that, born as I am in a Vaidya family, I have never been half disposed to think of the admirable efficacy of our own family profession until prevailed upon to drive away the evil notion by Kaviraj H. P, Sen's proficiency.

Yours faithfully
Kaly Dass Gupta.

20th May 1885.

To 7-4-1885.

Kaviraj Hurry Prasanna Sen.

EDITOR OF THE "AYURVEDA-SANJIBANI."

Dear Sir,

With much pleasure I beg to inform you that my wife suffered from a severe attack of dysentery after delivery, and she was under the treatment of the well known Alopathic and Homeopathic Assistant.—Surgeons of the metropolis for a period of 8 months but without any effect. At last when the case became hopeless, I was advised by some of my friends and relatives to put my wife under the treatment of native physicians. I express my hearty pleasure to say that under the treatment of Kaviraj Bhagabati Prasanna Sen of Koomartooly she got rid of the disease in a month and she is now free from all complaints. Since then I have full faith in the Kaviraji treatment and I never take the help of Allopathy or any other treatment any more when any one of my family is severely ill, for I always find the treatment efficacious,

Yours faithfully
Nritya Gopal Bose,
Accountant, Asiatic Society of Bengal.

মান্যবর শ্রীযুক্ত আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়,

কিছুদিন গত হইল আমার রক্ত প্রস্রাব, তলপেটে বেদনা ও ঘোরতর জ্বর হইয়াছিল। আমি প্রথমে স্থানীয় প্রসিদ্ধ এলোপ্যাথি ডাক্তারের চিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা বলেন যে, পেটের ভিতর স্ফোটক হইয়াছে, উহা শীঘ্র আরোগ্য হইবার নহে। তাহাতে আমি মহা ভীত হইয়া কোন বন্ধুর পরামর্শে শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা অবলম্বন করি। এবং তাঁহার চিকিৎসা বলে প্রথম তিন দিবসের মধ্যে জ্বর ও বেদনা একেবারে নিঃশেষ হয় এবং রক্তও অনেক পরিমাণে কমিয়া আইসে। তৎপরে এক সপ্তাহ মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করি। ইতি।

ঘুঁশুড়ি। বশম্বদ
২০ শে মে ১৮৮৫। সেখ আমীরুদ্দিন।

কলিকাতা।
আহিরীটোলা।
১ লা জ্যেষ্ঠ ১২৯২।

সাত বর্ষ অতীত হইতে চলিল, আমার স্ত্রী সংকট গ্রহণী এবং সূতিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া উক্ত দীর্ঘকাল যাবৎ নিতান্ত কষ্ট ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। গত শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে রোগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, জীবনের আশা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আইসে। সাত বর্ষের মধ্যে ক্রমে ক্রমে নগরের অনেক গুলি খ্যাতনামা হোমিয়োপেথি এবং এলোপেথি চিকিৎসক চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। এক এক সময়ে ক্রমান্বয়ে কয়েক মাস কাল এক এক চিকিৎসকের অধীনে রোগীকে রাখা হয়, কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, রোগী কোন কোন ঋতু বিশেষে দুই এক মাসের জন্য কিঞ্চিৎ সুস্থ থাকিলেও রোগটী ক্রমে রোগীর উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া লয়। শেষে হোমিয়োপেথি বা এলোপেথি ঔষধে আর কোন ফল দর্শে না।

অবশেষে কতিপয় মিত্রের পরামর্শে সুবিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ভগবতী প্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের হস্তে চিকিৎসার ভার অর্পণ করি। কবিরাজ মহাশয় প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদপ্রণালীমত চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া, কয়েক মাসের মধ্যেই রোগ একেবারে নির্ম্মূল করিয়া দিয়া, রোগীকে পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় সবল এবং সুস্থ করিয়া দিয়াছেন। যে রোগী পূজার পূর্ব্বে শয্যাশায়িনী ছিল, যাহার দিবা রাত্রিতে ১০।১৫ বার—সময়ে সময়ে ২০।২৫ বার ভেদ হইত, এমন কি উদরের বেদনা ও জ্বর সতত যে রোগীকে আক্রমণ করিয়াছিল,সে রোগী যে সাতবর্ষকাল নিতান্ত কষ্ট ভোগের পর এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে, ইহা ভ্রমেও ভরসা করা যায় নাই। এ দেশীয় রোগীদিগের পক্ষে এ দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী—ঔষধাবলী যে সম্পূর্ণ উপযোগী ইহা বিলক্ষণ প্রমাণিত হইয়াছে। আমার ন্যায় অনেকেই ভ্রমান্ধ হইয়া, বিজাতীয় চিকিৎসার পক্ষপাতী হইয়া থাকেন, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, জাতি সাধারণে যদি বিজাতীয় চিকিৎসার আশ্রয় না লইয়া প্রথম হইতেই দেশীয় চিকিৎসার আশ্রয় লয়েন, তাহা হইলে, সাধারণে নানা রোগসূত্রে যে মহাকষ্টসম্ভোগ করিয়া থাকেন, যে বহুল অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, সে কষ্ট ভোগ ও সে অর্থ ব্যয় কখনই করিতে হয় না। আমাদিগের দেশের জল এবং বায়ু আমাদিগের শরীরের অবস্থা অনুরূপেই পূর্ব্বতম ঋষিগণ ঔষধাদি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। বিজাতীয় চিকিৎসা প্রণালী এবং ঔষধ আমাদিগের ধাতু এবং আমাদিগের দেশের উপযোগী নহে, ইহা আমরা বুঝিতে পারিলে, যে কেবল দেশীয় চিকিৎসার আবার অভ্যুদয় হইতে পারিবে এমত নহে, আমরা নিজে অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্য সুখ এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিব। দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে যে মহান সত্য এবং অভ্রান্ত তথ্য নিহিত আছে. তৎসমস্ত অবশ্যই চিরকাল জগতের উপকার সাধন করিতে থাকিবেই। কৃতবিদ্য সাধারণের পক্ষে বর্ত্তমান সময় হইতেই দেশীয় চিকিৎসার প্রতিক্রিয়ার জন্য সাগ্রহে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সচিত্র রাজস্থান-অনুবাদক, সংবাদ প্রভাকর-সম্পাদক।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

দশের মাঝে যশ কিনিতে সকলেরই সাধ। কিন্তু সকলের পক্ষে সে সাধ মিটে না। সুযোগ, উপায়, পন্থা সকলের অদৃষ্টে সকল সময়ে যোটে না। তবে একটা মাত্র সহজ উপায় আছে—গ্রন্থকার হওয়া। গ্রন্থকার হইতে পারিলে, চিরদিন অমর হইতে পারা যায়, কীর্ত্তিস্তম্ভটাও অক্ষয় হইয়া থাকে। এই জন্যই আজ কাল দেশের অধিকাংশ লোককেই আমরা সেই সহজ উপায়ে যশ কিনিবার জন্য ব্যগ্র দেখিতে পাই। অলি গলি ছাপাখানা; ছাপাই-বার মূল্য দিলেও চলে, না দিলেও চলে। বইগুলা ওজন দরে বেণের দোকানে চলিয়া যায়, সুতরাং মুদ্রাকর কতকটা পারিশ্রমিক পাইবার আশা রাখে। কাগজের জন্যও বড় একটা চিন্তা করিতে হয় না। পাড়াগাঁয়ের দুই একজন 'দেশহিতৈষী' জমীদারকে মুরুব্বি খাড়া করিয়া তাঁহাদিগের নামে গ্রন্থখানা উৎসর্গ করিতে পারিলে, তাঁহারাও ভাবেন যে, জগতে আসিয়া একটা কাজ করিয়া যাইলাম। সুতরাং তাঁহারা গ্রন্থকারদিগের উৎসাহবর্দ্ধন জন্য যৎকিঞ্চিৎ রজত মূল্য দান করিতে ক্রুটী করেন না। আসল কথা—কি বিষয় লইয়া বই লেখা হইবে?—সে চিন্তাটাও বড় দরকার হয় না। ব্যাকরণ জ্ঞান থাক্ বা না থাক্, ভাষার সহিত কোন পুরুষে সংস্রব থাক্ বা না থাক্, ছাপার অক্ষর যখন আছে, তখন বই লিখিবার ভাবনা কি? অক্ষরে অক্ষরে কথা সাজাইতে পারিলেই বই লেখা যায়। তবে কি বিষয়ে বই লেখা যাইবে, এ কথাটা উঠিতে পারে। কিন্তু তাহারও সহজ উত্তর আছে। গ্রন্থকার মাত্রই যে নিজের ঘট হইতে কিছু আদিম জিনিস দিতে বাধ্য এমত কোন বিধি নাই। আসলের নকল—নকলের নকল—তস্য নকল যাহা কিছুই গ্রন্থকাব আপন ইচ্ছামত প্রকাশ করিতে

বা লিখিতে সমর্থ। ইণ্ডিয়ান পিনালকোডে তন্নিবারক কোন বিধি নাই। বাঙ্গালাভাষা বেওয়ারিস, সুতরাং কথা কহিবে কে? কহিলেও শুনে কে? এক পাঠকেরা দুই একটা কথা কহিতে পারেন, অসন্তোষ জানাইতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থকারই পাঠকদিগের কোন ধার ধারেন না। পুস্তক বিক্রয় হউক বা না হউক, লোকে পাঠ করুক বা না করুক, গ্রন্থের আবরণীতে গ্রেট অক্ষরে গ্রন্থকারের নামটা ছাপা হইলেই হইল। তাহা হইলেই তিনি চতুর্ব্বর্গের ফল পাইলেন। তবে এক সমালোচকদিগের জ্বালা আছে, কিন্তু সে জ্বালা তাঁহারা সহ্য করিতে চাহেন না। সমালোচনার জ্বলন্ত অনলে মুখ পোড়াইতে শতকরা ৯৯ জন অসম্মত। এতকাল কেবল নাটক, নবেল, উপন্যাস, নবন্যাস প্রভৃতি আবর্জ্জনাতেই বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্র পুর্ণ হইয়া আসিতেছিল, এখন আবার আর এক শ্রেণীর গ্রন্থকার সেই আবর্জ্জনা-বৃদ্ধি করিতে সাগ্রহে অগ্রসর। সাধারণ গ্রন্থকারদিগের দ্বারা বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্র পুতিগন্ধে পুর্ণ হওয়ায়, জাতীয় স্বাস্থ্য যদিও ক্রমে বিকৃত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহার ব্যবস্থা করিবার ভার আমাদিগের সাহিত্যবিষয়ক সাময়িক সহযোগীদিগের উপর অর্পিত। তবে আজকাল আর যে এক নূতন শ্রেণীর গ্রন্থকার-রূপ পঙ্গপাল চিকিৎসাক্ষেত্রে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহা-দিগের প্রতিই আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনী তীব্রদৃষ্টি দান করিতে বাধ্য।

আজকাল চিকিৎসক গ্রন্থকার শ্রেণীর সংখ্যা দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বাহ্য দৃশ্যে এটা উন্নতির চিহ্ন। সেই সকল গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধু, মহান্ এবং প্রশংসনীয়। সকল বিজ্ঞান অপেক্ষা চিকিৎসাবিজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। মানব সমা-জের শান্তি সুখ স্বাস্থ্য জীবন যে বিজ্ঞানজড়িত, সেই বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিদান সর্ব্বাদৌ প্রার্থনীয়। যাঁহারা সেই বিজ্ঞানের উন্নতি

সাধনে যত্নপর, তাঁহারা আমাদিগের শতধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, সেই চিকিৎসক গ্রন্থকার শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই এক্ষণে হিত করিতে গিয়া বিপরীত কাণ্ড করিয়া বসিতেছেন। অতি পুরাকালে চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণয়ণ করিতে যে সে চিকিৎসক কখনই সহজে অগ্রসর হইতেন না। ক্ষমতা থাকিলেও অনেকে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন না। না করিবার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা জানিতেন যে, চিকিৎসা গ্রন্থের সহিত যখন জীবন মরণ বিজড়িত, যখন সহস্র সহস্র মনুষ্যের প্রাণ এবং স্বাস্থ্য লইয়া কথা; তখন সহসা সে সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লেখা কর্ত্তব্য নহে। ভ্রম ক্রমে বা কোন বিষয়ে একটু মাত্র অনভিজ্ঞতা ক্রমে গ্রন্থ মধ্যে কোন বিপরীত মন্তব্য প্রকাশ হইলে মহানিষ্ট সম্ভাবনা। সুতরাং গ্রন্থকার নামে পরিচিত হইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা সুচিকিৎসক হইবার জন্য যত্ন করাই বিহিত। আমাদিগের দেশের পুর্ব্বতন ঋষিগণের ন্যায় পাশ্চাত্য জগতের মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসকগণও সহসা কোন গ্রন্থ লিখিতেন না বা আজিও লিখেন না। যাঁহারা শিক্ষা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা, এবং অভিজ্ঞতাবলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য লাভ করেন, যাঁহারা উচ্চ অঙ্গের প্রতিভাশালী, যাঁহারা চিকিৎসাজগতের নব নব তথ্য আবিষ্কর্ত্তা, তাঁহারাই জগতের উপকারসাধন জন্য গ্রন্থাবলী লিখিয়া গিয়াছেন, এবং য়ুরোপের সেই শ্রেণীর লোকেই এক্ষণে চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ লিখিতে যত্ন করেন। কিন্তু আমাদিগের দেশে যাঁহারা চিকিৎসকদিগের অগ্রণী, তাঁহারা আজি পর্য্যন্ত যে কোন চিকিৎসা বিষয়ক নূতন আদিম গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত নহেন, যাঁহারা অজাতশ্মশ্রু যুবক, যাঁহারা চিকিৎসা বিদ্যার ক খ মাত্র পাঠ করিয়াছেন, যাঁহাদিগের জ্ঞান কেবল গ্রন্থগত, তাঁহারই কেবল অবিনাশী কীর্ত্তি রাখিবার জন্য গ্রন্থকার

মূর্ত্তিতে দর্শন দান করিয়াছেন। ইহার ফল যে অতি ভয়ানক হইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহাদিগের মৌলিকতা ত কিছুই নাই, কেবল অনুবাদ দ্বারা অবিনাশী কীর্ত্তি রাখিতে ব্যস্ত। ভাষা এবং ব্যাকরণজ্ঞান না থাকায়, তাঁহাদিগের কৃত অনুবাদ গুলিও বিকৃতমূর্ত্তিতে দর্শনদান করিতেছে। ভাষার সহিত—ব্যাকরণের সহিত যাঁহাদিগের কোন কালে দেখা সাক্ষাৎ নাই, তাঁহারা যে শিব গড়িতে বানর গড়িবেন, ইহাও বিচিত্র নহে। কিন্তু এরূপ হইতে দেওয়া কি কর্ত্তব্য? একজন গ্রন্থকাররূপে যশ কিনিতে ব্যস্ত, আর তাঁহার সেই গ্রন্থমত পাড়াগাঁয়ের একজন হাতুড়ে চিকিৎসক, চিকিৎসা করিতে গিয়া, শত শত লোকের জীবন বিনাশ করিতেছে, ইহা কি প্রার্থনীয়? একজন সামান্য আঘাত-কারী যদি পিনালকোডের ধারামত কারাগারে যাইবার পাত্র হয়, তাহা হইলে একজন অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত ভাষাজ্ঞানবিহীন অবিনাশী কীর্ত্তিপ্রয়াসী চিকিৎসকের লেখনী-প্রসূত ভ্রমপূর্ণ গ্রন্থমতানুযায়ী চিকিৎসাসূত্রে যদি অন্ততঃ একজন লোকও মরে, তাহা হইলে সেই গ্রন্থকার এবং সেই চিকিৎসক কি শ্রীঘরে সমাদরে গ্রহণের পাত্র নহেন? রাজা বিদেশী, সুতরাং যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতেছে।

আমাদিগের দেশে নানাবিধ চিকিৎসাপ্রণালী প্রচলিত। কিন্তু এলোপেথি চিকিৎসা বিষয়ে আজি পর্য্যন্ত ১০।২০ খানার অধিক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হয় নাই। হকিমী চিকিৎসা বিষয়ে কোন বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রচলিত আছে কিনা সন্দেহ। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বন্ধে মৌলিক পুস্তক এক্ষণে একখানিও প্রকাশ হয় নাই, সকল গুলিই অনুবাদ। কিন্তু অজাতশ্মশ্রু ভাষাজ্ঞানহীন যুবক-গণের মধ্যেই অনেকে সেই অনুবাদ প্রচার করায়, সেগুলি জ্যোতি-হীন চন্দ্রের ন্যায়, গন্ধহীন পুষ্পের ন্যায় দেখা দিতেছে। সেই মত

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধেও আজ কাল একে একে অনেক পুস্তক প্রকাশ হইতেছে। এখন যেমন না পড়িয়া শুনিয়া দুই এক খানা ইংরাজি হোমিয়োপ্যাথিক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াই যে সে লোকে দুই দিনে হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসক হইতে পারে, সেই মত দেখা যাইতেছে যে, হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা বিষয়ে যে সে লোকই ইচ্ছা করিলে বই লিখিতে পারে। সুতরাং দশের মধ্যে যশ কিনিবার পক্ষে ইহা বড় সমান্য সুযোগ নহে। কিন্তু হোমি-য়োপেথিক চিকিৎসা বিষয়ে যে সকল মহামহোপাধ্যায় বাঙ্গালী যথেষ্ট যশ সংগ্রহ করিয়াছেন, যাঁহারা মনে করিলে সহজেই মাতৃ-ভাষায় হোমিয়োপ্যাথিক গ্রন্থ লিখিয়া একটী প্রধান অভাব দূর করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই নীরবে অবস্থিত। আর আমাদিগের আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্রের অজাতশ্মশ্রু অনুবাদকদিগের ন্যায় এক শ্রেণীয় হোমিয়োপ্যাথিক গ্রন্থকার দল প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

আমাদের অদ্যকার প্রথম সমালোচ্য গ্রন্থখানি "নাড়ী বিজ্ঞান"। * নাড়ী বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে নাড়ী পরীক্ষাবিষয়ক অনেক রহস্য আসিয়া মনে উপস্থিত হয়। কোন্ দিনে এই নাড়ী তত্ত্ব হিন্দুপণ্ডিতগণ সম্যক অবগত হইয়াছিলেন; কোন্ দিন হইতেই বা তাঁহারা এই জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু হিন্দুগণের অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় ইহারও সম্যকরূপে কাল নির্ণয় করা দুরূহ। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় বৈদিক আয়ুর্ব্বিদ্যার সময়ে এই জ্ঞান আমাদের ঋষিদের মনে উদ্ভাষিত

* নাড়ীবিজ্ঞান অর্থাৎ নাড়ী-পরীক্ষা-বিষয়ক কণাদসংহিত, নাড়ীপ্রকাশ, প্রয়োগচিন্তামণি প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ হইতে শ্রীচন্দ্রকুমার দাস কবিরাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা, জেনারেলপ্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রিত। ১৫১ নং চিৎপুর রোড। মূল্য ।৵০ আনা। (হস্তে লিখিত) কলিকাতা,আহারীটোলা।

হয় নাই। চরক সুশ্রুত প্রভৃতি সুপ্রাচীন বৈদিক চিকিৎসাগ্রন্থে রোগ এবং রোগী পরীক্ষার প্রকরণ সমূহ পাঠ করিলেই আমাদের কথা সুপ্রমাণিত হইতে পারে। তবে তান্ত্রিক সময়ে আর্য্য চিকিৎসকগণ এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এবং আজিও তন্ত্র-শাস্ত্র আলোচনা করিলে, সুপণ্ডিতের নিকট সম্যকরূপে উপদেশ গ্রহণ করিলে, উহার কতক অংশ সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে। তন্ত্র সাঙ্কেতিক শাস্ত্র; গুরূপদেশ ভিন্ন উহাতে দন্তস্ফুট করিবার সাধ্য নাই। কবিরাজের টোলস্পর্শী গুরু পাঠ-শালার ছাত্র কিম্বা ডিস্পেন্সারিদর্শী ডাক্তারের ইহাতে অধিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে কাপালিকের উপদেশ চাই নিদিধ্যাসন চাই। এত হইলেও এই বিদ্যা প্রসন্ন হয় কি না সন্দেহস্থল। সুতরাং নিরক্ষর মুর্খদিগের হস্তে পড়িলে, ইহার কি দুর্দ্দশা হয় সহজেই তাহা অনুমিত হইতে পারে। ফলতঃ উপদেশ এবং চর্চ্চার অভাবে এই বিদ্যা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

একদল দেশহিতৈষী আছেন, যাঁহারা এই অন্ধকারের খদ্যোত, নিরাশার আশা, বিলুপ্তের উদ্ধারকর্ত্তা; তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে দেশের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র!!! তাঁহাদের দেশ উদ্ধারের মূল মন্ত্র— দেশের অধঃপতন, নিজের উদর পূরণ; সুতরাং দেশের অধোগতির স্রোতও অপ্রতিহত।

আজিকালি কেমনই একটা বৈজ্ঞানিক স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, যে, যাহা কিছু হউক সকলই বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিক নাম, বৈজ্ঞানিক ধাম, বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম, বৈজ্ঞানিক কর্ম্ম, কথা বৈজ্ঞানিক, লেখা বৈজ্ঞানিক—সবই বৈজ্ঞানিক। যাহার মুখে আনিবার ক্ষমতা নাই তিনিও বলেন অন্তত "বৈগানিক"। কালের কি ঘোরতর পরিবর্ত্তন! যাহাদের সহিত বিজ্ঞানের "বি"র সম্পর্ক নাই, সেই বি-(বিগত) জ্ঞানের মুখে বিজ্ঞানের তরঙ্গ, আর গো-খাদকের মুখে

হিন্দুধর্ম্মের প্রসঙ্গ। গ্রন্থের সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ অতি অল্পই প্রদর্শিত হইয়াছে, অথচ নাম "বিজ্ঞান"।

এই সকল কারণে আয়ুর্ব্বেদের অধঃপতনের প্রতিক্রিয়ার এই উন্মেষ সময়েই ইহার শিরোদেশে বজ্রপাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং এই অধঃপতিত দেশের আর মঙ্গল কোথায়? পাঠক! বোধ হয় নাম দেখিয়াই বুঝিয়া থাকিবেন, যে, এই গ্রন্থখানি বিজ্ঞানের নামেই বিক্রীত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন উহাতে "বৈজ্ঞানিক" তত্ত্ব কত আছে। এই গ্রন্থে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এই—"এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে শরীর উষ্ণ নাড়ী শীতল এবং শরীর শীতল ও নাড়ী উষ্ণ, ইহা কিপ্রারে হইতে পারে? মনে কর নাড়ীতে অধিক পরিমাণে তেজ থাকিলে তত্রস্থ শোণিতও উষ্ণ হইবে। সুতরাং উষ্ণ রক্তের বলে নাড়ী অবশ্যই তীব্র বেগে স্পন্দিত হইবে। অতএব নাড়ীর গতির দ্বারাই উহার উষ্ণত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। পক্ষান্তরে যদি নাড়ীর গতি মৃদু অর্থাৎ শ্লেষ্মা-জনিত গতির ন্যায় গতি হয়, তাহা হইলে গাত্র উষ্ণ থাকিলেও নাড়ীকে শীতল বলিয়া স্থির করিতে হইবে।" পাঠক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটী স্মরণ করিয়া রাখুন, মৃদু গতি—শীতল, তীব্র গতি—উষ্ণ। ভাল জ্বর পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

গ্রন্থকার লিখিতেছেন—"শ্লেষ্মজ্বরে নাড়ী সূত্রের ন্যায় সুক্ষ্ম, শীতল এবং মৃদুগতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।" পুর্ব্বের বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব স্মরণ থাকিলে পাঠক এখন মহা গোলযোগে পতিত হইয়াছেন। শীতল এবং মৃদুর পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়াই হয়ত বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বে (!) ধিক্কার দিতেছেন। নাড়ীজ্ঞানের দিকেত এখন পর্য্যন্ত যাইতেই পারেন নাই। আমরা বলি পাঠক ব্যস্ত হইবেন না। বিজ্ঞান অপুর্ণ এবং পরিবর্ত্তনশীল। রাগ করিবেন না। গ্রন্থ রচয়িতার দ্বাদশ পৃষ্ঠা লিখিবার সময় যেরূপ ভাবে অপূর্ণ ছিল, সপ্তদশ

পৃষ্ঠা লিখিবার সময় তাহা ভিন্ন মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। পূর্ব্বে মৃদু শীতল এক ছিল, পরে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মৃদু শীতল বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং রাগ করিতে হয় বিজ্ঞানের উপর করিবেন, গ্রন্থরচয়িতার উপর নহে। পাঠক! গ্রন্থকারকে জ্বর পরীক্ষা বিষয়ে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তন্মধ্যে আর একটী গুরুতর কথা এই—গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"বাতশ্লেষ্মজ্বরে এবং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে নাড়ীতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বায়ু ও শ্লেষ্মা এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মার গতি অনুমিত হইয়া থাকে।" গ্রন্থকারই পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"বাতজ্বরে তীব্র গতি, পিত্তজ্বরে সজোরে (দ্রুতবেগে) স্পন্দিত হয়, শ্লেষ্মজ্বরে মৃদু গতিবিশিষ্ট হয়।"

এক্ষণে আমরাও পাঠকগণের সহিত একত্র হইয়া জিজ্ঞাসা করি, বাতশ্লেষ্মজ্বরে বায়ু ও শ্লেষ্মার গতি দ্বারা নাড়ীর গতি কিরূপে নিরূপিত হইবে? বাতের তীব্রগতি এবং কফের মৃদুগতি একাধারে কিরূপে উপলব্ধ হইবে? এই মহা সমস্যা কে মীমাংসা করিবে? লেখককে সঙ্গে সঙ্গে না পাইলে, ইহার মীমাংসার কোন পথ নাই। ফলতঃ সর্ব্বেব এলো মার্কণ্ডেয় গোল।

কথাপ্রসঙ্গে আরও দুই একটী কথা বলিতে হয়। এক দিন পুস্তকখানি এক প্রান্তে পড়িয়া আছে, একটি ব্যক্তি পুস্তকখানি লইয়া দেখিয়া আমাদিগকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। যথা,—মহাশয়! (১) "বায়ু বৃদ্ধি হইলে নাড়ীর গতি ঘড়ীর দোলন দণ্ডের ন্যায় একবার এপাশ একবার ওপাশ ভাবে স্পন্দিত হয়," ইহা কি প্রকারে বুঝা যাইতে পারে? (২) "অজীর্ণে জলপূর্ণ ধমনীর ন্যায় কঠিন এবং মৃদু হয়।" কঠিন মৃদু একাধারে কিপ্রকারে বুঝা যাইবে। (৩) "নাড়ীর গতি চঞ্চল হয়, এবং কখন কখন উহা দোলায়মান হইয়া স্পন্দিত হয়।" দোলায়মান হইয়া স্পন্দনটা কিরূপ? এপ্রকার বহুসংখ্যক প্রশ্ন করিয়া

আমাদিগকে উত্তেজিত করেন। আমরা বলিলাম এই সমস্ত বিষয়ে গ্রন্থকারের উপদেশ লউন। কাজেই তিনি অবাক হইলেন। উপসংহার কালে উক্ত ব্যক্তি গ্রন্থের ছবিটী দেখিয়া আরও একটী রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, "মহাশয়! ছবিটী কবিরাজ মহাশয়ের নিজের এবং তাহার রোগীর, না, উহা বারইয়ারির কোন সঙ্গের?" ইহা দ্বারাই পাঠক বুঝিবেন, পুস্তকখানি সাধারণের কিরূপ বুঝিবার উপযোগী হইয়াছে।

ভাল এক বটতলার সরস্বতী লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছি এবং পাঠকদিগের চিত্তবৈকল্য জন্মাইতেছি। প্রকৃতপক্ষে এই ডিমাই ১২ পেজি ২৪ পৃষ্ঠা পুস্তকের সমালোচনা ২৪ ফর্ম্মায়ও সম্পন্ন হয় কি না সন্দেহ। সুতরাং আমাদের এই স্থানেই অবসর গ্রহণ করিতে হইতেছে। উপসংহারকালে আমাদের সবিনয় প্রার্থনা এই যে, নিজে জ্ঞান লাভ না করিয়া কেহ যেন পরকে সুপণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করেন না। নিজের উদর পুরণের জন্য আয়ুর্ব্বেদের মস্তকে শাণিত খড়্গ যেন প্রয়োগ না করেন। গ্রন্থকারকে তাঁহার সাধু উদ্যমের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু এ উদ্যম বিষয়ান্তরে নিযুক্ত হইলেই ভাল ছিল।

অদ্যকার দ্বিতীয় সমালোচ্য গ্রন্থখানির নাম "চিকিৎসা সার সংগ্রহ"।* কিন্তু কোন্ প্রণালীগত চিকিৎসার সার সংগ্রহ নাম পাঠে তাহা সহজে জানা যায় না। একজন হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসক ইহার সঙ্কলনকারী। তিনি নাম দেন নাই, ভালই করিয়াছেন। তাঁহার সে বুদ্ধিটুকু আছে, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। গ্রন্থখানি বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। ভাষার দ্বারা বক্ষ্যমান বিষয় পরিস্ফুট হয়, অর্থের উপলব্ধি হয়।

* চিকিৎসার সংগ্রহ, জনৈক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, শ্রীরাজকুমার সেন দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৷৷৹ আনা।

ভাষা বিকৃত হইলে, গ্রন্থের উদ্দেশ্য বা পাঠকের অভিজ্ঞান কোন কালেই স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। ভাষাতেই জ্ঞানের সঞ্জীবনীশক্তি নিহিত রহিয়াছে। যে ভাষা বুঝা যায় না, তাহা দ্বারা কোন জ্ঞানও লাভ হয় না। মনের ভাব পশু প্রভৃতিও প্রকাশ করে, কিন্তু উহার ভাষা আমরা বুঝি না, কাজেই তদ্দ্বারা কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। এজন্য কাহাকেও কোন কথা বুঝাইতে হইলে ভাষাটী বুঝিবার মত হওয়া চাই, ক চ ট প্রভৃতি শব্দমাত্র উচ্চারণ করিলে, তদ্দ্বারা কোন অর্থ লাভ হয় না। কারণ কেহ তাহার অর্থ বুঝে না। আমাদের এতগুলি কথা বলার আবশ্যক এই যে, এই গ্রন্থখানিও ঠিক উক্ত শ্রেণীর। গ্রন্থকার কি লিখিয়াছেন, প্রথমতঃ তাঁহার ভাষাই বুঝা যায় না। সুতরাং এ গ্রন্থ দ্বারা কি অর্থ উপপন্ন হইবে আমরা তাহা বুঝি না। যিনি নিজের মনের ভাব নিজের ভাষায় পরিস্ফুট করিতে পারেন না, তিনি যে ভিন্নজাতীয় ভাষা ভাষান্তরে নীত করিতে পারিবেন আমরা এরূপ ভরসাও করি না। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠকগণ পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।

"ক্রমে তাহা ভয়ানক হইয়া এ নামাঙ্কিত হইয়া থাকে." "পিপাসা অল্পে তুষ্ট হয় না." "পিপাসা, জলশব্দের সহিত উদরস্থ হয়"। ইহা দ্বারা কিছু অর্থ বুঝিলেন কি?

গ্রন্থকার কোন্ অভিপ্রায়ে কোন্ কথা লিখিয়াছেন, পাঠকের তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। সপর্য্যায় জ্বরের চিকিৎসাতে গ্রন্থকার আর্সেনিকের লক্ষণ লিখিয়াছেন। যথা,—

"আর্সনিক। উত্তাপের সময় অতিরিক্ত পিপাসা। কিন্তু শৈত্যাবস্থায় থাকে না। প্রাতে জ্বর হয়, অপরাহ্নে চলিয়া যায়। নাড়ী দ্রুত ১২০ হইতে ১৩৫ পর্য্যন্ত হয়। গতিকালে ঘর্ম্ম। কুইনাইন ব্যবহারের পর উহা দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।"

আমরা গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করি, আর্সেনিকের নাড়ীর গতির স্পন্দনের সহিত 'একোনাটের" নাড়ীর গতির কি প্রভেদ? আর্সেনিকের জ্বরের সময়ের সহিত নক্সভমিকার জ্বরের সময়ের কি প্রভেদ?

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"স্বভাবতঃ যত্নপ্রসূত বস্তুতে আশা উৎসাহ ও সুখ নিহিত থাকে, পাঠকমণ্ডলী উদারতা মার্জ্জনা করিলে গ্রন্থকার অতি বিনীতভাবে তাহার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সম্বন্ধেও তাহা বলিতে পারে।" "উদারতা মার্জ্জনা করিলে" শব্দের অর্থ কি? উদারতা কি একটা অপরাধ, তাহা মার্জ্জনা করিতে হইবে?

এইরূপ যিনি স্বীয় ভাষাজ্ঞানের বিলক্ষণ পরিচয় দান করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে যে কি আছে, পাঠকগণ তাহা বিলক্ষণ অনুমান করিতে সমর্থ। যাঁহার ভাষাজ্ঞান নাই, তিনি কি লিখিতে কি লেখেন, তাঁহার গ্রন্থ যে কিরূপ পদার্থ, তাহা বলিয়া দিবার আবশ্যক নাই। যিনি দশটা কথা লিখিতে পাঁচটা ভুল করিয়া বসিয়াছেন, তিনি দুরূহ চিকিৎসা শাস্ত্রের বিজাতীয় ভাষায় লিখিত উক্তি গুলি অনুবাদ করিতে গিয়া কিরূপ ভ্রমকূপে পড়িতে পারেন, পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে সমর্থ।

ফল কথা পুস্তক খানির বাহ্য দৃশ্য যেরূপ, অভ্যন্তরও সেইমত। এরূপ পুস্তক যত কম প্রকাশ হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনীর বিনিময়ে আমরা নিম্ন-লিখিত মাসিক পত্র, সংবাদ পত্র ও পুস্তক পাইতেছি।

(১) বান্ধব ২২৯১ সাল চৈত্র পর্য্যন্ত।
(২) আর্য্যদর্শন ১ সংখ্যা
(৩) নবজীবন-১২৯২ সাল জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত
(৪) ভারতী-১২৯২ সাল জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত
(৫) নব্যভারত-১২৯২ সাল জ্যৈষ্ঠপর্য্যন্ত
(৬) প্রচার ৩ সংখ্যা
(৭) জাহ্নবী, সহচরী ও বিজ্ঞানদর্পন ১২৯২ সাল জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত
(৮) প্রবাহিনী
(৯) Agriculture Gazette, May 1885.
(১০) চিকিৎসা-সম্মিলনী, দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত।
(১১) ভারত।
(১২) সোমপ্রকাশ।
(১৩) নববিভাকর।
(১৪) Amritabazar Patrika
(১৫) আনন্দবাজার পত্রিকা
(১৬) এডুকেশন্‌গেজেট্‌।
(১৭) বঙ্গবাসী।
(১৮) সঞ্জীবনী।
(১৯) দৈনিক।
(২০) বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী।
(২১) পতাকা।
(২২) পরিদর্শক।
(২৩) সারস্বত।
(২৪) ঢাকাপ্রকাশ।
(২৫) সখা।
(২৬) গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা।
(২৭) প্রভাতী।
(২৮) সংবাদপ্রভাকর।
(২৯) সংস্কৃতচন্দ্রিকা।
(৩০) বিদ্যোদয়।
(৩১) ধর্ম্ম প্রচার।
(৩২) শিল্প ও কৃষিপত্রিকা।
(৩৪) সুরভি।
(৩৫) সাধারণী।
(৩৬) সময়।
(৩৭) Indian Echo.
(৩৮) কুশদহ
(৩৯) Indian Press guide.

ক্রমশঃ

বিজ্ঞাপন।

কার্য্যবিশেষে বাধা হইয়া আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী প্রকাশিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। এবার সঞ্জীবনীতে চারিটী পৃষ্ঠা বেশী যোজনা করা হইয়াছে।

শ্রীঅমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

মূল্যপ্রাপ্তি।

স্থানীয়।

নাম	ধাম	মূল্য
শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ কমলকৃষ্ণ সিংহবাহাদুর	শ্যামবাজার	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ মজুমদার	কাম্বেল মেডিকেল স্কুল	২৷৷৹
,, অক্ষয়কুমার দত্ত এটর্নি	বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট্	৩৲
,, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়	দরমাহাটা ষ্ট্রীট্	১৲
,, রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শিয়ালদহ	১৲
,, ভূতনাথ নন্দী	তালতলা জানবাজার	১৲
,, অতুলকৃষ্ণ মিত্র ডেঃ মাঃ	সিমলা	২৲
,, হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	সিমলা	৩৲
,, জগৎচন্দ্র রায়	সীতারামঘোষের ষ্ট্রীট্	১৲
,, নারায়ণকৃষ্ণ সেন	আহীরীটোলা	৩৲
,, গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	পাথুরিয়াঘাটা	৩৲
দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	বেঙ্গলব্যাঙ্ক	২৲
,, ফটিকচন্দ্র মজুমদার	কুমারটুলী	৩৲
,, বরদাকান্ত সেন ডাক্তার	কুমারটুলী	১৲
,, ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস	জানবাজার	৩৲
,, সুরেশচন্দ্র মিত্র	সুকিয়াষ্ট্রীট্	১৲
,, সীতানাথ মিত্র	রামবাগান	৩৲
,, হরিপ্রসাদ শূর	শোভাবাজার	২৲
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস	হরচন্দ্র মল্লিকেরষ্ট্রীট্	১৲
,, হেমচন্দ্র মিত্র	আহীরিটোলা	৩৲
,, গুরুপ্রসন্ন ঘোষ	জোড়াবাগান	৩৲
,, মহিমচন্দ্র সেন কবিরাজ	সিন্দুরিয়াপটি	৩৲
,, অক্ষয়কুমার মিত্র	রাজা গুরদাস্ ষ্ট্রীট্	১৲
,, সুবনাথ চৌধুরী	নেবুবাগান	৩৲

,,	দাশরথী নন্দী	অপর চিৎপুররোড	১৲
,,	তারানাথ বিশ্বাস	কম্বুলিয়াটোলা	১॥০
,,	অনাদিকৃষ্ণ মিত্র	নিমতলা	২৲
,,	মতিলাল রায়	আহীরীটোলা	৩৲
,,	নন্দলাল মিত্র	জেনারেল পোষ্টআপিস	১৲

বিদেশীয়।

শ্রীলশ্রীযুক্ত	রাজা শ্যামাশঙ্কর রায়বাহাদুর	তেওতা	৪।৶০
শ্রীযুক্ত	বাবু গোপালচন্দ্র গুহ মজুমদার	হরিচালী মামুদবাটী	১॥০
,,	শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী	ধুবড়ি	৩।৶০
,,	আনন্দচন্দ্র গুপ্ত কবিরাজ	রুপ্‌সা, চাঁদপুর	৩৲
,,	হরিনারায়ন চৌধুরী কবিরাজ	দেওঘর	৩৲
,,	কোকারাম সরকার	চৌড়িয়া ময়মনসিংহ	৩।৶০
,,	প্রাণগোবিন্দ রায়	চৌড়িয়া ময়মনসিংহ	২।৶০
,,	অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঘাটেশ্বর, রামবাটী	৩।০
,,	ত্রৈলোক্যনাথ রায়	সেরপুর বগুড়া	৩।৶০
,,	রাইচরণ হরি কবিরাজ	মবারকপুর খুলনা	৩।৶০
,,	জয়চন্দ্ররায়	হুগলী	৩৲
,,	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ডেঃ মাঃ রাজমহল	৩।৶০
,,	ক্ষেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	পাতরা মেদিনিপুর	৩।৶০
,,	রাধিকাপ্রসাদ সিংহ উকিল	কাটোয়া	৩।৶০
,,	শিবচন্দ্র ঘোষ	চাঁচড়া রাজবাটী যশোহর	৩।১০
,,	শশিভূষণ বসু	সেরপুর	৩।৶০
,,	কৃষ্ণসদয় ভট্টাচার্য্য কবিরাজ	শ্রীহট্ট	৩॥০
,,	ধরণীধর সামন্ত,	দেবীগঞ্জ	১॥০
,,	নীলকান্ত দাস	গোমস্তাপুর মালদহ	১৲
,,	আদিনাথ ঘোষ	ঢাকা	১৲
,,	শ্যামসুন্দর পণ্ডিত কবিরাজ	ভুলশুমা নসিয়াবাদ	১৲
,,	ভারতীকান্ত চক্রবর্ত্তী	বার্ণা বগুড়া	১৲

,,	হরিমোহন ঘোষ	বারাশত	১৲
,,	গোলকচন্দ্র দাস	ইতিনা ময়মন্‌সিংহ	৩৷৵৹
,,	জগতচন্দ্র রায়	ময়মন্‌ সিংহ	১৬৴৹
,,	মোহনচন্দ্র দাস	হবিগঞ্জত্রিপুরা	৩৷৵৹
,,	বিনোদবিহারি রায়	বাকিপুর	১৲
,,	ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঘাটভোগ খুলনা	১৲
,,	কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার	গয়া	৩৷৵৹
,,	শ্যামলাল চৌধুরি	গৌয়াটি আসাম	৩৷৵৹
,,	জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	৩৷৵৹
,,	অম্বিকাচরণ বসু উকীল	যশোহর	৩৲
,,	প্রসন্নকুমার মৈত্রেয়	বগুড়া	১৲
,,	গোবিন্দ দাস মোহন্ত	কাঁথাঝাড়া বাঁকুড়া	২৲
,,	প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়	কটক	৩৷৵৹
,,	ইন্দ্রচাঁদ লাহাটা	বালুচর	৩৷৵৹
,,	প্রকাশচন্দ্র দেব	আসাম শিলং	৩৷৵৹
,,	দিগাম্বর দাস	কুমড়াশাসন ময়মনসিংহ	৩৷৵৹
,,	কিশোরীচাঁদ মিত্র	বাগহাট	২৲
,,	ভগবতীচরণ সেন	খালিয়া	২৲
,,	জোনাবালীমীর কবিরাজ	জোড়খালি বগুড়া	৩৷৵৹
,,	কৃষ্ণনাথ নাথ কবিরাজ	ভাড়া সিমুলিয়া	৩৲
,,	রামচন্দ্র বসু নেটিভ ডাক্তার	মুকুন্দপুর	১৲
,,	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	দেওহাটা	১৲

আয়ুর্ব্বেদে উদ্ভিদ্বিদ্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে এই বিদ্যা এদেশে তিন্ মহা অংশে বিভক্ত ছিল। তাহার এক অংশ কৃষি-নামে, অপরাংশ মালাকার-শাস্ত্র এবং অবশিষ্টাংশ উদ্ভিদ্-শাস্ত্র অথবা বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ নামে অদ্যাপি পরিচিত আছে। বাস্তবপক্ষ বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, ঐ তিন্ পৃথক্ শাস্ত্র নহে ; একই শাস্ত্র। প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য গণের দ্বারা এই মহান্ শাস্ত্র উল্লিখিত বিভাগে বিভক্ত হইয়া অবশেষে পৃথক্ বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। এমত স্থলে, একে তিন্ অথবা তিনে এক, এরূপ নির্ণয় করা অসঙ্গত নহে। যাহাই হউক, আয়ুর্ব্বেদ-গৃহীত উক্ত মহা অংশটীকে উত্তমরূপে বিস্তার ও বিশদ করিবার অভিপ্রায়েই আমরা "আয়ুর্ব্বেদে উদ্ভিদ্বিদ্যা" এই সবিশেষণ নাম অর্পণ করিয়াছি এবং সেই জন্যই পূর্ব্বপ্রস্তাবে বলিয়াছি, আয়ুর্ব্বেদীয় উদ্ভিদ্বিদ্যা গর্ভকেশরের ও পরাগকেশরের কথা বলিবেন না। যাহা বলিবেন, তাহা আমরা যথাক্রমে ও সাধ্যানুসারে ব্যক্ত করিব।

উদ্ভিদ্ এক প্রকার স্থাবর জীব। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বিচার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, উদ্ভিদ্ নির্জীব পদার্থ নহে ; উহা এক প্রকার স্থাবর জীব। তাঁহাদের মতে জীব দুই প্রকার। এক স্থাবর জীব, অপর জঙ্গম জীব।

"সেন্দ্রিয়ং চেতনং প্রোক্তং নিরিন্দ্রিয়মচেতনম্ ॥" চরক।

যাহাদের ইন্দ্রিয় আছে, মন আছে, তাহারা চেতন ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ নামে অভিহিত হয় এবং যাহাদের ইন্দ্রিয় নাই, অভিব্যক্ত

মন নাই, তাহারা স্থাবর ও অচেতন এই নাম দ্বয় ধারণ করে। এই কারণেই মহাত্মা রাঘবভট্ট বলিয়াছেন ;—

"উদ্ভিদঃ স্থাবরা জীবাস্তৃণগুল্মাদিরূপিণঃ।"

উদ্ভিদ্ সকল স্থাবর জীব এবং তাহারা তৃণ ও গুল্ম প্রভৃতিরূপে অবস্থিত। মহামহোপাধ্যায় হিন্দু পণ্ডিতেরা তৃণাদি স্থাবর পদার্থকে জীব বলেন কেন? জীববিশেষণে বিশেষিত করেন কেন? তাহা আমরা অন্য এক স্থানে বর্ণন করিব। ফলতঃ, হিন্দু পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, স্থাবর মধ্যে সজীব ও নির্জ্জীব এই দ্বিবিধ ভেদ বা বিভাগ আছে।

লিনীয়স্ নামক জনৈক ইয়ুরোপীয় উদ্ভিত্তত্ত্ববিৎ জগতের সমুদায় পদার্থকে তিন্ ভাগে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ,—এই নাম ত্রয় প্রদান করিয়াছেন এবং বিভাগের কারণ বা লক্ষণভেদ নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছেন।

১। প্রাণিগণ চেতন; তাহারা বর্দ্ধিত হয়, নির্দ্দিষ্ট কাল জীবিত থাকে; এবং সুখ দুঃখাদি অনুভব করে।

২। আকরীয় অর্থাৎ খনিজ পদার্থ সকল অচেতন; তাহারা কেবল মাত্র বর্দ্ধিত হয়।

৩। বৃক্ষাদি ভৌম্-পদার্থ সকল উদ্ভিদ্; তাহারা বর্দ্ধিত হয়, এবং নির্দ্দিষ্টকাল জীবিত থাকে।

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত লীনিয়স্ উদ্ভিদ্ জাতির নির্দ্দিষ্ট কাল জীবিত থাকার কথা বলিলেন কিন্তু তাহারা সুখ দুঃখ বোধ করে কি না তাহার কোন সিদ্ধান্ত করিতে সাহস করিলেন না। যাহাই হউক, তিনি যখন উদ্ভিদ জাতির জীবিত থাকার কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহা যখন সর্ব্বলোকের প্রত্যক্ষগম্য হইতেছে, তখন আর কেহই বোধহয় এই মহাজাতিকে জীবনশূন্য বা নির্জ্জীব পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। ইহাদের ইন্দ্রিয় না থাকিতেও পারে,

অভিব্যক্ত মন না থাকিতেও পারে, সুতরাং ইহারা সুখ দুঃখবোধ শূন্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহারা আকরীয় পদার্থের ন্যায় জীবন শূন্য বা নির্জীব নহে ; ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সৎসিদ্ধান্ত। *

উদ্ভিজ্জ-জীবের জাতি ও শ্রেণীবিভাগ।

অন্যান্য জীব বংশের ন্যায় উদ্ভিদ্ বংশও বিশাল ও বহুবিস্তীর্ণ। সেই জন্যই এই ভূমণ্ডলে অসংখ্য প্রকার উদ্ভিদ্ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্গের বহুত্ব থাকিলে, তৎসম্বন্ধীয় শিক্ষা বা উপদেশ প্রদান করিবার জন্য প্রথমতঃ নির্দ্দিষ্টতর লক্ষণ, চিহ্ন বা সৌসাদৃশ্য অনুসারে তন্মধ্য হইতে শ্রেণী, জাতি, বর্গ, গণ, ইত্যাদি বহুপ্রকার বিভাগ কল্পনা করিয়া লইতে হয়। অন্যথা, সেই সেই বংশের স্বভাব বা বিশেষ বিশেষ ভাব সহজে হৃদয়ঙ্গম করান যায় না। যদি প্রত্যেকের বিবরণ উল্লেখ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে অনন্তকালেও শেষ হয় না। কিন্তু যদি জাতি ও গণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিভাগ স্থিরীকৃত করিয়া সেই সেই বিভাগের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য জ্ঞানগম্য করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই তদ্দারা সহজে ও অল্পকালে সেই সেই বৃহত্তর জাতির গুণাগুণ ও জাত্যাদি বোধক ধর্ম্ম জ্ঞানগোচর করা যাইতে পারে। পূর্ব্বতন ঋষিরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া উদ্ভিদ সকলের অত্যন্ত পৃথক বা বিভিন্ন ধর্ম্ম সকল সমাহরণ পূর্ব্বক উদ্ভিদ জাতিকে প্রথমতঃ পাঁচ মহাবিভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

১। বৃক্ষ।
২। গুল্ম।
৩। লতা।
৪। বল্লী।
৫। তৃণ।

* উদ্ভিদ্জীব সুখ দুঃখ অনুভব করে কি না তাহা অন্য কোন প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করা হইবে।

ইয়ুরোপীয় নব্য উদ্ভিদ্বেত্তারা প্রথমতঃ সমুদায় উদ্ভিদের সপুষ্পক ও অপুষ্পক এই দুই মহাভেদের উল্লেখ করিয়া, তাহাদেরই অংসখ্য অবান্তর প্রভেদ বর্ণন করিয়াছেন সত্য; পরন্তু আমাদের দেশের পুরাতন পণ্ডিতেরা ঐ দুই মহা লক্ষণকে যাবন্ত উদ্ভিদের ভেদক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, সপুষ্পক ও অপুষ্পক এই দুই লক্ষণ বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদের ভেদক ধর্ম্ম; বংশ সাধারণের নহে *। পুষ্পঘটিত লক্ষণটীকে বংশ সাধারণের ভেদক করিতে গেলে অবান্তর বিভাগ গুলি সংকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং সম্মূর্চ্ছন জাত ছাতা ও ঘাস প্রভৃতি স্থলে উক্ত লক্ষণের ব্যভিচার অথবা অসমাবেশ ঘটনা হয়। সম্মূর্চ্ছনজাত ঘাস প্রভৃতি তুচ্ছ তৃণ জাতি পুষ্পের অথবা পুষ্পাভাবের জ্ঞানের দ্বারা পরিচিহ্নিত নহে। কাযে কাযেই বলিতে হইয়াছে, উক্ত দ্বিভেদক লক্ষণ নিতান্ত সংকীর্ণ।

বৃক্ষ—এই বিভাগটী সর্ব্বপরিচিত।

গুল্ম—যাহাদের কাণ্ড নাই তাহারা গুল্ম। †

লতা—প্রসিদ্ধ।

বল্লী—যে জাতীয় লতা শাখাদির দ্বারা ভূতলে বিস্তৃত হয়।

তৃণ—ঘাস জাতীয়।

অবান্তর জাতিবিভাগকালে এই সকল মূল জাতির লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদত্ত হইবে।

কি অনুসারে উল্লিখিত পাঁচ প্রকার প্রধান বিভাগ প্রকল্পিত হইয়াছে তাহা আমাদের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। প্রাচীন উদ্ভিত্তত্ত্ব বিশারদগণ যদিও উক্তপ্রকার বিভাগ কল্পনার কোনরূপ প্রণালী বর্ণন করেন নাই; তথাপি, সেই সেই বিভাগের পর্য্যায়

* "বানস্পত্যঃ ফলৈঃ পুষ্পাৎ তৈরপুষ্পাদ্বনস্পতিঃ।" বনৌষধিকাণ্ড দেখ।

† অপ্রকাণ্ডে স্তম্বগুল্মৌ। [বনৌষধিবর্গ দেখ।

শব্দের ব্যুৎপত্তির দ্বারা অর্থাৎ জাতি, গুণ ও ক্রিয়া ঘটিত নামের দ্বারা প্রণালী বা পদ্ধতি সকল সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অনুসন্ধানের দ্বারা জানা গিয়াছে যে, উদ্ভিদের বিভাগ কল্পনা কতক ধর্ম্মান্বয়মূলক, কতক সৌসাদৃশ্যমূলক, কতক বা প্রাকৃতিক-সম্বন্ধমূলক।

ধর্ম্মান্বয়।—এমন কোন গুণ বা ধর্ম্ম আছে যাহা পরস্পর বিরুদ্ধাকার উদ্ভিদে তুল্যরূপে অনুগত থাকে। এবম্বিধ ধর্ম্মান্বয় দেখিয়া, অনেক গুলি বিভাগ কল্পিত হইয়াছে।

সৌসাদৃশ্য।—আকার প্রকারে কি কোন এক অংশে সাম্য থাকায়, তদনুযায়ী বিভাগ সকল সাদৃশ্যমূলক বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রাকৃতিক সম্বন্ধ।—উদ্ভিদ্‌প্রকৃতি বা উদ্ভিদের উপাদান অনেক প্রকার। তাহার কোন এক প্রকার প্রকৃতি বহু উদ্ভিদে দৃষ্ট হইলে, সেই প্রাকৃতিক সম্বন্ধ তখন তাহাদের বিভাগনির্দ্দেশক বলিয়া গণ্য হয়। এসকলের উদাহরণ অর্থাৎ বিভাগ নির্ণায়ক প্রণালী বুঝিবার নিদর্শন সকল যথাযথ স্থানে প্রদর্শিত হইবে। বস্তুতঃ প্রমুখ্য লক্ষণ ধরিয়াই পূর্ব্বকালে উদ্ভিদের জাতি, বর্গ, গণ, ইত্যাদি ইত্যাদি বিভাগ সকল কল্পিত হইয়াছিল, ইহা সহজেই বোধগম্য করা যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিস্তীর্ণ উদ্ভিদ্বিদ্যা পূর্ব্বে তিন্ মহা বিভাগে বিভক্ত ছিল। কৃষি, মালাকারীয় শাস্ত্র ও বৈদ্যকগৃহীত বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ নামক উদ্ভিদ্‌শাস্ত্র। কৃষি-বিভাগের আচার্য্যেরা বলিয়াছেন যে, বনস্পতিকায় সকল অর্থাৎ উদ্ভিদ্ জীব সকল প্রধান কল্পে দুই অথবা পাঁচ মহাবিভাগে বিভক্ত হইলেও ধর্ম্মান্বয় ও উৎপত্তি ঘটিত প্রাকৃতিক সম্বন্ধ অনুসারে মুখ্য কল্পে ছয় ভাগে বিভক্ত করা উচিত। যথা ;—

১। অগ্রবীজ।
২। মূলজ।
৩। পর্ব্বযোনি।
৪। স্কন্ধজ।
৫। বীজরুহ।
৬। সম্মূর্চ্ছজ।

এ সকলের উদাহরণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে। উদ্ভিদ্বিদ্যার অন্যতম অঙ্গদ্বয় অর্থাৎ যাহা মালাকার শাস্ত্র ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ নামে বিখ্যাত, সেই দুই প্রধান অঙ্গেও এবম্প্রকার বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা ;—

"বনস্পতি দ্রুম-লতা-গুল্মাঃ পাদপজাতয়ঃ।
বীজাৎ কাণ্ডাত্তথা কন্দাৎ তজ্জন্ম ত্রিবিধং বিদুঃ॥
তৃণান্যোষধয়শ্চৈব পৃথক্ জাতিঃ প্রদিশ্যতে।
জন্মাদিভেদাত্তেষাং বৈ পার্থক্যমনুমীয়তে॥"

+ × + +

"তে বনস্পতয়ঃ প্রোক্তা বিনা পুষ্পৈঃ ফলন্তি যে।
দ্রুমাশ্চান্যে নিগদিতাঃ পুষ্পৈঃ সহ ফলন্তি যে॥
প্রসরন্তি প্রতানৈর্বা স্তা লতাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বহুস্তম্বাঽবিটপিনো যে তে গুল্মাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

+ + + +

"জম্বুচম্পকপুন্নাগনাগকেশরচিঞ্চিনী।
কপিত্থবদরী বিল্ব কুম্ভকারী প্রিয়ঙ্গবঃ॥
পনসাম্র মধূকাদ্যাঃ করমর্দ্দাশ্চ বীজজাঃ।
তাম্বূলী সিন্দুবারশ্চ তগরাদ্যাশ্চ কাণ্ডজাঃ॥
পাটলা দাড়িমী প্লক্ষকরবীরবটাদয়ঃ।
মল্লিকোদুম্বরৌ কুন্দো বীজকাণ্ডোদ্ভবা মতাঃ॥

কুঙ্কুমার্দ্র রসো নালু কাদ্যাঃ কন্দসমুদ্ভবাঃ।
এলাপত্রোৎপলাদীনি বীজকন্দোদ্ভবানি হি ॥"

\+ \+ \+ ×

(বৃহৎশার্ঙ্গধরধৃত পাদপবিবক্ষাপ্রকরণ দেখ।

এই কএকটী সংস্কৃত শ্লোকের মোটামুটি ব্যাখ্যা করিয়া দিলেই বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ও মালাকার-শাস্ত্রের অভিমত উদ্ভিদ্বংশের শ্রেণী বিভাগ বা জাতি পরিকল্পনা জানা যাইতে পারে। যথা ;—

প্রথমতঃ পাদপ এক মহাজাতি। এই মহাজাতির অন্তর্নিবিষ্ট জাতি চারি প্রকার। বনস্পতি (১), দ্রুম (২), লতা (৩), ও গুল্ম (৪)। জন্মনামক প্রাকৃতিক ক্রিয়ার প্রভেদ থাকায় ঐ প্রকার ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কতক বীজ হইতে, কতক কাণ্ড হইতে, কতক বা কন্দ অর্থাৎ মূল হইতে ঐ সকলের জন্ম হইয়া থাকে। তৃণ ও ঔষধি নামক তৃণান্তর সকল পৃথক্ জাতি বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কেননা উহাদের সহিত ইহাদের জন্মমরণাদির সাম্য নাই।

যাহাদের পুষ্প হয় না, অথচ ফল হয়, তাহারা বনস্পতি। যাহাদের পুষ্প হয় ও ফলও হয়, তাহারা দ্রুম। যাহারা প্রতানিত ও প্রসারিত হয় তাহারা লতা। যাহারা স্তম্বযুক্ত অর্থাৎ যাহাদের কাণ্ড বা বিটপ (বড় বড় ডাল) হয় না, তাহারা গুল্ম।

জাম, চাঁপা, পুন্নাগ, নাগকেশর, চিঞ্চা, কপিত্থ, কুল, বেল, কুম্ভকারী, প্রিয়ঙ্গু, কাঁঠাল, আম, মধূক ও করমচা প্রভৃতি বীজজ। তাম্বূলী, সিন্দুবার ও তগর প্রভৃতি কাণ্ডজ। পাটলা, দাড়িম, প্লক্ষ (পাকুড়) করবীর ও বট প্রভৃতি এবং মল্লিকা, যগডুমুর, ও কুঁদ প্রভৃতি উভয়জ অর্থাৎ ইহারা বীজ হইতেও জন্মে, কাণ্ড হইতেও জন্মে। এতদ্ভিন্ন কুঙ্কুম, আদা, লশুন ও আলু প্রভৃতি কতক গুলি কেবল কন্দজ জাতি আছে এবং এলাইচ, পদ্ম ও উৎপল প্রভৃতি

কতকগুলি উদ্ভিদ বীজ ও কন্দ উভয় হইতে জন্ম লাভ করে বলিয়া উভয়জ জাতি বলিয়া সংগৃহীত হয়।

মত-নিষ্কর্ষ।

উল্লিখিত শাস্ত্রদ্বয়ের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপ অথবা মত-নিষ্কর্ষ এই যে, সমুদায় সজীব উদ্ভিদ জাতি মুখ্যতঃ প্রধান দুই মহাবিভাগে বিভক্ত। এক পাদপ জাতি; অপর তৃণ-জাতি। এই দুই মহাবিভাগের অন্তর্ভূত বিভাগ অনেক। তন্মধ্যে পাদপ জাতি চারিশ্রেণী বা চারি প্রকার। ১ বনস্পতি, ২ দ্রুম, ৩ লতা, ৪ গুল্ম। তৃণ বিভাগের মধ্যেও ওষধি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে। সেই সকল বিভাগের মধ্যে আবার জন্মাদি কৃত বিভাগান্তর লক্ষিত হয়। প্রধান কল্পে প্রথম পক্ষে তিন প্রকার, দ্বিতীয় পক্ষেও অন্যূন ছয় প্রকার। প্রথম শ্রেণীতে ১ বীজজ, ২ কাণ্ডজ, ৩ কন্দজ। দ্বিতীয় শ্রেণীতেও ১ সম্মূর্চ্ছজ, ২ বীজজ, ৩ কন্দজ, ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন উভয়জ-জাতিও দৃষ্ট হয়।

এই মতের সহিত পূর্ব্বোক্ত কৃষিশাস্ত্রীয় মতের প্রায় ঐক্য বা মতসামঞ্জস্য আছে। যথা;—

১। অগ্রবীজ।—যাহাদের আগা কাটিয়া লইয়া রোপণ করিতে হয় তাহারা অগ্রবীজ জাতীয়। এই অগ্রবীজ আর কাণ্ডরোপ্য প্রায় তুল্য কথা।

২ মূলজ।—যাহাদের মুল প্রোথিত করিলে গাছ জন্মে তাহারা মূলজ। এই মূলজ আর কন্দজ সমান কথা।

৩ পর্ব্বযোনি।—যাহাদের গাঁইট রোপণ করিলে গাছ জন্মে তাহারা পার্ব্বযোনি নামে প্রসিদ্ধ। এই পর্ব্বযোনি জাতিও কাণ্ডজ জাতির অন্তর্ভূত।

৪ স্কন্ধজ।—এই স্কন্দজ জাতিকেও কাণ্ডজ মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে।

৫ বীজরুহ।—বীজরুহ ও বীজ-জ সমান কথা।

৬ সম্মূর্চ্ছজ।—ক্ষিতি, জল, পবন ও তেজ পরস্পর সমবহিত হইয়া কর্দ্দমীভূত মৃত্তিকাকে পাক বিশেষে উপনীত করিলে তাহা হইতে যে শস্পজাতীয় উদ্ভিদ জন্মে, তাহারাই সম্মূর্চ্ছজ জাতি বলিয়া গণ্য। ভূতনিচয়ের পরস্পরানুপ্রবেশ-নিমিত্তক পরিপাক বিশেষের নাম সম্মূর্চ্ছন ও তাহাই শস্প বা তৃণাদি উদ্ভিদের বীজ*।

উদ্ভিদ জাতির বংশ ও তত্তাবতের অবান্তর প্রভেদ,—এই দুই বিষয়ের উপর প্রাচীন উদ্ভিদতত্ত্ববিশারদগণের এইরূপ অনেক কথা বিদ্যমান আছে। সে সকলের তাৎপর্য্য এক্ষণে নিতান্ত দুরূহ বা দুষ্প্রতর্ক্য। সুতরাং এক একটী করিয়া বলাই উচিত এবং সুখবোধের নিমিত্ত এক একটী উদাহরণ দেখান অত্যাবশ্যক। তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে বিস্তীর্ণতম উদ্ভিদ্বংশের সহিত মানবীয় জ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় হইতে পারে, অন্যথা তাহা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে।

উদ্ভিদ্বংশের অন্তর্গত শ্রেণী, জাতি, বর্গ, গণ এবং তন্নিবিষ্ট গুণাগুণ ও সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য, এ সমস্তই চিকিৎসকগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বস্তু। অতএব, উদ্ভিদ্বিদ্যা যে বৈদ্যগণের মহোপকারী, তৎপক্ষে কাহারও কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

একটী সুপরিচিত উদ্ভিদ লইয়া তাহার আকার ও ধর্ম্ম (প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বা জন্মমরণাদি ক্রিয়া প্রভৃতি) ভূয়িষ্ঠভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া অন্য

* "কুরুণ্ট্যাদ্যা অগ্রবীজা মূলজাস্তূৎপলাদয়ঃ।
পর্ব্বযোনয় ইক্ষ্বাদ্যাঃ স্কন্দজাসল্লকীমুখাঃ॥
শাল্যাদয়ো বীজরুহাঃ সম্মূর্চ্ছজাস্তৃণাদয়ঃ।
স্যুর্বনস্পতিকায়স্য ষড়েতে মূলজাতয়ঃ॥" হৈম ভূমিকাকাণ্ড দেখ।
"তত্র সিক্তাজলৈ র্ভূমি রন্তরুষ্মবিপাচিতা।
বায়ুনা ব্যূহ্যমানা বৈ বীজত্বমুপ পদ্যতে॥" বাঘবভট্ট।

এক উদ্ভিদের সহিত তত্তাবতের তুলনা করিয়া দেখিবেন। তুলনায় যদি মিলিয়া যায় তবে তাহা এক বা তুল্যজাতি, এইরূপ স্থির করিবেন। অপর কোনও একটী প্রমুখ্য লক্ষণ বা চিহ্ন গ্রহণ করিয়া শ্রেণী; তদপেক্ষা অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম বা গুণসাম্য অথবা কার্য্যকারিতা মাত্র লইয়া বর্গ এবং কেবলমাত্র তুল্যকার্য্যকারিতাভাগ গ্রহণ করিয়া গণ, এইরূপ বিভাগ সকল স্থির করিবেন। এবংক্রমে বিভাগ কল্পনা করা প্রাচীন উদ্ভিদ্‌বেত্তাদিগের অভিপ্রেত।

প্রসঙ্গক্রমে এই স্থলে আর একটী কথার অবতারণা করিতে হইল। কথাটী এই যে, আয়ুর্ব্বেদাঙ্গ উদ্ভিদ্বিদ্যা যে কেবল উদ্ভিদের বংশাদি নিরূপণ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, এরূপ নহে। উদ্ভিদ্‌জাতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভাগ ও তাহাদের স্বভাবাদিও সংক্ষেপে উপদেশ করিয়াছেন। ফল, পুষ্প, পত্র, ত্বক্‌, সার, নির্য্যাস, প্ররোহ, মূল ও তাহাদের আকৃতি প্রভৃতি সমস্তই সংক্ষিপ্ত কথায় বর্ণন করিয়াছেন। কি প্রকারে উদ্ভিদ্ শরীরে রস-সঞ্চার হয়? কি প্রক্রিয়ায় তাহারা নির্দ্দিষ্ট কাল জীবিত থাকে? এ সকল অবান্তর তথ্যও বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই শাস্ত্রের আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ অদ্যাপি সজীব অবস্থায় বিদ্যমান আছে। সে অংশ এক্ষণে "দ্রব্যগুণ" নামে অভিহিত হইতেছে। প্রাচীন উদ্ভিত্তত্ত্বজ্ঞদিগের জ্ঞান এই দ্রব্যগুণ অংশে অতি অদ্ভুতরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঔদ্ভিদিক শরীরের সহিত যে মানব শরীরের প্রতিপাল্য প্রতিপালক সম্বন্ধ আছে,—সেই সম্বন্ধের রহস্য বিজ্ঞান অত্যন্ত নিগূঢ় ও দুর্নিরূপ্য। পরন্তু ঋষিরা তাহা নিরূপণ করিতে অথবা জানিতে অসমর্থ হয়েন নাই। এসকল কথা আমরা কিছু দূর অগ্রগামী হইয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

শারীরশাস্ত্রে যেমন মৃতদেহ কর্ত্তন করিয়া তন্মধ্যস্থ শিরাপ্রশিরা প্রভৃতি জানিবার উপদেশ আছে, উদ্ভিদশাস্ত্রেও সেইরূপ উদ্ভিদাঙ্গ

কর্ত্তন করিয়া তাহাদের রসবাহী শিরা প্রশিরা প্রভৃতি জ্ঞাত হইবার উপদেশ আছে। এ কথা হয় ত অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না। এখন না করেন, কিন্তু যখন আমরা ঐ সকল তথ্য সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হইব, অবশ্যই তখন তাহা জনসাধারণের বিশ্বাস্য হইবে, সন্দেহ নাই। যাহাই হউক আপাততঃ এইস্থানে আমরা বিশ্বাসসূচক একটী সামান্য নিদর্শনের উল্লেখ করিতেছি।

শাস্ত্রসমূহের যোনিস্বরূপ বেদ যজ্ঞকাণ্ড উপলক্ষে বলিয়াছেন, যে,—

"উদ্ভিদা যজেত।"

উদ্ভিদের দ্বারা যজ্ঞ করিবেক।

"বপামিব জালকমাহরেৎ।"

অন্যান্য যজ্ঞে যেমন মারিত পশুর বপা (বুক মাংস) লইয়া হোম করিতে হয়, উদ্ভিদযাগে সেইরূপ "জালক" লইয়া হোম করিতে হয়।

"যজ্জালকমিব দৃশ্যতে তদস্য জালকত্বম্।" *

যেহেতু কর্ত্তন করিলে সমস্তই জালবৎ দৃষ্ট হয়, সেইহেতু তাহা জালক নামে খ্যাত।

এই বৈদিক কথা গুলির অর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্য তাৎপর্য্য বাহির করিতে পারিলেই আমাদের পূর্ব্বোক্ত উল্লেখ সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারিবে।

বনৌষধি বর্গে লিখিত আছে, "ক্ষারকো জালকং ক্লীবে।" ক্ষারক ও জালক এই দুইটী অপুষ্পক কলিকার নাম বা পর্য্যায় শব্দ উহা কুঁড়ি, কোঁড় বা কোঁড়ার নাম। যেমন বাঁশের কোঁড়। কোঁড়ের "জালক" নাম হইবার কারণ পূর্ব্বোক্ত বৈদিক-নির্ব্বচনে দেখান হইয়াছে। কোঁড় কর্ত্তন করিলে জালবৎ দেখা যায় বলিয়াই জালক। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার জালক আর ইংরাজি হইতে অনুবাদিত

* মীমাংসা-ন্যায়-প্রকাশের টীকা দেখ।

"বিবরাঙ্কিতস্তর" তুল্যার্থ বলিয়া প্রতীত হয়। নব্য উদ্ভিদ্বিদ্যা বিশারদগণ 'বিবরাঙ্কিত স্তরের' যেরূপ চিত্র দেখাইয়াছেন, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জালকের চিত্রও তদনুরূপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। যথা,—
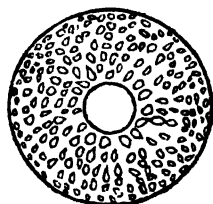
নব্য উদ্ভিদ্বিদ্যাপ্রচারকগণ বলেন, ঐ বিবরাঙ্কিত স্তর অন্য কোন বস্তু নহে; উহা ঔদ্ভিদিক শিরাবিশেষের সমষ্টি। যাহাই হউক, এদেশের প্রাচীন উদ্ভিজ্জতত্ত্বনির্ণায়ক পণ্ডিতেরা যখন কোঁড়জাতীয় কলিকার অভ্যন্তরে জালক অর্থাৎ বিবরাঙ্কিতশিরাস্তর থাকা বর্ণন করিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে উদ্ভিদ্ব্যবচ্ছেদবিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যাহাই হউক, এক্ষণে পাঠকগণের নিকট আমাদের অনুরোধ ও প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন আমাদের অনুরোধে ও প্রার্থনায় কিঞ্চিৎকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করেন। তাহা হইলে আমরা ক্রমে সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বীক্রমে প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইব। নানাস্থান হইতে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পুস্তক হইতে সমাহরণ পূর্ব্বক এই সকল তথ্য প্রকাশ করিতে হইবে; সুতরাং আমরা শীঘ্র শীঘ্র পাঠকগণের কুতূহল চরিতার্থ করিতে পারিব না। এসকল বিষয়ের যদি কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তক থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই আমরা শীঘ্র শীঘ্র প্রণালীপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদীয় উদ্ভিদ্বিদ্যাটী অনুবাদ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিতে পারিতাম।

আপত্তি ও সমাধান।

এই প্রস্তাবের প্রথমে যে উদ্ভিদ্‌জাতির লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া হয়-ত অনেক নব্য পাঠক আপত্তি উত্থাপন করিবেন। বলিবেন, যাহারা ভূমি উদ্ভেদ করিয়া জন্ম লাভ করে, কেবল তাহারাই যদি উদ্ভিজ্জ বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে, জলোপরি ভাসমান শৈবাল ও বায়ুমাত্র ভোজী আল্‌গোচ লতা প্রভৃতিতে উদ্ভিজ্জ লক্ষণ যাইবে না। কেননা, জলজন্মা পানা ও শৈবাল প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌ ভূমি উদ্ভেদ ব্যতীত কেবলমাত্র জলোপরি জন্মিতে দেখা যায় এবং "আল্‌গোচ লতা" ও "সোণা লতা" নামক এক প্রকার উদ্ভিদ্‌ আছে, তাহাদিগকেও কেবলমাত্র বৃক্ষোপরি অসংশ্লিষ্টরূপে অর্থাৎ আল্‌গোচ্‌ ভাবে স্থিতি করিতে দেখা যায়। সুতরাং ঐ সকল পদার্থকে ভূমি সম্পর্কজাত উদ্ভিজ্জ মধ্যে নিবিষ্ট করা যায় না; না করিলে অবশ্যই প্রোক্ত লক্ষণের ব্যভিচার হয়।

আপত্তিটী মন্দ নহে; পরন্তু ইহার পরিহার জন্য মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র এক স্থানে বলিয়াছেন যে,—

"অধিকেন হি ব্যপদেশা ভবন্তি। তথাহি লোকে ক্ষিতিজল পবন সমবধানজন্মাপ্যঙ্কুরঃ ক্ষিত্যঙ্কুর ইত্যুচ্যতে।"

অর্থ এই যে, নাম মাত্রেই প্রায়িক, অর্থাৎ আধিক্য অনুসারেই উল্লিখিত হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, অঙ্কুর সকল মৃত্তিকা, জল ও বায়ুরূপ কারণ অবলম্বন করিয়া জন্ম লাভ করিলেও লোক সকল মৃত্তিকাঙ্কুর অর্থাৎ মৃত্তিকাজাত বলিয়া উল্লেখ করে। বস্তুতঃ বহুল অঙ্কুরই ক্ষিতিপ্রভব হইতে দেখা যায় এবং প্রত্যেক অঙ্কুরে ক্ষিতি ধাতুর বাহুল্য অর্থাৎ আধিক্য থাকা অনুমিত হয়। অতএব, "উদ্ভিদ্য ভূমিং নির্গচ্ছেৎ উদ্ভিজ্জঃ স্থাবরোহি সঃ।" এই প্রাচীন পরিকল্পিত লক্ষণ যে জলীয় ও বায়ব্য উদ্ভিদের সংগ্রাহক; তাহা

অত্যল্প বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যে জরায়ুজ অণ্ডজ ও স্বেদজ জীব ব্যতীত অন্য সমুদায়কে উদ্ভিজ্জ নামে পরিগণিত করিয়া গিয়াছেন তাহা সঙ্গত ভিন্ন অসঙ্গত নহে।

এ সম্বন্ধে অপর কথা এই যে, কিঞ্চিৎ উপলক্ষণভাব স্বীকার না করিলে লক্ষণ মাত্রেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশেষত উদ্ভিদ সম্বন্ধে এমন কোন লক্ষণ হইতে পারে না, যাহা বিনা উপলক্ষণ অঙ্গীকারে সর্ব্বত্র সমন্বয় হইতে পারে। উদ্ভিদের মূল কি? মূলের লক্ষণ কি? কোন্ অংশকে মূল বলে; ইহা বুঝাইবার জন্য নব্য পণ্ডিতগণ মূলের যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতেও উদ্ভিজ্জ লক্ষণের ন্যায় অব্যাপ্তি দোষ আছে। সুতরাং তাঁহারাও যেমন মূল লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ পরিহারার্থ উপলক্ষক ধর্ম্মগুলি সংগ্রহ করিয়া মূল-লক্ষণের পূর্ণতা করিয়া থাকেন; প্রাচীন পণ্ডিতেরাও সেইরূপ উদ্ভিদ্‌লক্ষণের উপলক্ষক ধর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া দিয়া তাহার পূর্ণতা করিয়া থাকেন। নব্য পণ্ডিতগণের মতে মূলের লক্ষণ যথা;—

উদ্ভিদের যে অংশ মৃত্তিকার মধ্যে থাকে, যাহার বলে উদ্ভিদ্ মৃত্তিকার উপর সোজা থাকে, যাহার দ্বারা মার্ত্তিক্য রস শরীরস্থ করিয়া উদ্ভিদ সকল জীবিত থাকে, তাহাকে "মূল" কহে।"

বিবেচনা করিয়া দেখুন, নব্যদিগের এই মূল লক্ষণটী সমস্ত লক্ষ্য ব্যাপক হইল কি না। অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন, এই লক্ষণ অনেক মূলে খাটে না। গিরিগুহা কিংবা গৃহাদির উপরিভাগস্থ লম্বমান উদ্ভিদের মূল মৃত্তিকায় থাকে না এবং অধোধাবিত না হইয়া তাহারা ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। পানা প্রভৃতি জলীয় উদ্ভিদের মূল মৃত্তিকাস্পর্শী নহে। সুতরাং তাহারাও মার্ত্তিক্য রস শরীরস্থ করে না। পূর্ব্বোক্ত আল্‌গোচ লতারও প্রোক্তলক্ষণ মূল

নাই। এমন কি এই লতার মূল কোথায়? কোন্ অংশের নাম মূল? তাহা কিছুমাত্র জানা যায় না। সুতরাং নব্যদিগের মূল লক্ষণটীতে অব্যাপ্তি দোষ আছে, তাহার পরিহারের জন্য "বাহুল্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি" এই পুরাতন ন্যায়ের আশ্রয় লইয়া প্রায়িকতা পক্ষ অঙ্গীকার করিতে হয় এবং মূলের কার্য্য কি? কিরূপ ক্রিয়াশক্তি থাকিলে তদংশের মূল নাম দেওয়া যাইতে পারে, তাহা অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হইয়া সেই শক্তিমৎ অংশকেই মূল নামক বিশেষণে বিশেষিত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন "পাদপ" লক্ষণ অনুসন্ধান করিলেও ঐরূপ দোষ দৃষ্ট হইবে। "পাদপ" এটী ছোট বড় বৃক্ষ সাধারণের নাম। পদের দ্বারা অর্থাৎ শিকড়ের দ্বারা মৃত্তিকারস আকর্ষণ পূর্ব্বক জীবিত থাকে ও পুষ্ট হয় বলিয়া পাদপ নাম হইয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এমন অনেক ক্ষুদ্র পাদপ আছে; তাহারা শিকড়ের দ্বারা রসাকর্ষণ না করিয়া শিখরের দ্বারা বায়বীয় পদার্থ মাত্র গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, ও পুষ্ট হয়। এরূপ গাছ কোথায় আছে এবং তাহা কিরূপ ও তাহাদের নাম কি? তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। অতএব উপলক্ষণ ধর্ম্ম সংযোজন পূর্ব্বক লক্ষণবাক্য সমাপ্ত করিতে হয়, এরূপ বলা বোধ হয় অসঙ্গত বা অযুক্ত হয় নাই।

উদ্ভিদ কি? তাহা নির্ণীত হইল।

উহাদের বংশ বা জাতিবোধক লক্ষণও সুস্থির হইল।

এক্ষণে উহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবিভাগ বা শ্রেণী অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইতেছে।

ইতি পূর্ব্বে আমরা উদ্ভিদবংশের স্থূল বিভাগ দেখাইয়াছি; এক্ষণে আবার তাহাদের অনুবিভাগ অর্থাৎ অবান্তরবিভাগ দেখান আবশ্যক হইতেছে।

নিম্নলিখিত অবান্তর বিভাগ আয়ত্ত হইলে, উত্তমরূপে জানা

হইলে, উদ্ভিদবংশের পরস্পর বিভিন্নতা বা পৃথক পৃথক জাতীয়-ভাব ও শ্রেণীসমূহের একটা স্থূল পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ওষধি (১)
তৃণ (২)
ত্বক্‌সার (৩)
অন্তঃসার (৪)
সর্ব্বসার (৫)
নিঃসার (৬)

ফলপাক নাশ্য উদ্ভিদ ওষধি।
কুশকাশাদি জাতীয় উদ্ভিদ তৃণ।
বাঁশ প্রভৃতি কঠিন ত্বক্‌ উদ্ভিদ ত্বক্‌সার।
খদির প্রভৃতি বৃক্ষ অন্তঃসার।
চন্দন প্রভৃতি সর্ব্বসার।
কদলী প্রভৃতি নিঃসার।

এতদ্ভিন্ন কন্দ, মূল, শিফা, পুষ্প, পত্র, ফল, বল্কল, শিম্বী, এবং হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদে আরও কয়েক প্রকার শ্রেণী হইতে পারে। অর্থাৎ কন্দজাতীয়, মূলজাতীয়, শিফাজাতীয়, পুষ্পজাতীয়, পত্রজাতীয়, ফল জাতীয়, বল্কলজাতীয়, শিম্বীজাতীয় পৃথক পৃথক উদ্ভিদশ্রেণী আছে এবং তাহাদিগকে আবার হ্রস্বদীর্ঘভেদে বিভিন্নশ্রেণীতে পরিগণিত করা যাইতে পারে। পূর্ব্বতন ঔষধতত্ত্ববিৎপণ্ডিতেরা এইরূপ পরিপাটিক্রমে উদ্ভিদ্বংশের বিভাগাদি সজ্জিত করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বিভাগের প্রয়োজন কি? তাহা পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী এই সকল কথা ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত করিবেন, উতলা হইলে চলিবে না।

ক্রমশঃ।

কালতত্ত্ব।

পূর্ব্বোক্ত আকৃষ্ট জলরাশি দুই ভাগে বিভক্ত।

যথা—১ম স্থূল, ২য় সূক্ষ্ম।

স্থূলজল।—যাহা পরস্পর সংযোগে রাশিভাব অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর নিম্নস্থান সকল অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহাকেই স্থূলজল রাশি বলিয়া আখ্যা প্রদান করা হইল।

ভূমণ্ডলের দক্ষিণ ভাগ অপেক্ষাকৃত নিম্ন সুতরাং ঐ ভাগই অধিকাংশ স্থূলজলের আবাস।

২য়। যাহা সৌরিক কিরণ সংযোগে ভিন্নসংঘাত হইয়া ভুবায়ুব আঘাতে অতি সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হইয়া সমস্ত জগৎ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে ১২ দ্বাদশ ক্রোশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া বিচরণ করিতেছে তাহা সূক্ষ্ম। মেঘ, করকা, তুষার, প্রভৃতি ইহার পরিণাম।

অয়ন এবং ঋতু বিভাজক পদার্থ এবং তাহাদিগের গুণ।

বৈজ্ঞানিক আচার্য্যগণের মত যে ভৌতিক জগত ভৌতিক ক্রিয়ার অধীন; তন্মধ্যে সূর্য্য, চন্দ্র, জল, বায়ু এই চতুর্বিধ পদার্থ পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে ক্রিয়াশীল। ইহাদিগকে পৃথক্ ভাবে জানিতে হইলে এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

তেজঃ কি এবং তাহার গুণ কি? তাহা বিস্তারিত পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। পুনরায় কার্য্যকারণ দেখাইবার নিমিত্ত এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

সূর্য্য সমস্ত তেজের আধার। ক্রিয়া,—ঊর্দ্ধ গমন শক্তি, পাচন, দাহজনন, নির্ম্মলীকরণ, লঘুকরণ, (আণবিক সংযোগ ধ্বংস) ও পরিবর্ত্তকরণ।

চন্দ্র যদ্যপি জলময় পদার্থ নয় বটে তথাপি আস্মদ্দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ চন্দ্রকে কর্কটরাশি (জলরাশি) স্থিত জানিয়

প্রভূত জলের আধার কিম্বা জলবর্ষণের কোন এক প্রকার পুষ্কল কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বৈদিক মতেও কোন কোন স্থলে চন্দ্রের স্তব উপলক্ষে তাহাকে প্রভূত জলসঞ্চারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন *। এই সকল প্রাচীন বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে চন্দ্র কোন প্রকার জলাধিপতি, নিজে জল নহেন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ দক্ষিণায়নে বা বিসর্গকালে রাত্রির মান বৃদ্ধির সহিত চন্দ্রের স্থিতিকাল বৃদ্ধি হইলে ভারতভূমি যখন জলাসক্ত হইতে থাকে এবং ভৌতিক পদার্থ সকল বলবান হয়, তখন অবশ্যই "চন্দ্র" জলদ; এবং সেই হেতু চন্দ্রের নামান্তর সোম এবং ওষধীশ হইয়াছে।

আবাহবায়ু বা ভুবায়ু — সৌরিক তাপাংশই ইহার গতিব্যঞ্জক। সূর্য্য যেসময়ে দক্ষিণক্রান্তিপথে ভ্রমণ করিবে আবহবায়ু ঐ সময়ে উত্তর গোল হইতে প্রবাহিত হইবে। এবং যখন উত্তর গোলে থাকিবে ঐ সময় দক্ষিণ গোল হইতে প্রবাহিত হইবে ইত্যাদি (১)। "গুণ" অনুষ্ণাশীত স্পর্শ, (উষ্ণতা এবং শীতলতা রহিত) অতএব "রূক্ষ" 'লঘু' (অনিচিতসংযোগাপন্ন সূক্ষ্মপরমাণু), অতএব যোগবাহী (উভয়ক্রিয়ানিষ্পাদক)। অর্থাৎ

* "শুভঃ কফী স্নিগ্ধজলাম্বুচারী"। নীলকণ্ঠ জাতক।

"ভার্গবেন্দুজলচারৌ"। বৃহজ্জাতক।

চন্দ্রমা অপ্স্বন্তরা সুপর্ণোধাবতে দিবি। ঋঃ। ১ম, ১৫ অনু ১২ র।

জলময় মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি সূর্য্যরশ্মিযুক্ত চন্দ্রমা স্বর্লোকে ধাবিত হইতেছে।

(১) যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার বাজসনেয়ী সংহিতার ১৫ অধ্যায়ে বলিয়াছেন "আদস্য বাতোঽনুবাতি শুচি রথস্যমতে বৃজনং কৃষ্ণ মস্তি।" অর্থ—আৎ অনন্তরং অস্য অগ্নেঃ শুচি জ্বালাময় লক্ষ্য বাতো বাতি ধাবতি অর্থাৎ প্রকৃষ্ট তেজের অভিমুখে বায়ু সর্ব্বদা গতিশীল, এবং স্থানান্তরে

যে সময়ে সূর্য্যের বল অধিক হইবে, ঐ সময় ভারতীয় আবহবায়ু উষ্ণ স্পর্শ এবং অতিরূক্ষ ও লঘু হইবে। আর যে সময় চন্দ্রবল অধিক হইবে, অর্থাৎ জল সংসিক্ত হইবে ঐ সময় শীতল স্পর্শ এবং স্নিগ্ধ হইবে। এই বলিয়াই জগৎকে আগ্নেয় এবং সোমীয় বলা যায়। এই অসাধারণ শক্তির অনুবলে স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সমুদায়ের বহিঃস্থ এবং অন্তঃস্থ সান্তাপিক এবং শৈতিক ক্রিয়া নিষ্পত্তি হইয়া আসিতেছে। এই কারণে ইহার অপর নাম "জগৎ প্রাণ"।*

ইহার স্থূল তাৎপর্য্য প্রকাশে আচার্য্য সুশ্রুত বলিয়াছেন।

শীতাংশুঃ ক্লেদয়ত্যুর্ব্বীং বিবস্বান্ শোষয়ত্যপি।
তাবুভাবপি সংশ্রিত্য বায়ুঃ পালয়তি প্রজাঃ ॥

অর্থাৎ চন্দ্রমা পৃথিবীকে ক্লেদযুক্ত করিয়া সুস্নিগ্ধ করে. সূর্য্য পুনরায় শোষন করে, এই চন্দ্র এবং সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া বায়ু সৃষ্টি রক্ষা করিতেছে।

আদানিক এবং বৈসর্গিক কার্য্য।†

সাধারণতঃ পুর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ পদার্থের উত্তর এবং দক্ষিণ

টীকাকার যে শ্রুতির প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন, যথা অন্তরীক্ষস্য পৃষ্ঠে হ্যয়ং জ্যোতিষান্ বায়ুরিতি। অর্থাৎ আকাশমণ্ডলে বায়ু অগ্নির অনুগামী থাকিয়া জ্যোতিষ্মানুরূপে বিদ্যমান। বিশেষ অস্মদ্দেশীয় দার্শনিকগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে বায়ুই তেজের উৎপাদক এবং আশ্রয়, অপিচ পৌরাণিকেরা অগ্নিকে বায়ুসখা নামে সর্ব্বত্র অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। এই সকল প্রাচীন ঋষি বাক্যের পর্য্যালোচনা দ্বারায় বায়ু যে তেজের অনুগামী, এই অনুমান অকাট্য বলিতে হইবে।

* আভ্যন্তরীণ ভৌতিক বায়ুর ইন্দ্রিয় ত্বক (স্পর্শ); এই স্পর্শ রুক্ষ, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, বিশদ, কঠিন, চিক্কণ সূক্ষ্ম, পিচ্ছিল, দারুণ, মৃদু ইত্যাদি।

† বিসৃজতি জনয়তি আপ্যমংশং প্রাণিনাঞ্চ বলমিতি বিসর্গঃ।

আদদাতি ক্ষপয়তি পৃথিব্যাঃ সৌম্যাংশং প্রাণিনাঞ্চ বল মিত্যাদানং।

চক্রপাণিঃ।

সংক্রমানুসারে আদান এবং বিসর্গক্রিয়া নিষ্পত্তি হইয়া আসিতেছে। প্রোক্ত উভয়বিধ ক্রিয়াই শিশিরাদি ষড়বিধ ঋতুর এবং অম্ল, লবণ, মধুরাদি ষড়্বিধ রসগুণের ও গুণানুযায়ি শরীর ধারক বায়ু, পিত্ত, কফের সঞ্চয়, প্রকোপ, এবং প্রশমের ও প্রাণিগণের শরীরগত বলের উৎপত্তি এবং নাশ ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্যের নিষ্পাদক।*

কীদৃশ ভ্রমণ দ্বারা উক্ত বহুবিধ কার্য্য সংসাধিত হয় এবং ঐ সকল কার্য্যের ফলোন্মুখ সময়ে ভারতীয় মানব নিকর কীদৃশ অবস্থায় অবস্থান এবং আহারাদি জীবককার্য্যে লিপ্ত থাকিলে স্বাস্থ্য রক্ষা এবং ব্যাধি মূলক যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে তদ্বিস্তারিত কালতত্ত্ব পাঠে অবশ্য জ্ঞাতব্য।

আদানকাল বা উত্তরায়ণ — সূর্য্যদেব দক্ষিণ ক্রান্তি পথে চব্বিশ অংশ, ইং ২৩।২৮ কলা ধনুরাশির শেষ পাদ পর্য্যন্ত গমন করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া মকর রাশির প্রথম পাদে উপস্থিত হইলে উত্তরায়ণের সূত্রপাত হয়। ঐ সময় হইতে সূর্য্যদেব ভূমণ্ডলের উত্তর ক্রান্তিপথে অগ্রসর হইয়া গ্রীষ্মমণ্ডলের কি তৎসদৃশ স্থান সমূহের দিবামান বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হয়, ঐরূপ দিবসের মান বৃদ্ধির সহিত সূর্য্যের কিরণ সম্পাত ও অপেক্ষাকৃত সারল্য অবলম্বন করে। সুতরাং তদনুযায়ী রাত্রির মান ক্রমে ন্যূনতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে এবং তৎসহচর চন্দ্র কিরণ সম্পাতও পূর্ব্বাপেক্ষায় কথঞ্চিৎ তির্য্যগ্-ভাবে পতন হয়। এই সময়ে ভূমণ্ডলের উত্তরগোলে গ্রীষ্ম মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, হেমন্ত ঋতু অপেক্ষা শিশির কালানুযায়ী সূর্য্য-রশ্মির প্রখরতা হেতু ক্রমে অধিকতর তাপাংশ প্রবেশ করে, এবং

---

* তাবেবার্ক-বায়ু-সোমশ্চ কালস্বভাবমার্গপরিগৃহীতাঃ কালর্ত্তুরসদোষ দেহবল নিবৃত্তি প্রত্যয়ভূতাঃ সমু পদিশ্যন্তে। চরক। সূ।৬।

তদ্দ্বারা স্থাবর জঙ্গম প্রাণীগণের বলোপচয়ের নিদানভূত বিসর্গ কালোচিত ক্রিয়াজনিত সম্যক্ পরিপক্ক মধুররসানুযায়িগুণের বলহীন কারক ক্রম প্রাপ্ত তিক্ত রসের গুণের সঞ্চয় হয়, পরন্তু ঐ সঞ্চয় ঋতুর সন্ধিকাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া সন্তাপীয় আতিশয্যের অনুগামী শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, এই ত্রিবিধ ঋতুতে যথাক্রমে তিক্ত, কষায়, এবং কটু, এই ত্রিবিধ গুণের আবির্ভাব হয়। এই ত্রিবিধ রস বায়ু, অগ্নি এবং আকাশ গুণ বাহুল্যে উদ্ভূত হয় বলিয়া শোষক এবং প্রাণীগণের বল নাশক। আচার্য্যগণ এই নিমিত্ত উত্তরায়ণ কালকে আদানকাল বা আগ্নেয় নামে অভিহিত করিয়াছেন।*

* আয়ুর্ব্বেদীয় আচার্য্যগণ জঙ্গমপ্রাণীগণের আহার পরিপাকের নানাবিধ কারণ কল্পনা করিয়া পরিণামে স্থাবর জঙ্গম প্রাণী, এবং অপ্রাণীর অভ্যন্তরিণ বিপাক ক্রিয়া নিষ্পত্তির এবং ঐ বিপাক জনিত বিবিধ রসোৎপত্তির যে কারণ দর্শাইয়াছেন তদ্ বিস্তারিত নিম্নে প্রকাশ করিলাম। ইহা দ্বারা সাধারণ দ্রব্যাশ্রিত রসের এবং শিশিরাদি ঋতুভব রসের বিশেষ জ্ঞান লাভ হইবে সন্দেহ নাই। চরকাচার্য্য গ্রহণী চিকিৎসা উপলক্ষে বলিয়াছেন —"ভৌমাপ্যাগ্নেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মানঃ সনাভসাঃ, পঞ্চাহার গুণান্ স্বান্ স্বান্ পার্থিবাদীন্ পচন্তি হি"; অর্থ এই যে পঞ্চ প্রকার ভূত পদার্থ অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এই সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতের মিশ্রণে আকাশাদি স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে যে আকাশাদি পঞ্চ প্রকার ভূত পদার্থেই এক এক প্রকার বৈকারিক উষ্মা বিদ্যমান থাকিয়া তদ্দ্বারা স্বকীয় বিপাকক্রিয়া নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে জঙ্গম প্রাণীগণ মধুরাম্ল প্রভৃতি ষড়্‌বিধ রস বিশিষ্ট বস্তু আহার করিলে জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাকের যে মিশ্র ভৌতিক রস (সারভূত দ্রব পদার্থ) উৎপত্তি হয়, তাহা ধমনী দ্বারা সর্ব্ব শরীর ব্যাপ্ত হইয়া রস, রক্ত, মাংস প্রভৃতি সপ্ত ধাতুর পোষণ পূর্ব্বক শরীরের উপচয় করিয়া থাকে। কিন্তু এই সপ্ত পদার্থ এক প্রকার রস অথবা এক প্রকার গুণ বিশিষ্ট নয়। ইহারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন রস সম্পন্ন এবং বিভিন্ন গুণশালী। অতএব রসাদি সপ্ত

পদার্থের যে পদার্থে প্রোক্ত পঞ্চভূতের যে কোন ভূতের অণুত্ব বা আধিক্য আছে, সর্ব্ব শরীর সঞ্চারী রস সেই সেই ভৌতিক তেজদ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদিগকেই আংশিক গুণের সহিত পোষণ করে। ইহাকেই আয়ুর্ব্বেদে ভূতাগ্নি বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। স্থাবর বৃক্ষাদি এবং খনিজ স্বর্ণ রৌপ্যাদি পদার্থ সকলও এই নিয়মের অধীন। যখন দেখা যায় কোন বৃক্ষ কি লতা প্রভৃতির প্রত্যেক অবয়বে বিভিন্ন রস এবং বিভিন্ন গুণ বিদ্যমান অর্থাৎ যাহার মূলে তিক্তরস, তাহার ত্বকে কষায় রস, এবং পত্রে কটু ফলে অম্ল ইত্যাদি। যেমন পটোল ফল মধুর রস, পত্র তিক্ত রস, নাড়ী কটু রস, মূল বিবিধ রস, তদ্রূপ গুণেও বিভিন্ন ; পটোলফল ত্রিদোষঘ্ন ; পত্র পিত্তঘ্ন, নাড়ী কফঘ্ন, মুল বিরেচক। স্থাবর প্রাণীগণ মৌলিক আকর্ষণ শক্তির দ্বারা পৃথিবীস্থ পঞ্চভূতের মিশ্রণ রসকে আকর্ষণ করিলে যথাযথ ধমনীর দ্বারা স্ব স্ব স্থানে আকর্ষিত হইয়া, ভৌতিক অগ্নি কর্ত্তৃক পরিপাকে মূল, ত্বক, শাখা পল্লবাদি অবয়ব বিশেষে স্বীয় স্বীয় ভৌতিক দ্রব্য এবং গুণের পোষণ ও রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা নানাবিধ রসের বিভাগ কার্য্য সম্পন্ন করে। বিশ্বনিয়ন্তার এই প্রকার আশ্চর্য্য অলৌকিক কৌশল না থাকিলে, বৃক্ষ লতাদির আমূল হইতে ফল পর্য্যন্ত ষড়বিধ রসের মধ্যে যে কোন প্রকারের রস হউক এক প্রকার রসেরই অনুভব হইত। এইক্ষণ উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা কিম্বিধ যুক্তি অনুসারে পার্থিব এবং স্থাবর জঙ্গমাদি পদার্থ সমূহে ঋতু পরিবর্ত্তন জন্য মধুরাদি গুণের আংশিক আবির্ভাব হইয়া ফলমুখী হয় তাহাই বিচার্য্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জগৎ আগ্নেয় এবং সৌম্য, উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়নও আগ্নেয় এবং সৌম্য ; উত্তরায়ণের শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম এই ত্রিবিধ ঋতু আগ্নেয়, দক্ষিণায়নের বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত এই ত্রিবিধ ঋতু সৌম্য। আগ্নেয় ঋতু শিশিরাদিতে জাগতিক পদার্থ সমুদায় অগ্নিগুণ বিশিষ্ট অবশ্যই হইবে। এবং তৎ সহচর বায়ুও অগ্নিগুণ সম্পর্কে শৈত্য পরিহার পূর্ব্বক রুক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। বলা বাহুল্য যে বাহ্য তেজ এবং বায়ু যে গুণ সম্পন্ন হইবে, আভ্যন্তরীণ ভৌতিক মিশ্রণ তেজ এবং বায়ু ও তদনুরূপ গুণ সম্পন্ন হইয়া গুণানুযায়ী ক্রিয়া নিষ্পত্তি করিবে। এই ঋতুত্রয় রসের আবির্ভাব সম্বন্ধে

এইরূপ মীমাংসা করিতে হইবে যে ইহা প্রকৃত রসনা গ্রাহ্য রস নহে ; কেবল রসানুযায়ী গুণের আবির্ভাব মাত্র বোধ করিতে হইবে। যদি তন্ত্র কর্ত্তার এইরূপ মানসিক ভাব না হইয়া, প্রকৃতই জগতের ভৌতিক পদার্থ ঐ প্রকার রসনা গ্রাহ্যরস বিশিষ্ট হইত ; তবে শিশিরঋতুতে সমস্তই তিক্ত এবং গ্রীষ্মঋতুতে সকলই কটু বোধ হইত। অতএব যখন রাসনিক প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত শর্করা প্রভৃতি ভৌতিক দ্রব্যে প্রোক্ত ঋতু ভেদে কদাপি কেহ বিপরীত ভাবে রসের প্রত্যক্ষ করেন নাই, এবং অধুনাও কেহ করিতে ছিনা, তখন কথিত ঋতু অনুযায়ী রস শব্দ দ্বারা যে বিপাকাধীন গুণের আবির্ভাব প্রতিপন্ন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কি প্রকার উপপত্তি করিলে ঋতুত্রয়ে রসের গুণ সকল বিপাক ক্রিয়া দ্বারা সম্যরূপে মীমাংসিত এবং নিষ্পাদিত হয় ; আচার্য্য এই সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন ; তাহাই লিখিতেছি। যথা—

"রবির্ভাভি রাদদানো জগতঃস্নেহং বায়বস্তীব্র রুক্ষাশ্চোপ শোষয়ন্তঃ।"

ইত্যাদি চরকঃ

অর্থাৎ সূর্য্যদেব রশ্মিদ্বারা জগতের স্নেহ গ্রহণ করিলে শোষিত বায়ু রুক্ষ হয়। এবং তজ্জন্য জগতের ভৌতিক পদার্থ সমূহও রুক্ষ রসানুযায়ী গুণ গ্রহণ করে। ইহাও সর্ব্বজন সম্মত যে, তেজের সংস্পর্শে বস্তু মাত্রেরই অভ্যন্তরে তেজঃ প্রবেশ দ্বারা তাহাকে উষ্ণ স্পর্শ বোধ করায়। এই উষ্ণ স্পর্শের ন্যূনাতিরেকতাই প্রবিষ্ট তেজের পরিমাপক। এক্ষণে অনুমান করিতে হইবে যে, যে পরিমাণে বহিস্থ তেজঃ বস্তুতে প্রবেশ করিয়াছে, ঐ তেজ আভ্যন্তরিণ ভৌতিক তেজের সহিত যোগে স্বাভাবিক বলাপেক্ষায় অধিক বলবান হইয়াছে। তেজ সংযোগ মাত্রই তত্রস্থ স্নিগ্ধতার অপলাপ স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং আগ্নেয় বিপাক ক্রিয়ার আতিশয্য বশতঃ তদভ্যন্তরস্থ ভৌতিক বায়ুর স্নিগ্ধত্ব পরিহার পূর্ব্বক রুক্ষতার আবির্ভাব হইয়া বস্তুকে স্নিগ্ধবিহীন করিয়াছে বলিতে হইবে। এই স্নিগ্ধতার অপহারক রুক্ষতাই আদান কালোচিত রস গুণের ব্যঞ্জক এবং এই রুক্ষতাই প্রাণিগণের বল নাশক ও সূর্য্য বল প্রযুক্ত আগ্নেয়। বিসর্গ কালের রসগুণও এইরূপ নিয়মেই জানিতে হইবে।

বিসর্গ কাল বা দক্ষিণায়ণ — সূর্য্যদেব উত্তরক্রান্তি পথে ২৪ অংশ ইং ২৩।২৮কলা মিথুন রাশির শেষ পাদ পর্য্যন্ত গমন করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দক্ষিণক্রান্তি পথে কর্কট রাশির প্রথমপাদে উপস্থিত হইলে দক্ষিণায়ণের বা বিসর্গ কালের সূত্রপাত হয়।

ঐ সময় হইতে প্রভাকর ভুমণ্ডলের দক্ষিণপথে যত অগ্রসর হইবে ভারতক্ষেত্রে ততই সৌরিক কিরণপাত তীর্য্যগ্‌ভাব অবলম্বন করিবে এবং দিবসের পরিমাণ ক্রমে ন্যূন হইয়া রাত্রির পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ঐ রাত্রির পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত চান্দ্র কিরণ সম্পাত পূর্ব্বাপেক্ষায় সারল্য অবলম্বন করিবে। এবং আবহ নামা ভুবায়ু কর্ত্তৃক বিতাড়িত মেঘমালা দ্বারা উত্তর গোলস্থ গ্রীষ্ম মণ্ডল সর্ব্বদা আচ্ছন্ন থাকায় ভারতক্ষেত্রে সৌরিক তাপাংশ অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতে না পারায় পূর্ব্বোক্ত আবহবায়ু সর্ব্বদা জল সঞ্চারিহেতু আদান কালজ রুক্ষতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শৈত্যভাব অবলম্বন করে। ভারতক্ষেত্রও সর্ব্বদা বর্ষাঋতুর ঔচিত্যবর্ষণহেতু

আচার্য্যগণ আদানিক গুণবিভাগে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে আদানকাল জন্য সৌরিক কিরণ পাতের ক্রমে বলাধিক্য বশতঃ বিপাক ক্রিয়ার ক্রমাধিক্য হয় সেই হেতু শিশিরাদি ঋতুত্রয়ে ভুমণ্ডলের উত্তরগোলে গ্রীষ্ম প্রধান দেশস্থ ভৌতিক পদার্থ সকল ক্রমে তিক্ত, কষায়, কটু, এই ত্রিবিধ রস গুণবিশিষ্ট হইয়া রুক্ষবায়ুর সংস্পর্শে ক্রমে রুক্ষ, রুক্ষতর, এবং রুক্ষতমত্ব প্রাপ্ত হয় সুতরাং নিঃসারতাহেতু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ঋতু চর্য্যায় প্রকাশ করিব।

এই আদানকাল বা উত্তরায়ণের আরম্ভ কাল শিশিরঋতু দেহ বলের হীনতারম্ভ জ্ঞাপক, মধ্যে বসন্ত ঋতু মাধ্যমিক বল ব্যঞ্জক, শেষ গ্রীষ্মঋতু দৌর্ব্বল্য জনক এবং সংপূর্ণ শোষক। আদাবান্তচেত্যাদিচরক দেখ।

খরত্ব, কঠিনত্ব এবং উষ্ণত্ব, একদা পরিত্যাগ করিলে পার্থিব জলীয়াংশের পরিপাক হইতে পারে না, সুতরাং ভৌতিক স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সকল তরুণ রস বিশিষ্ট এবং অল্পবীর্য্যবান্ হইয়া পড়ে। অপিচ পূর্ব্বোক্ত কারণে সৌরিক তাপাংশের আবশ্যকীয় পরিমাণের অভাবে এবং শীতল বায়ুর সংস্পর্শে স্তম্ভিতদেহ স্থাবর জঙ্গম প্রাণী এবং অপ্রাণীর নিষ্ঠাপাক ও আবস্থিক বিপাক ক্রিয়ার অনৌচিত্য হেতু আদানকালোচিত ক্রিয়াজনিত কটুরসের পরিবর্ত্তে পার্থিব বস্তুমাত্রে ক্রমে বিসর্গকালোচিত অপাকজ অম্ল গুণের সঞ্চয় হয়। এই সঞ্চয় বর্ষা ঋতুর সন্ধিকাল হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে সূর্য্য সন্তাপের হীনতা জনক দক্ষিণায়নের অনুগামী বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, এই ঋতুত্রয়ে যথাক্রমে অম্ল লবণ, মধুর এই ত্রিবিধ রস-গুণের আবির্ভাব হয়। এই ত্রিবিধ রস ভূমি, অগ্নি এবং জল গুণাধিক্য অতএব উত্তর উত্তর প্রাণিগণের বলোপধায়ক এবং পার্থিব পদার্থ সমূহের সৌম্যাংশের জনক। *

ঋতু বিভাগ

বিশ্বপতির বিশ্বনির্ম্মাণের আদি অন্ত কল্পনায় বৈজ্ঞানিকগণ যাদৃশ ঘোরতর আন্দোলন করিয়াও নির্দ্দিষ্ট সীমায় উপস্থিত হইতে অপারগ হইয়া পরিণামে বীজাঙ্কুর উৎপত্তি সদৃশ বিশ্ব ব্যাপারের আদ্যন্ত কল্পনা ইন্দ্রিয়াতীত স্থির করিয়াছেন, তদ্রূপ কাল পরিবর্ত্তন জন্য ঋতুগণ পরস্পর কার্য্যকারণসূত্রে গ্রথিত থাকা হেতু আদ্যন্ত

* এই অয়নদ্বয়ের আরম্ভ সংক্রান্তি হইতে লিখিত হইল কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সংক্রান্তিগণনা অয়ন গণণা হইতে না হইয়া কেবল রাশি সংক্রমণ হইতে আরম্ভ হয়। প্রস্তাবিত কালতত্ত্ব সৌরিক গতি লক্ষ্য করিয়া সায়ন মতে লিখিত হইল। অতএব যেমন ১০ চৈত্র এবং ১০ আশ্বিন দিবারাত্রির মান তুল্য তেমন ১০ পৌষ এবং ১০ আষাঢ় হইতে গণনা আরম্ভ করিতে হইবে।

কল্পনার পথ দুর্ব্বোধ্য এবং দুর্গমনীয়। এমতাবস্থায় পাঠক সমীপে কোন্ ঋতু প্রথম উপহার যোগ্য তদ্বিষয় সমালোচনায় অনন্যোপায় হইয়া দক্ষিণায়নের চরমে উত্তরায়নের প্রারম্ভ শিশির ঋতু প্রথম লিখিতে বাধ্য হইলাম। কেননা পৌরাণিকেরা বলিয়া থাকেন দিবসের মান বৃদ্ধির সময়ই প্রথম সৃষ্টির কাল।

অপিচ শিশির ঋতু বুঝাইতে প্রাসঙ্গিক অগ্রিম হিমঋতুর বিষয় অনেকটা লিখিতে হইবে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঋতুগণ পরস্পর একে অপরের অনুগত কারণ, অতএব অগ্রিম ঋতুর আংশিক কিছু পরিচয় না লিখিলে লেখা ঋতু বুঝাইতে অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িবে এইনিমিত্ত প্রথম হেমন্ত ঋতুর বিষয়ই কিছু প্রকাশ করা হইল।

ঋতুজ্ঞান।

মাঘ এবং ফাল্গুন মাস বা মকর এবং কুম্ভ রাশি	মনুষ্য মাত্রে অবগত আছেন যে হিম ঋতুর অবসানেই শিশির ঋতুর প্রবর্ত্তনা হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বিজ্ঞানবেত্তাগণ

শিশির ঋতুর বর্ণনায় বলিয়াছেন—

"শিশিরে শীতমধিকং বাতবৃষ্ট্যাকুলাদিশঃ শেষং হেমবৎ সর্ব্বং।"

অর্থ। শিশির ঋতুতে বায়ু এবং বৃষ্টি দ্বারা দিক্ সকল আচ্ছন্ন থাকে অতএব হেমন্তঋতু অপেক্ষায় শিশির ঋতু অধিক শীতব্যঞ্জক। অন্যান্য লক্ষণ সকলই হেমন্ত ঋতুর তুল্য।

ইহার উপপত্তি এইরূপ। সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ন সমাপনান্তে উত্তরায়নে পদার্পণ করিলেই শিশির ঋতুর প্রবৃত্তি হয়, এই প্রবৃত্তি সূর্য্য সংক্রমনানুযায়ী প্রতিদিবসীয় পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে। অর্থাৎ যে নিয়মে প্রতিদিন সূর্য্যের স্থায়ী কাল বৃদ্ধি হইবে, ঐ নিয়মে ভারতভূমে উত্তর উত্তর ঋতু জনিতগুণ প্রকাশ পাইবে, এবং ভারতক্ষেত্রস্থ স্থাবর জঙ্গম পদার্থ ক্রমে নবোদ্ভূত গুণের বশীভূত হইবে।

এই ঋতু ভোগের কাল পৌষ মাসের ১১ একাদশ দিবসীয় ২৬দণ্ড ২১পল দিবামান হইতে আরম্ভ হইয়া ফাল্গুন মাসের ১০ দশম দিবসীয় ২৮দণ্ড ১৭ পল দিবামান পর্য্যন্ত, এই ষষ্টি দিন ভোগের ক্রম-বৃদ্ধ দৈনিক পলাংশ সকল যোগ করিলে ১। ৫৬ পল মাত্র অধিক হইবে। অর্থাৎ সূর্য্য ২। ৩। ৪ অনুপল ইত্যাদি ক্রমে অগ্রসর হইয়া এই দুই রাশি ভোগে ১। ৫৬ পল সময় পুরণ করিয়া থাকেন ইহাকে সুর্য্যের শীঘ্রগতি বলে।

ঋতুর গুণ।

ঋতুগণ পরস্পর কার্য্যকারণসূত্রে গ্রথিত হেতু হেমন্ত ঋতুর অধিকাংশ ক্রিয়া শিশির ঋতুর সম্পাদক। হেমন্তঋতুর বর্ণনায় আচার্য্য সুশ্রুত বলিয়াছেন, "বায়ুর্বাত্যুত্তরঃ শীতঃ"। হেমন্ত ঋতুতে উত্তরদিক হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে পৃথিবীর উত্তর গোলের অত্যুত্তরাংশে হিমমণ্ডল প্রভৃতি অতি উচ্চ পর্ব্বত মালার শিখরব্যাপ্ত বায়ুরাশি হৈম জল (বরফ) বিন্দুর সহিত প্রগাঢ় রূপে সংযুক্ত হওয়ায় রুক্ষতা এবং খরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীতলতা অবলম্বন করিয়া দক্ষিণ গোলস্থ প্রভাকরের অনুযায়ী হইয়া প্রবল ধারায় দক্ষিণবাহী হয়। এদিগে উত্তরগোলস্থ দেশ সকলে সৌরিক কিরণ পাতের বক্রতা ও স্থায়িত্বের অল্পতা নিবন্ধন স্বদেশীয় বাষ্পাকার বারিরাশি সন্তাপের অভাব বশতঃ শীতল হইয়া প্রোক্ত শীতল বায়ুর গাঢ় সংশ্লেষে তুষাররূপে বর্ষণ হয় অতএব স্থাবর জঙ্গমের সহিত ভারতভূমি ক্রমে শীতামূর্ত্তি ধারণ করে। এই উভয়বিধ কারণের একদা সমাবেশই শৈত্যোদ্ভূতের কারণ। এই উদ্ভূত শৈত্য প্রবেশ হইলেই ক্রমে ভারতে হেমন্ত ঋতুর অধিকার অব্যাহতভাবে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে।

শিশিরঋতুর শীতাধিক উপপত্তি।

আচার্য্য শিশির বর্ণনায় বলিয়াছেন—

"শিশিরে শীতমধিকং বাতবৃষ্ট্যাকুলাদিশঃ। সুশ্রুত।

অনুবাদ। শিশির ঋতুতে হেমন্তঋতু অপেক্ষায় অধিক পরিমাণে শীতের অনুভব হয় এবং দিক্ সকল বায়ু এবং বৃষ্টি দ্বারা আকুলিত হয়। শেষ সকলই হেমন্তঋতু তুল্য।

উপপত্তি এই যে, সূর্য্য যে সময় দক্ষিণায়ণ হইতে অবসর হইয়া উত্তরায়ণে প্রবৃত্ত হন ঐ সময় বায়ুর দক্ষিণ গতি স্থগিত হয় না। কেননা ধারাবাহী জড়পদার্থ যে পর্য্যন্ত প্রবল আঘাত প্রাপ্ত না হয় সেই পর্য্যন্ত ধারা পরিবর্ত্তিত না হইয়া প্রতিঘাত স্থলে কিছুক্ষণ স্থির অথবা মন্দগতি হইয়া পড়ে। *

শিশিরঋতুর বায়বিক ক্রিয়াও তদ্রূপ সূর্য্যের মকরান্তবৃত্তে অবস্থান সময়ে যে দক্ষিণবাহী ধারা উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ ধারা সূর্য্যের উত্তর গতি প্রারম্ভে পরিবর্ত্তিত না হইয়া দক্ষিণগোলে মন্দ গতি আশ্রয় করিবে, কিন্তু উত্তরগোলে প্রবল ধারাই থাকিবে, অতএব হৈমন্তিক ঋতুপ্রভব হিমসংযুক্ত ধারাবাহী শীতল বায়ু-কর্ত্তৃক আনীত শীতল সূক্ষ্ম বারিকণা সকল স্বদেশীয় বাষ্পাকার বারি সংযোগে রাশিভাব অবলম্বন করিবে। এবং আদান কাল জনিত সূর্য্যকিরণের আধিক্য অনুসারে উভয় পদার্থের সূক্ষ্ম অবয়ব সকল যে পরিমাণে উষ্ণ হইবে ঐ পরিমাণে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হইবে অথচ ঐ মেঘ উত্তরগোলস্থ শীতল বায়ুধারা সংযোগে কখন বর্ষণ কখন কুজ্ঝটিকারূপে ব্যাপ্ত হইয়া সৌরিক কিরণ সম্পাতের বাধা জন্মাইলে ভারতক্ষেত্র অতি শীতল হইয়া পড়ে।

---

* যেসকল নদীর বেগ জোয়ার এবং ভাঁটায় পরিবর্ত্তন হয় সেই সমস্ত নদীতে জোয়ার আরম্ভে ধারার পরিবর্ত্ত হয় না।

ঐ ঋতুর আদানিক কার্য্য।

ইতি পুর্ব্বে বলা হইয়াছে যে হেমন্তঋতু অপেক্ষায় শিশির ঋতুতে সুর্য্যের স্থিতিকাল ১। ৫৬ পল মাত্র অধিক। এই অল্পকাল মধ্যে ভারতক্ষেত্রে যে পরিমাণ তাপাংশ প্রবেশ করিতে সক্ষম, সেই পরিমাণে ভারতীয় পদার্থসকল বাহ্যে এবং অভ্যন্তরে উষ্ণতা অনুভব করিবে এবং আবহবায়ুও তদ্রূপ তাপাংশজনিত উষ্ণতা গ্রহণ করিয়া স্নিগ্ধতা পরিহারপুর্ব্বক প্রাণিমাত্রের দৌর্ব্বল্যের নিদান তিক্ত রসের গুণ রূক্ষত্ব এবং লঘুত্বের আংশিক আশ্রয় রূপে পরিণত হইবে। অপিচ যাদৃশ সুর্য্যের স্থিতিকাল ১। ৫৬ পল অধিক হইবে তৎ পরিমাণ সোমবল ক্ষীণ হইয়া পড়িবে সুতরাং জাগতিক সৌম্যাংশের ও তদনুরূপ ক্ষীণ হইতে থাকিবে। এই উভয় কারণের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতবাসী প্রাণীসাধারণ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

ক্রমশঃ।

জঠরানল কাহাকে বলে ?

আমরা বালক কাল হইতে শুনিতেছি যে জঠর জ্বালার যাতনা বড়—অগ্নিমান্দ্য হইলে আহারে অরুচি হয়, সত্যসত্যই কি উদরে বহ্নি আছে যাহা দিবারাত্রি প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া আহারাদিকে একত্র পাক করিতেছে, না ইহা আমাদের শ্রুতির দোষ অথবা শাস্ত্রকারগণের ভ্রম যে তাঁহারা এই কোষ্ঠাগ্নির কথা বারম্বার উল্লেখ করিয়াছেন ? কোষ্ঠাগ্নি বহির্গত হইলে যে জ্বর উৎপন্ন হয় অথবা উহা যে অন্নাদির পাচক ইহাতো ডাক্তারি মতে বলেনা ? ডাক্তারেরা দেহ চ্ছেদ করিয়া বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া শরীরের কোথায় কি আছে তাহা দেখিয়াছেন কিন্তু কুত্রাপিও তো তাঁহাদের অগ্নিদর্শন

ঘটে নাই? তবে কি আমাদের শাস্ত্র মিথ্যা? আমরা ইহা অনুসন্ধান করিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতরণ করিলাম। এবং প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রকারেরা অগ্নির কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন, উহা প্রকৃতপক্ষে অগ্নি না অগ্নিস্বরূপরূপ অপর কোন পদার্থ, তাহার স্থান কোথায়, তাহার কার্য্য কি, এই অগ্নি সম্বন্ধে আমাদের যোগাচার্য্যগণের অনুভবের সহিত আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রকারগণের অনুভবের মিল আছে কি না, এই সব অনুসন্ধান করিয়া পশ্চাৎ নব্য ডাক্তারি মতের সহিত উহার তুলনা করা যাইবেক এবং যথাসাধ্য উহার পরীক্ষা নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়া যাইবেক। আমাদের শাস্ত্র গুলিন অনুভবাত্মক; নব্য চিকিৎসা শাস্ত্রগুলিন পরীক্ষাত্মক। মৃত দেহ বিচ্ছেদ করিয়া অগ্নি বায়ু ও জলাদির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। জীবন্ত দেহে ইহা অধিকাংশ অনুভব করিতে হয়। উভয় শাস্ত্রের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য বিস্তর থাকিলেও তথাপি তাহাদের সমন্বয় কোন্ অংশে হয়, তাহা দেখাইব। অতএব অগ্রে অপরাপর শাস্ত্রের অগ্নিব্যাখ্যা, পশ্চাৎ চিকিৎসা শাস্ত্রের--পশ্চাৎ নব্য ডাক্তারির এবং তৎপশ্চাৎ আমাদের নিজের মন্তব্য বলা যাইবেক।

অগ্নি সম্বন্ধে মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়ে দ্বিজ ব্যাধ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে।

পার্থিবং ধাতুমাসাদ্য শারীরোঽগ্নিঃ কথং ভবেৎ।

অবকাশ বিশেষেণ কথং বর্ত্তয়তেঽনিলঃ ॥

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নরোত্তম! বিজ্ঞানাখ্য তেজো ধাতু পার্থিব দেহ আশ্রয় করিয়া কেন দেহাভিমানী হয় এবং প্রাণাদি বায়ু নাড়ীমার্গ অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে দেহ চেষ্টা সকল বিধান করে?

ব্যাধ উবাচ।

মূর্দ্ধা নমাশ্রিতো বহ্নিঃ শরীরং পরিপালয়ন্।

প্রাণো মূর্দ্ধনি চাগ্নৌচ বর্ত্তমানো বিচেষ্টতে ॥
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্ ।
শ্রেষ্ঠং তদেব ভূতানাং ব্রহ্মযোনিমুপাস্মহে ॥
স জন্তুঃ সর্ব্ব ভূতাত্মা পুরুষঃ স সনাতনঃ ।
মহান্ বুদ্ধিরহঙ্কারো ভূতানাং বিষয়শ্চ সঃ ॥
এবং ত্বিহ স সর্ব্বত্র প্রাণেন পরিপাল্যতে ।
পৃষ্ঠতস্তু সমানেন স্বাং স্বাং গতিমুপাশ্রিতঃ ॥
বস্তিমূলে গুদে চৈব পাবকং সমুপাশ্রিতঃ ।
বহন্মূত্রং পুরীষঞ্চাপ্য হপানঃ পরিবর্ত্ততে ॥
প্রযত্নে কর্ম্মণি বলে স এষ স্ত্রিষু বর্ত্ততে ।
উদানমিতি তং প্রাহুরধ্যাত্মো বিদুষোজনাঃ ॥
সন্ধৌ সন্ধৌ সন্নিবিষ্টঃ সর্ব্বেষপি তথা হনিলঃ ।
শরীরেষু মনুষ্যাণাং ব্যান ইত্যুপদিশ্যতে ॥
ধাতুষগ্নিস্তু বিততঃ স তু বায়ুসমীরিতঃ ।
রসান্ ধাতুংশ্চ দোষাংশ্চ বর্ত্তয়ন্ পরিধাবতি ॥
প্রাণানাং সন্নিপাতাত্তু সন্নিপাতঃ প্রজায়তে ।
উষ্মা চাগ্নিরিতি জ্ঞেয়ো যো হন্নং পচতি দেহিনাম্ ॥
সমানোদানয়োর্ম্মধ্যে প্রাণা হপানৌ সমাহিতৌ ।
সমন্বিতস্ত্বধিষ্ঠানং সম্যক্ পচতি পাবকঃ ।
অস্যাপি পায়ু পর্য্যন্ত স্তথা স্যাদ্ গুদসংজ্ঞিতঃ ।
স্রোতাংসি তস্মাজ্জায়ন্তে সর্ব্বপ্রাণেষু দেহিনাম্ ॥
অগ্নিবেগবহঃ প্রাণো গুদান্তে প্রতিহন্যতে ।
স ঊর্দ্ধমাগম্য পুনঃ সমুৎক্ষিপতি পাবকম্ ॥
পক্বাশয়স্ত্বহধোনাভ্যামূর্দ্ধমামাশয়স্থিতঃ ।
নাভিমধ্যে শরীরস্য প্রাণাঃ সর্ব্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥

... ...

তস্মিন্ যঃ সংস্থিতো হ্যগ্নি র্নিত্যং স্থাল্যামিবাহিতঃ।
আত্মানং তং বিজানীহি নিত্যং যোগি জিতাত্মকম্ ॥

ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্! সহস্রারে অবস্থিত বিজ্ঞানাত্মাশ্রিত বহ্নি শরীরকে পরিপালন করে; এবং প্রাণ, চিদাত্মা ও বহ্নির সহিত মিলিত হইয়া চেষ্টমান হয়। বিজ্ঞানোপহিত বহ্নি, চিদাত্মা, এবং প্রাণসমূহের সংঘাত বা সমষ্টিকে জীববলে, এই জীবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদায় প্রতিষ্ঠিত আছে, ইনিই সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ ও সকলের কারণ; আমরা ইঁহার উপাসনা করিয়া থাকি।
ত্বগাদি মধ্যে ব্যাপ্ত জঠরানল, বায়ু প্রেরিত হইয়া অন্নাদি রস, শোণিতাদি ধাতু ও পিত্তাদি দোষ সমুদায় পরিণত করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। প্রাণাদি বায়ুর একত্র সন্নিপাত হেতু সংঘর্ষণ জন্মে, সেই সংঘর্ষণ জনিত উষ্মাকেই জঠর অগ্নি কহে; উহাতেই দেহী দিগের অন্নাদি ভুক্ত বস্তু সকল পরিপাক হইয়া থাকে। সমান ও উদান মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু সমাহিত আছে, তন্নিমিত্ত প্রাণ, অপান ও সমানাদি সপ্ত বায়ুর সংঘর্ষণ জনিত অনল ধাতুময় দেহকে সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। সেই অগ্নির পায়ু পর্য্যন্ত প্রদেশকে অপান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সেই অপান হইতে দেহীদিগের প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর প্রবাহ সঞ্জাত হইতেছে। অগ্নিবেগে ঊর্দ্ধগামী প্রাণ অপানান্তে প্রতিহত ও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার অগ্নিকে উৎক্ষিপ্ত করে। নাভির অধোভাগ পাকস্থলী ও ঊর্দ্ধভাগ আমাশয়। নাভি মধ্যে প্রাণ সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। শরীরস্থ নাড়ী সকল প্রাণ প্রভৃতি দশবিধ বায়ু দ্বারা প্রেরিত ও হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যকভাবে প্রবৃত্ত হইয়া অন্নরস সকল বহন করিতেছে।
স্থালী সমাহিত অগ্নির ন্যায় যিনি ষোড়শ কলায় নিরন্তর অবস্থিত করেন, তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানিবে।

ক্রমশঃ।

হেতুসূত্র।

"সোঽনন্তপারং ত্রিস্কন্ধমায়ুর্বেদং মহামতিঃ।
যথাবদচিরাৎ সর্ব্বং বুবুধে"। চরক।

পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণের অভিমতে যতগুলি পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সকলই কার্য্য কারণ সমষ্টি। অর্থাৎ মহৎ প্রকৃতি হইতে কীটাণুর হৃৎপিণ্ড-গত শোণিত পুঞ্জের অণু অংশ পর্য্যন্ত যত কিছু পদার্থ জ্ঞানের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকলই পরস্পর কারণ সাপেক্ষ।

কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্ বলেন,—এই যে গ্রহ উপগ্রহ এবং নক্ষত্রমালা শোভিত গগণমণ্ডল এবং অসংখ্য জাতীয় অসংখ্য জীবগণের আধার বায়ুমণ্ডলের সহিত দেদীপ্যমান বসুন্ধরা, ঐন্দ্রজালিকের মায়া বৈচিত্রের ন্যায় বিচিত্রতা দর্শাইয়া অহর্নিশা প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়গণকে যথোচিত তৃপ্ত করিতেছে, এই বিচিত্রতা কেবল কার্য্য কারণ ভাবের বিকাশ মাত্র। অতএব প্রোক্ত-মত-পোষক বৈজ্ঞানিক আচার্য্যগণ এই অসীম জগৎকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটি কারণ, অপরটি কার্য্য, এইরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি এরূপ আছে যাহা এক সময়ে কার্য্য, তাহাই আবার অপর সময়ে কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়, যেমন পিতা, পুত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি।

এই কার্য্য কারণ যেমন সুক্ষ্ম তেমনি মহৎ এবং অসংখ্য রাগে রঞ্জিত। জগদ্ব্যাপক অতএব মহৎ, অনেক স্থলে অতি নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত অতএব সূক্ষ্ম, নানা বিধ বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত অতএব নানারাগে রঞ্জিত। কত সহস্র সহস্র শতাব্দ অতীত হইয়াছে এই অদ্ভূত কার্য্য কারণ ভাবের ইয়ত্তা হইতে পারে নাই এবং পারিবেও না।

আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনীতে "হেতুসূত্র" উপলক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য কারণ ভাব উল্লেখ করিলাম বলিয়া পাঠক বিরক্ত হইবেন না, যেহেতু ক্ষুদ্রায়তন মনুষ্য শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডগত বস্তু সমূহের জাতিগত, ক্রিয়াগত, এবং গুণগত সম্বন্ধ কল্পনা করাই "হেতুসূত্র" প্রবন্ধের প্রধান অভিপ্রায়।

আচার্য্য সুশ্রুত শারীরস্থানের উৎপত্তি প্রকরণে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

"তস্যোপযোগোঽভিহিতং চিকিৎসাং প্রতি সর্ব্বদা।
ভূতেভ্যোহি পরং যস্মান্নাস্তি চিন্তা চিকিৎসিতে"।

অর্থাৎ শারীরিক মানসিক দুঃখজনক ব্যাধির শান্তিকারক উপদেশে ভৌতিক বস্তুর আলোচনা করাই আমাদের কর্ত্তব্য, কারণ ভুতবিকার জন্য জীবগণের ভৌতিকী ক্রিয়ার বিকৃতাবস্থাই ব্যাধি, এবং ঐ ভৌতিকী ক্রিয়াই আবার ব্যাধির শান্তিকারক। বিজ্ঞানময় অনন্ত জগতের কি আশ্চর্য্যজনক কৌশল যে, যেসকল বস্তু মনুষ্যগণের জীবক বা উৎপাদক, তাহাই আবার দুঃখদায়ক বা জীবনঘাতক। পাঠক মনে করিতে পারেন যে, এই বিস্ময়কর মোহজনক ব্যাপারের মীমাংসক কে? এই প্রশ্নের উত্তরে মুক্তকণ্ঠে অম্লানচিত্তে বলিতে পারিব যে "হেতুসূত্র" ইহার প্রকৃত মীমাংসক। বলা বাহুল্য যে, ব্যাধির উৎপাদক জ্ঞানের অধীন হিতাহিত জ্ঞান, এই হিতাহিতজ্ঞানই এক প্রকার চিকিৎসা তত্ত্বের ভিত্তি স্বরূপ। আচার্য্য সুশ্রুত চিকিৎসা কাণ্ডের প্রথম উল্লেখেই বলিয়াছেন।

"সংক্ষেপতঃ ক্রিয়াযোগো নিদানপরিবর্জ্জনং"।

অর্থাৎ চিকিৎসার প্রথম সোপানেই রোগের উৎপাদক কারণ গুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব রোগের উৎপাদক কারণ জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যে হিতাহিত বিচারে সক্ষম হইবে, তদ্বিষয়ে

আর সন্দেহ হইতে পারে না। অপিচ যখন এই "হেতুসূত্র" দ্বারা নিখিল ব্যাধির উৎপাদক কারণ কল্পনার সমস্ত উপায় অবধারিত হইয়াছে, বিশেষ "হেতুসূত্র" "ব্যাধিসূত্র" "ঔষধসূত্র" এই ত্রিবিধ সূত্র, নিরন্তর অব্যভিচরিতভাবে সম্বদ্ধ, তখন সর্ব্বপ্রধান হেতুসূত্রের অন্তস্তল নিহিত তত্ত্বগুলি বিশেষ আয়ত্ত্ব করিতে পারিলে, অপর দ্বিবিধ সূত্রাত্মকজ্ঞান যে অল্পায়াসে অধীন হইয়া পড়িবে তাহার প্রতিবন্ধক কে হইতে পারে? যেহেতু সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র প্রোক্ত ত্রিবিধ সুত্রে গ্রথিত। চরক বলিয়াছেন,—

"ত্রিসূত্রং শাশ্বতং পূণ্যং"

অর্থাৎ এই বিশাল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ত্রিসূত্রাত্মক নিত্য এবং পবিত্রজনক।

প্রোক্ত আয়ুর্ব্বিজ্ঞান যদি এই প্রকার সৌত্রিকাকারে রচিত না হইত, তবে অনন্তশক্তিশালী অনন্ত পদার্থের জাতি, গুণ এবং ক্রিয়া পৃথকরূপে জ্ঞাত হওয়ার বাসনা আকাশ কুসুমের ন্যায় অসম্ভাবিত হইয়া পরিত। সূত্র প্রণয়নের মাহাত্ম্য এবং সূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই পত্রিকার "ঔষধসূত্র" নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত করা হইয়াছে। "ব্যাধি" কি পদার্থ, তাহাও "রোগ ও রোগের বিভাগ" নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। অতএব তদ্বিষয়ে আর পুনরুক্তি বিফল ও নিষ্প্রয়োজন বিধায় এই প্রবন্ধ কেবল হেতুশব্দ কাহার বাচক, এবং ইহার কার্য্যকারিতা ইত্যাদির প্রভেদ দর্শাইয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

সকলেই "হেতু" শব্দে কারণ, বীজ, অথবা নিদান ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য্য বোধে অনেকেই অনভিজ্ঞ। অতএব এই প্রবন্ধে প্রথমত প্রসঙ্গাধীন নিখিল হেতুর জ্ঞাপক হেতুর লক্ষণ প্রকাশ করিতেছি।

হেতুপ্রতিপাদক লক্ষণ আলোচনায় অস্মদ্দেশীয় ন্যায়বাদী

সূচী

আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী।

অবতরণিকা।

আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী যে গুরুতর ভার লইয়া শিক্ষিত-সমাজে অবতীর্ণ হইতেছে, ইহার নামেও তাহা প্রকাশ পায়; কিন্তু অভিধান বা কল্পনার সাহায্যে সঞ্জীবনীশব্দ নানারূপ অর্থ প্রসব করিতে পারে। সুতরাং আমাদের অভিপ্রেত অর্থ বিশদ করা আবশ্যক,—

প্রায় সহস্র বর্ষ হইতে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ যেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন, ইহাকে মুমূর্ষু বা মূর্চ্ছাগ্রস্ত, নিদ্রিত বা "হাতুড়েমী," যিনি যাহা বলেন তাহাই শোভা পায়; কেন না ইহার হৃদয়ের স্পন্দন আছে, অথচ চৈতন্য নাই;—অন্তর্লীন শক্তি অনুভূত হয়, অথচ তাদৃশী ক্রিয়া নাই;—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিদ্যমান আছে, অথচ উহাদের স্ফূর্ত্তি নাই। আবার দেখিবে ইহা কতকগুলি প্রতারণাপরায়ণ ধূর্ত্তে বেষ্টিত এবং কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য অনেক মূর্খের ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়াছে।

এই শোচনীয় অবস্থা দেখিলে প্রকৃত শাস্ত্রানুরাগী ও স্বদেশ-প্রেমী ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় দুঃখে জর্জ্জরিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ···কার বাসনাও উদ্দীপিত হইয়া উঠে। কিন্তু রোগ না বুঝিয়াই বা . রূপে উহার প্রতীকার করা যায়; কারণ, অনির্ণীত রোগের সুন্দর ঔষধ হইতে পারে না। অতএব জিজ্ঞাসা করি, সত্য সত্যই কি আয়ুর্ব্বেদ হাতুড়েমী? না—। যে শাস্ত্র সম্পূর্ণ কার্য্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত—প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণে রচিত—বিজ্ঞানের উচ্চ

আসনে অধিষ্ঠিত ; তাহাকে হাভুড়েমী বলা দুঃসহ তিরস্কার। নিদ্রিতও বলিতে পার না ; কেননা নিদ্রিতের আপনা হইতেই চৈতন্যোদয় হয় ; কাহারও যত্নের অপেক্ষা রাখে না। যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা মুমূর্ষু ও মূর্চ্ছিতেরই সম্পূর্ণ লক্ষণ। উহা ঘোর অজ্ঞান-তমে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। কাজেই চৈতন্য-হীন, ক্রিয়া-হীন এবং জীবন-হীনের ন্যায় প্রতীয়মান। যতদিন এই নিদারুণ মূর্চ্ছার অপনোদন হইয়া চৈতন্য সম্পাদন না হইতেছে, ততদিন উহা এই রূপই থাকিবে। সুতরাং সর্ব্বতোমুখী ফল-প্রাপ্তিরও সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে ইহাকে সজীব ও প্রকৃত কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে, দেশীয় সাধারণের আন্তরিক অনুরাগ ও যত্নরূপ পথ্য এবং রীতিমত ঔষধ আবশ্যক। বৈদ্যগণ মুমূর্ষু ব্যক্তির অচেতন অবস্থায় সঞ্জীবনী-নামক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহারও সঞ্জীবনীরই প্রয়োজন। তবে কি না বিজ্ঞানের জ্ঞানময় দেহে ভৌতিক উপাদানে নির্ম্মিত সাধারণ সঞ্জীবনীর উপযোগিতা নাই, সুতরাং ইহার সঞ্জীবনী স্বতন্ত্র এবং উহার উপাদানও স্বতন্ত্র। সেই সকল উপাদান কি? অধ্যয়ন, বোধ, আচরণ ও প্রচার (অধীতি-বোধাচরণ-প্রচারণৈঃ)।

প্রথম অধ্যয়ন। গুরুর নিকটে শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হওয়াকে অধ্যয়ন কহে। শাস্ত্র মাত্রই গুরুমুখী হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ 'সঙ্কেত-বিদ্যা গুরুবক্ত্র-গম্যা' যে সকল শাস্ত্র সাঙ্কেতিক তাহাদের মর্ম্ম গুরুর মুখ হইতে অবশ্য জ্ঞাত হওয়া উচিত। অন্যথা বিসদৃশ ফল উৎপাদন করে। আজ কাল যে সে ব্যক্তি কোনরূপ গুরূপদেশের অপেক্ষা না করিয়াই, যে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহাতে আয়ুর্ব্বেদ যে আরও অধঃপাতে যাইতেছে ইহা আমাদের নিশ্চিত ধারণা।

দ্বিতীয় বোধ। বোধশব্দে শাস্ত্র-মর্ম্ম অবগত হইয়া চিন্তা এবং প্রত্যক্ষাদি দ্বারা বুদ্ধিস্থ করা। বিচার পূর্ব্বক সার অসার সঙ্কলন এবং দেশকালভেদে প্রয়োগ করা বোধের একটী কার্য্য। নব নব বিষয়ের উদ্ভাবন, নূতন পদার্থ সংগ্রহ প্রভৃতি বোধের আর একটী কার্য্য। ফলতঃ যতদিন শাস্ত্র বুদ্ধিস্থ না হয়, ততদিন কেবল ভার-বহনই সার। উহা জড়পদার্থের ন্যায় কেবল স্থানমাত্র অবরোধ করিয়া থাকে। মহর্ষি সুশ্রুত এই বিষয়ে একটী সুন্দর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

"অধিগতমপ্যধ্যয়নমপ্রতিভাষিতমর্থতঃ।
খরস্য চন্দন-ভার ইব কেবলং পরিশ্রম-করং ভবতি॥"

অর্থাৎ "অধ্যয়ন করিলেও যদি তাহা হৃদয়ে যথার্থরূপে উদ্ভাসিত না হয়, তবে সে অধ্যয়ন গর্দ্দভের চন্দন-ভারের ন্যায় কেবল পরিশ্রমকর।"

তৃতীয় আচরণ। শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া তদনুসারে কার্য্য বা ব্যবহার করার নাম আচরণ। গুরুর নিকটে যথারীতি শাস্ত্র অধ্যয়ন হইয়াছে, তাহার মর্ম্মও সুন্দর রূপে অবগত হওয়া গিয়াছে কিন্তু কার্য্যের বেলা তদ্রূপ আচরণ না করিতে পারিলে সেই শাস্ত্র নিষ্প্রয়োজন। আচরণ দ্বারা শাস্ত্রের সত্য-নির্ণয়, জ্ঞান-বিস্তার, কার্য্য-কুশলতা, উপার্জ্জিত বিদ্যার পরিপাক ও স্ফূর্ত্তি ইত্যাদি জন্মে।

চতুর্থ প্রচার। শাস্ত্রীয়মর্ম্মসকল সাধারণসমীপে প্রকাশ করাকে প্রচার বলে। যে শাস্ত্র কেবল কতিপয় ব্যক্তি-গত সে শাস্ত্র নিতান্ত সঙ্কুচিত। তাহার প্রসার কখনই হইতে পারে না। প্রসারিত না হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চেষ্টা, পরীক্ষা, চিন্তা এবং জ্ঞানে পূর্ণ হওয়া অসম্ভাবিত, অপিচ তর্ক বিতর্কের ঘর্ষণে নির্ম্মল-ভাব ধারণ করাও সুদূর পরাহত। শাস্ত্রে আছে—

"স খলু ঋণী গুরুজনস্য"

অর্থাৎ যিনি অধীত শাস্ত্র শিষ্যসমীপে প্রচার না করেন, তিনি গুরুলোকের নিকটে ঋণী। আমরা বলি, কেবল শিষ্যের নিকটে কেন? যিনি জগজ্জনের নিকটে প্রচার না করেন তিনিও ঋণী। শাস্ত্র যদি জগতের আপামর সাধারণের নিকট প্রকাশিত না হইল, তবে সেই শাস্ত্রের সৃষ্টিই বৃথা। সুখের বিষয় এই যে, এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা এদেশে নানা শাস্ত্রের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে।

উক্ত চারিটী অপূর্ব্ব * অঙ্গ প্রস্তাবিত সঞ্জীবনীর উপাদান। সুতরাং এ কথা বলা বাহুল্য যে, যাহাতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যয়ন, বোধ, আচরণ ও প্রচার-বৃদ্ধি হয়, এবং এই সমস্ত বিষয়ে অনুদিন সাধারণের অনুরাগ জন্মে, সঞ্জীবনী স্বতঃ পরতঃ সেই চেষ্টায় দীক্ষিত হইল।

এস্থলে প্রসঙ্গাগত আর কয়েকটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক ;— প্রথম। যাঁহারা কোন শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে যত্নশীল হয়েন, তাঁহাদের দৃষ্টি কেবল স্বজাতীয় শাস্ত্রে এবং স্বজাতীয় জ্ঞানে সীমাবদ্ধ থাকিলে প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রের সংস্কারসাধন এবং সৌষ্ঠব-বর্দ্ধন হইতে পারে না। ভিন্নজাতীয় শাস্ত্র ও ভিন্নজাতীয় জ্ঞান হইতেও সার অসার বিবেচনা পূর্ব্বক সত্য সঙ্কলন অতীব প্রয়োজনীয়। সত্য গ্রহণ কালে জাতি, দেশ, বয়স ইত্যাদি বিচার অজ্ঞতা বা দাম্ভিকতার লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের এই কথা সাধারণের সহিত এক মত হইবে কি না বলিতে পারি না, এক মত না হউক, উপহাসের কারণ না হইলেই পরিত্রাণ পাই। কেন না অতি দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের বৈদ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন ; "আমরা

* অপূর্ব্ব কেন? যে হেতু ইহাদের কোন চাক্ষুস আকার বা গন্ধাস্বাদাদি নাই এবং কার্য্যকারণভাব ও বিচিত্র।

ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায় ইত্যাদি সমুদয় দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছি। চরক সুশ্রুত প্রভৃতি আর্য্যগ্রন্থ আমাদের কণ্ঠগত, অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ জাতি বা তাহাদের শাস্ত্রে আমাদের শিক্ষণীয় কি আছে? ঋষি-দের অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষা দেয় এমন ব্যক্তিই বা কে? থাকিলেও তাহার মত জ্ঞানী ও পণ্ডিত। কিন্তু যদি ইঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই জানিতে পারেন, যে ঋষিরা যাহা আলোচনা করিয়াছিলেন কিম্বা [illegible], এমন অনেক বিষয়, অনেক সত্য, অশিক্ষিত বা অপর জাতি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে *। প্রকৃত ঋষিত্ব জাতি-নিষ্ঠ নহে উহা কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞান নিষ্ঠ এবং জ্ঞানপ্রবাহ, কালস্রোতের ন্যায় অনাদি ও অনন্ত।

উক্ত রোগ যে কেবল বৈদ্যদের মধ্যেই আছে এমন নহে। পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে শিক্ষিত অনেক মহাত্মারও ঐরূপ ভ্রান্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা এ কথাটা অনেকে বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছেন, যে, "ইয়ুরোপীয় আয়ুর্ব্বেদ দিনে দিনে যেরূপ সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত হইতেছে। তুলনা করিয়া দেখিলে, হিন্দু-চিকিৎসা তাহার নিকট গোষ্পদ তুল্য, সুতরাং উহার নিকটে আমা-দের শিক্ষিতব্য কিছুই নাই। বৃহজ্জলাশয় থাকিতে কূপজলের প্রত্যাশাই বা কেন?" কাহার কাহারও বা তমোগুণের মাত্রা এত বেশী যে, ইয়ুরোপীয় চিকিৎসায় হতাশ হইয়া, বৈদ্য চিকিৎসায় যে কত শত রোগী আরোগ্য লাভ করিতেছে, প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেও কাকতালীয়-সংযোগ বলিয়া মীমাংসা করেন। বস্তুতঃ ইঁহারাও যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, "আমাদের প্রাচীনদের তাল-পত্র লিখিত পুস্তকের জীর্ণ কলেবরে এমন অনেক বিষয় অঙ্কিত রহিয়াছে, যাহা অদ্যাপি কাহারও অন্তরে অঙ্কুরিত হয় নাই—এমন সহস্র কথা আছে, যাহার গূঢ় মর্ম্মভেদ হইতে এখনও অনেক বিলম্ব

* ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে এই বিষয়ের বহুল উদাহরণ দেওয়া যাইবে।

আছে", তাহা হইলে জানিতে পারেন, যে অনেক শিক্ষণীয় আছে কি না এবং কাকতালীয় সংযোগ সর্ব্বত্র কার্য্যকারী হয় কি না।

আচ্ছা মানিলাম, তুমি যাবজ্জীবন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া বিজাতীয় বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছ, বিজাতীয় জ্ঞানে তোমার নেত্র উন্মীলিত হইয়াছে, বিজাতীয় শাস্ত্র হইতে তুমি উৎকৃষ্ট রত্ন সংগ্রহ করিয়াছ, সুতরাং তুমি যেন সর্ব্বজ্ঞানের আধার; কিন্তু যতদিন তোমার পারদর্শিতা, তোমার জ্ঞানোন্মেষ, তোমার সংগ্রহ জাতীয় ভাবে গঠিত না হইবে, জাতীয়বিদ্যায় লব্ধাধিকার না হইবে, স্বদেশজ ঔষধ দ্রব্যে নিয়োজিত না হইবে, ততদিন ঐ সমস্ত দ্বারা দেশের কোন স্থায়ী কল্যাণ নাই। এ লীলার অবসানে তোমার যে অন্ধকার, সেই অন্ধকারই উপস্থিত হইবে। মুসলমানদের রাজত্ব কালেও এক দিন এদেশে হাকিমী চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; অনেক দেশীয় লোক উক্ত চিকিৎসায় কৃতবিদ্যও হইয়াছিলেন,এক্ষণে উহা কোথায় গেল? তবু যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাও তাহা প্রায় সমস্ত এদেশের বলিয়াই। ফলতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশের এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির জ্ঞান সংগ্রহ করা শিক্ষার্থীর যেমন একটী কর্ত্তব্য, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিজশাস্ত্রে উহার স্থান দান করাও স্থায়িত্ব-কামীর পক্ষে তেমন আর একটী কর্ত্তব্য। অতএব সঞ্জীবনী একার্য্যেও জাগরূক থাকিবে এবং ভিন্ন জাতি হইতে সঞ্চিত জ্ঞান রাশিকে পূর্ব্ব পুরুষীয় জ্ঞানকোষের পরিশিষ্ট প্রকরণ বলিয়া গণ্য করিবে।

দ্বিতীয়। ভাষার পুষ্টি এবং শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে অনুবাদও একটী মহৌষধ। ইহা নীরক্তদেহে রক্তসংক্রামণের ন্যায় আশু উপকারী অথচ অন্য উপায় অপেক্ষা অল্পক্লেশ-কর। কেন না অপরের উপার্জ্জিত জ্ঞান ভাষান্তরিত করিলেই হইল। যে ইয়ু-রোপায় চিকিৎসাশাস্ত্র দিনে দিনে উন্নত ও শাখা প্রশাখায় বিভক্ত

হইয়া আজ দিগন্তব্যাপী হইয়াছে, বলিতে গেলে তাহারও মূল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের সামান্য অনুবাদের অনুবাদ মাত্র। ভাবিলে বোধ হইবে, যেন একটি ক্ষুদ্রতম বীজ কণা বিশাল বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়াছে। অথবা একটী সামান্য প্রস্রবণ-ধারা সাগরাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংলণ্ড তুমি ধন্য! এবং যথার্থ চতুর!! তোমার জ্ঞান-পিপাসা বিনয়-পিপাসা অপেক্ষা কিছুতেই ন্যূন নহে!!! তুমি বণিগ্‌বেশে ভারতরাজ্যের বহিঃসিংহাসন যেমন অধিকার করিয়াছ, অনুবাদকবেশে ইহার জ্ঞান-রাজ্যের অন্তঃসিংহাসনও তেমনই আয়ত্ত করিতেছ। আজও তোমার ভাষা শতমুখী হইয়া বিবিধ ভাষা হইতে জ্ঞান-রত্ন সংগ্রহ করিতেছে। অনুবাদ সামান্য কার্য্য বলিয়া তুমি তুচ্ছ জ্ঞান কর না, যদিও তোমার দৃষ্টান্তে আমাদের দেশের অনেকে শাস্ত্রীয় অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন, দশ পনরখানি ইয়ুরোপীয়চিকিৎসা গ্রন্থের এবং পাঁচ সাত খানি বৈদ্য-চিকিৎসা গ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ইয়ুরোপীয় গ্রন্থের দুই চারি খানির অনুবাদ উৎকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু বৈদ্যক গ্রন্থের অনুবাদের নাম করিতেও আমাদের লজ্জা উপস্থিত হয়। বলিতে কি যাঁহারা সংস্কৃত ভাষার অনুস্বার বিসর্গ মাত্র স্পর্শ করিয়াছেন, গুরু সন্নিধানে চিকিৎসাবিষয়ক উপদেশ কখন পান নাই, তাঁহারাই ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদক। আয়ুর্ব্বেদ যে অতি জটিল, এমন কি একটি "তু" "ন" প্রভৃতি তুচ্ছ অক্ষরের মীমাংসা করিতে এবং একটী সামান্য শব্দের অর্থ সংলগ্ন করিতে যে যথেষ্ট পরিশ্রম, সময় এবং ব্যয় আবশ্যক, বিশেষত অনুবাদের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিলেই যে বিষম অনর্থ উপস্থিত হইতে পারে, ইহা তাহাদের মূলে ধারণাই নাই। সুতরাং ঐ সকল অনুবাদ যে কিরূপ বিকৃত ও বিকলাঙ্গ হইতেছে, এবং কি ভয়ঙ্কর বিষ উদ্গীরণ করিতেছে, যাঁহারা অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই

জানেন *। ফলতঃ যতদিন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে প্রকৃত ব্যুৎপন্ন ও কৃতকর্ম্মা ব্যক্তিগণ অনুবাদকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিতেছেন, ততদিন উহার নিস্তার নাই। অতএব যাহাতে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট অনুবাদ প্রকাশিত হয়, সঞ্জীবনী সেই বিষয়ে যত্নবতী হইবে। এবং অনুবাদ ইহার একটী অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে।

তৃতীয়। আর একটী কথা এই যে ভাষার পুষ্টি ও শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনার্থে বহুল গ্রন্থের প্রচার যেমন আবশ্যক, কতকগুলি অকর্ম্মণ্য ও অসার পুস্তক দ্বারা যাহাতে সরস্বতী-ভাণ্ডার কলঙ্কিত না হয়, এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও বিজ্ঞমণ্ডলীর তেমন আবশ্যক। কোন প্রাচীন পণ্ডিত বলেন ;—

'তদমল্পমপি নোপেক্ষ্যং শাস্ত্রে (কাব্যে) দুষ্টং কথঞ্চন।
কিং বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্ ॥'

অর্থাৎ শাস্ত্রের অল্প পরিমাণ দোষও উপেক্ষার যোগ্য নহে, যেহেতু অতি সুন্দর দেহও একটী মাত্র শ্বিত্রে অপবিত্র ও অপ্রীতিকর হয়।

এই সাধু অভিপ্রায়ে অনেক কাল হইতেই সমালোচনপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। সমালোচন গ্রন্থের পরীক্ষাগ্নি-স্বরূপ, গুণদোষের দর্পণস্বরূপ, শাস্ত্ররত্নের শাণযন্ত্রস্বরূপ এবং জ্ঞানের রসায়ন স্বরূপ, ইহা দ্বারা পণ্ডিতগণ উৎসাহিত হইয়া নূতন চিন্তায় নিমগ্ন, নূতন আবিষ্কারে উদ্দীপিত, এবং নূতন সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন। মূর্খদেরও অজ্ঞানতিমির তিরোহিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনপক্ষে সমালোচনও একটী উৎকৃষ্ট উপায়। অতএব ইহাও সঞ্জীবনীর একটী অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইবে। যদিও আজ কাল

* ভ্রান্ত অনুবাদে অহরহঃ যে অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে; তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অন্য প্রবন্ধে দেখাইব।

বঙ্গভাষার উন্নতিসহকারে সমালোচকপত্রের অভাব নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের সমালোচ্য বিষয় এত রাশীকৃত হয়, যে প্রায় সময়ে সঙ্কুলন হয় না। কেহ কেহ বা নীরস বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ-সমালোচনে উপেক্ষা করিয়াও থাকেন। তাহা না হইলেও চিকিৎসা বা চিকিৎসাশাস্ত্রের সমালোচনের জন্য যে একটী ভিন্ন সম্প্রদায় আবশ্যক, ইহা অনেকে স্বীকার করে না। কারণ যিনি যে কার্য্যে ব্রতী, সেই কার্য্যে তাঁহার যেমন আবকার জন্মে অন্যের এরূপ হওয়া অসম্ভব।

সঞ্জীবনীর ব্যাখ্যা ও প্রসঙ্গক্রমে আমাদের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য বলা হইল। অতঃপর সুধীজনসমীপে বিনীতনিবেদন এই যে, বহুদর্শন, বহু অনুসন্ধান ও বহু পরীক্ষা যে শাস্ত্রের অবলম্বন—দুর্জ্ঞেয় মানবপ্রকৃতি ও পরিবর্ত্তনশীল অলক্ষ্য রোগসমূহ যাহার অধিকৃত বিষয়—অপরিচিত লতা, গুল্ম, খনিজ পদার্থ, তাপ ও শৈত্যের তারতম্য, কালের পরিবর্ত্তন, সংক্ষেপতঃ সমস্ত জগৎই যাহার আলোচ্য, সেই শাস্ত্রের সঞ্জীবন বা উন্নতি বিধান যে, কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা সংসাধিত হইবে, ইহা কখনই আশা করা যাইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদের বিশ্বব্যাপক ভাব আমরা সমুদয় বুঝিয়াছি আমাদের এমন সংস্কার নাই। আমরা আয়ুর্ব্বেদের সঞ্জীবনার্থ তাহার আলোচনা ও যত্ন করিব, যতদূর বুঝিয়াছি তাহা সাধারণকে বুঝাইব এবং যাহা না বুঝিয়াছি তাহা সাধারণের নিকটে বুঝিয়া লইব এই জন্য কি চিকিৎসক, কি প্রকৃতিবিজ্ঞানবিৎ, কি রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ, কি পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী, কি দার্শনিক, কি শাব্দিক, পণ্ডিত মাত্রেরই নিকট আমরা উপদেশ, শিক্ষা ও সহানুভূতি প্রার্থনা করি। যদি সকলের সমবেতযত্নে আয়ুর্বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্রও উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা হইলেও সঞ্জীবনী আপনার জন্ম সার্থক বিবেচনা করিবে।

———

আয়ুর্ব্বেদ কতকালের ?

"আয়ুর্ব্বেদ কত কালের ?" এ প্রশ্ন তুলিবার প্রয়োজন নাই, এ কথা বলিতে পারেন না। একটী বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে কি না, তাহা পাঠকই বিবেচনা করুন। আয়ুর্ব্বেদ যদি এদেশের সর্ব্বাদিম হয়, নিজস্ব হয়, আয়ুর্ব্বেদ যদি এদেশের মূলে, মধ্যে ও অধুনা অবিচ্ছেদে বিরাজিত থাকা প্রমাণীকৃত হয়, আয়ুর্ব্বেদ যদি আদি-শরীরী ব্রহ্মার মুখপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া, ভারতীয়লোক-পরম্পরায়, ভারতীয়-লিপিপরম্পরায়, অবিচ্ছেদে ও অবিসম্বাদিরূপে চলিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা বুঝিব; আমাদের আয়ুর্ব্বেদ আমাদেরই ধন, আমাদের আয়ুর্ব্বেদ আমাদেরই হিতকারী। আয়ুর্ব্বেদ পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এইরূপ অবধারণ করিতে পারি যে, আমাদের এই আদিম আয়ুর্ব্বেদে যদি অন্যান্য দেশের ঔষধ প্রবেশ করিয়া না থাকে, ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ, যদি ভারতেই আবির্ভূত হইয়া ভারতবাসীতেই পরীক্ষিত হইয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে, আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারিব যে, ভারতের আয়ুর্ব্বেদই ভারতের একান্ত উপযুক্ত। ভারতীয় ঔষধ সকল ভারত-বাসীর পক্ষে নিতান্তই হিতকারী। দেশবিশেষে শরীরের ও শারীর-প্রকৃতির বিভিন্নতা হয়,—দেশবিশেষে রোগ ও রোগনিদানের পার্থক্য ঘটনা হয়,—দেশ ভেদে রোগপ্রতীকারের প্রণালীও আপনা হইতে বিভিন্ন হয়,—দেশভেদে ঔষধ ও ঔষধক্রিয়ার ভিন্নতা সংঘটন হয়। কেন হয়, তাহা অন্য প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইবে। ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ ভারতেরই সম্পত্তি, দেশান্তরের সম্পত্তি নহে, ইহাও তৎপ্রবন্ধে প্রদর্শিত হইবে। এক্ষণে প্রসঙ্গাগত কথা পরিত্যাগ করিয়া, প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসন্ধান করা যাউক।

পুরাতত্ত্ব নির্ণয় করিবার বা অতীততত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার দুইটী মাত্র পথ বা উপায় আছে। এক যুক্তি, অপর ঐতিহ্য (ইতিহাস) যাহা অতীত হয়, তাহাতে প্রত্যক্ষের অধিকার থাকে না ; সুতরাং অতীততত্ত্বের সাক্ষ্যদাতা যুক্তি ও ইতিহাস, বর্ত্তমান বা প্রত্যক্ষ তাহার সাক্ষ্যদাতা নহে। কেবল যুক্তি বা কেবল ইতিহাস বিশ্বাস জন্মাইতে পারে না। অতএব, যুক্তিযুক্ত ইতিহাসকে কিম্বা ইতিহাসযুক্ত যুক্তিকে অতীত-তত্ত্বের প্রকৃত বোধক বলিয়া স্বীকার করি। কেন না, ঐ দুইটীর সমাবেশ হইলে দুইটীরই মিথ্যা অংশ নিষ্কাশিত হইয়া যায়, কাজেকাযেই সত্যাংশ পাওয়া যায়। মনে করুন, কোন একটী যুক্তি উদ্ভাবন করিলাম, বা অনুমান উন্নয়ন করিলাম ; করিলে, তাহা যদি ঐতিহ্যের বা ইতিহাসের সহিত মিলিয়া গেল, অবিসম্বাদী বা অবিরুদ্ধ হইল, তাহা হইলেই জানা গেল, বা স্থির হইল যে, আমার সেই যুক্তি সত্যকেই গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ ইতিহাস পাইলে তাহার অর্থ যদি যুক্তি-বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে জানা গেল যে, আমার সেই ইতি-হাস সত্যকেই প্রচার করিতেছে। অতীত-তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতেরা এতদ্রূপ উপায়েই অতীততত্ত্ব নির্ণয় করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ ইতিহাস ও যুক্তি এই দুইয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই পূর্ব্বতত্ত্ব নির্ণীত হয়।

যুক্তি ও অনুমান একই কথা। ঐতিহ্য ও ইতিহাস এই দুই শব্দও পর্য্যায়শব্দ। যুক্তি প্রত্যক্ষমূলক এবং ঐতিহ্য দৃষ্টান্তসাপেক্ষ। এজন্য যুক্তি-উদ্ভাবন-সময়ে তাহার মূলস্বরূপ বা ভিত্তিস্বরূপ কোন এক প্রত্যক্ষ জ্ঞান অথবা প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু বর্ত্তমান থাকা চাই। তাহা না থাকিলে, কোন ক্রমেই যুক্তিজ্ঞান অঙ্কুরিত হইতে পারে না। ঐতিহ্যও যদি দৃষ্টান্তবহির্ভূত হয়, তাহা হইলেও সে ঐতিহ্য কার্য্যকারী হয় না। ইতিহাস পাইলাম, কিন্তু তাহা বুঝিবার

যোগ্য কোন দৃষ্টান্ত পাইলাম না। এরূপ হইলে সে ইতিহাসে কি ফল দর্শিবে? আমাদের বিবেচনায় তাহা থাকা না থাকা তুল্য।

"ইতিহাস" শব্দের অর্থ কি? কিরূপ অর্থের উপর বা কিরূপ বস্তুর উপর ইতিহাস শব্দের সঙ্কেত? তাহা বিবেচনা করুন।

"ইতিহ ইতি পারম্পর্য্যোপদেশেঽব্যয়ম্।
তৎ আস্তে অস্মিন্ ইতি ইতিহাসঃ।" মহেশ্বর।

এক জন অন্য জনকে একটি বিষয় উপদেশ করিল, সেও আবার নিম্নতন ব্যক্তিকে তাহা উপদেশ করিল, সেও আবার আপনার অধস্তন পুরুষকে বলিল, যাহা এতদ্রূপ পারম্পর্য্যক্রমে অবিচ্ছেদে উপদিষ্ট,—তাহারই নাম "ইতিহ"। সেই ইতিহ যাহাতে বর্ণিত আছে, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস। ঐরূপ বলাবলি করিতে করিতে যে টুকু বাড়িয়া যায়, সেটুকু ইতিহাস নহে, সত্য নহে। যুক্তি প্রয়োগ করিলে সেই টুকুই মিথ্যা হইয়া পড়ে, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। "ঐতিহ্য" শব্দের অর্থও ঐরূপ জানিবেন।

"ইতিহ উচুঃ বৃদ্ধাঃ। ইতি ঐতিহ্যম্।
পারম্পর্য্যক্রমাগতং বাক্যমিতি যাবৎ।"

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, কিরূপ ইতিহাস আমাদিগকে সত্য বুঝাইতে পারে। অবশ্যই বলিতে হইবে যে, যুক্তিযুক্ত ইতিহাস ভিন্ন, সে সে ইতিহাস সত্য দেখাইতে পারে না। তজ্জন্যই বলিতে হইয়াছে যুক্তিযুক্ত ইতিহাস ও ইতিহাস-সঙ্গত যুক্তিই পুরাতত্ত্ব নির্ণয়ের প্রধান উপায়। তজ্জন্যই আমরা বলিতেছি বিশ্বাসযোগ্য জনপ্রবাদ, গুরুপরম্পরাগত বা বৃদ্ধপরম্পরাগত সত্যবাক্য, বা তাহার বোধক লিপি, ঘটনাবিশেষের বা বস্তুবিশেষের লুপ্তবিশেষ, অনুসন্ধেয় পদার্থের প্রাকৃতিক বা আবস্থিক তারতম্য,—এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, সেই সকল অচ্ছেদ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া, অথবা দৃষ্ট, শ্রুত ও সিদ্ধ পদার্থ লইয়া অতীত-তত্ত্বের অনুমান বা অনু-

সন্ধান করিতে হয়। আয়ুর্ব্বেদ কতকালের ? এ প্রশ্নেরও উক্ত উপায়ের আশ্রয় লইয়া প্রত্যুত্তর দিতে হইবে।

যে যুক্তির কোন মূল নাই, ভিত্তি নাই, অবলম্বন নাই, যে যুক্তি পূর্ব্বাপর-বিরুদ্ধ, একদিকে অসংলগ্ন ও অন্যদিকে সংলগ্ন এরূপ যুক্তি পরিত্যাজ্য। যে ইতিহাসের অর্থ যুক্তিবিরুদ্ধ ও দৃষ্টান্তবহির্ভূত, কুযুক্তির ন্যায় তাদৃশ কু-ইতিহাসও অগ্রাহ্য। কেন না, সে ইতিহাস অতীত-তত্ত্বের সাক্ষ্য দিতে অক্ষম। অতীততত্ত্ব নির্ণয় করা যখন এতদূর কঠিন,—এত দুরূহ, তখন আমরা প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না যে, "আয়ুর্ব্বেদ কত কালের ?" এই প্রশ্নের ঠিক্ সদুত্তর বা অভ্রান্ত প্রত্যুত্তর দিতে পারিব। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যে রীতিতে অতীত-তত্ত্বের নির্ণয় হওয়া সুসম্ভব, সেই রীতিরই অনুসরণ করিব, স্বেচ্ছাচারিতা ও নির্মূলকল্পনা পরিত্যাগ করিয়া, অতি সাবধানতার সহিত আয়ুর্ব্বেদের কালসংখ্যা অনুমান করিব। তাহাতে যতটুকু সত্য লাভের সুসম্ভাবনা, পাঠকগণ ততটুকুই পাইবেন, অধিক আকাঙ্ক্ষা করিলে চলিবে না।

"আয়ুর্ব্বেদ কত কালের ?" এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত উন্নয়ন করিবার জন্য প্রথমতঃ আয়ুর্ব্বেদ কি তাহা অনুসন্ধান করুন, পশ্চাৎ তাহার কালসংখ্যা জানিবার ইচ্ছা করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ কি ? তাহা অনুসন্ধান করিতে গেলে, কতকগুলি ইতিহাস ও কতক গুলি গুরুপরম্পরাগত লিপি পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায়, আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের একটি উপাঙ্গ। কোন কোন গ্রন্থে উহা ঋগ্বেদের উপবেদ, এইরূপ বিস্পষ্ট কথা লিখিত আছে। কোন কোন গ্রন্থে আবার এমন প্রমাণও পাওয়া যায় যে, আয়ুর্ব্বেদ সকল বেদের সার। যথা,—

> "সর্ব্বেষামেব বেদানামুপবেদা ভবন্তি।
> ঋগ্বেদস্যায়ুর্ব্বেদ উপবেদঃ। যজুর্ব্বেদস্য ধনুর্ব্বেদ উপবেদঃ।
> সামবেদস্য গান্ধর্ব্ববেদ উপবেদঃ।
> অথর্ব্ববেদস্য শস্ত্রশাস্ত্রাণি।" [ব্যাসকৃত চরণব্যূহ]

ইহার অর্থ এই যে, সকল বেদেরই এক একটি উপবেদ আছে। ঋগ্বেদের উপবেদ আয়ুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদের উপবেদ ধনুর্ব্বেদ, সামবেদের উপবেদ গান্ধর্ব্ববেদ (সঙ্গীত শাস্ত্র,) এবং অথর্ব্ববেদের উপবেদ শস্ত্রশাস্ত্র অর্থাৎ শল্যতন্ত্র। কেহ কেহ "শস্ত্রার্থশাস্ত্রাণি" এইরূপ পাঠ থাকা নির্ণয় করিয়া, অর্থশাস্ত্রকে অর্থাৎ ব্যবহার-বিজ্ঞানকেও অথর্ব্ববেদের উপবেদ বলিয়া গণনা করেন।

"ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ।
বিচিন্ত্য তেষামর্থং বৈ আয়ুর্ব্বেদং চকার সঃ॥"

[ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ]

সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ববেদ পরিদর্শন করিয়া তাহার অর্থ অনুসন্ধান পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ রচনা করিয়াছিলেন।

চরণব্যূহের প্রমাণে আয়ুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ হইতেছে, আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে উহা সমুদায় বেদের অর্থসংগ্রহ বলিয়া খ্যাপিত হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালের প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয়গ্রন্থে অর্থাৎ সুশ্রুতপ্রভৃতিগ্রন্থে উক্ত সিদ্ধান্তের বিপরীত কথা লিখিত আছে। সুশ্রুত বলেন, আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ। যথা,—

"ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদোনাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্য।"

[সুশ্রুত ১ অং].

সুশ্রুত বলিলেন, আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ। চরণব্যূহ নামক বৈদিক গ্রন্থ বলিলেন, আয়ুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ, এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলিলেন, উহা সর্ব্ববেদের সার। এই মতত্রয় দেখিয়া পাঠকগণ অবশ্যই ভাবিবেন যে, চরণব্যূহ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও সুশ্রুত,—এই তিনের কথা পরস্পর বিসম্বাদী হইতেছে; সুতরাং কাহার কথা সত্য, তাহা জানা যাইতেছে না। পরন্তু তাঁহারা যদি স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখেন, একবাক্যতা বা সামঞ্জস্যবধানে বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে,

কাহারও কথা মিথ্যা নহে, সকলেরই কথা সত্য; ব্যক্ত করিবার ভঙ্গীটী কেবল পৃথক্। কেন না, সকল বেদেই আয়ুর্ব্বেদের বীজ বা মূল-সূত্র বর্ত্তমান আছে।

বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদ মুখ্যকল্পে অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ হইলেও উহার মূল-সূত্র অথবা বীজ, সকল বেদেই আছে। বিশেষতঃ ঋগ্বেদমধ্যে কিছু অধিক আছে। সেই কারণেই বোধ হয়,ব্যাস উহাকে ঋগ্বেদের উপবেদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুশ্রুত গ্রন্থ খানি শল্য প্রধান, তাঁহার গুরু ধন্বন্তরিও শস্ত্রবৈদ্যকের প্রধান উপদেষ্টা; অথর্ব্ববেদেও শারীরতত্ত্বের প্রাচুর্য্য আছে; তাই তিনি আপনার উপদেষ্টব্য সৌশ্রুতনামক আয়ুর্ব্বেদকে অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ * বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

মহাভারতলেখক ব্যাসের শান্তিপর্ব্বের রাজধর্ম্ম পাঠে জানা যায় যে,অত্যন্ত পূর্ব্বকালে চারি শ্রেণীর বৈদ্য বা চিকিৎসক ছিলেন। "রোগহর" "বিষহর" "শল্যহর" ও "কৃত্যাহর"। সুতরাং তৎকালে কায়চিকিৎসা, বিষচিকিৎসা (রোজাদিগের ঝাড়ন ইত্যাদি) প্রভৃতি পৃথক্ ভাবেই ছিল, ইহা সহজেই অনুভূত হয়। এখনকার বৈদ্যেরা যেমন কায়চিকিৎসা ভিন্ন শল্যচিকিৎসা করেন না, করিতে ইচ্ছাও করেন না,ব্যাসের সময়েও বোধ হয়, এইরূপই ছিল। তাই তিনি শস্ত্রশাস্ত্রকে অর্থাৎ শল্যচিকিৎসাকে কায়চিকিৎসা হইতে

* সুশ্রুত মুনি "উপবেদ" এই স্পষ্ট কথা না বলিয়া, রূঢ় বা প্রসিদ্ধ কথা না বলিয়া, "উপাঙ্গ" বলিলেন কেন? ইহা যদি বিচার্য্য হয়, উপবেদ ও উপাঙ্গ,এই দুই শব্দের মধ্যে যদি কিছু অর্থভেদ থাকে, তাহা হইলে, তদীয় আয়ুর্ব্বেদ সংহিতাটি অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ অর্থাৎ প্রধানের (চিকিৎসার) শ্রেষ্ঠ উপকরণ, ইহা ভিন্ন অন্য কোন অর্থ উন্নয়ন করা যাইবে না। সুতরাং এতদ্দ্বারাও ব্যাসবাক্যের সহিত সামঞ্জস্য করিবার উপায় আছে, ইহা বিবেচনা করিতে হইবে।

পৃথগ্রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এবং কায়-চিকিৎসা-জ্ঞাপক শল্যতন্ত্রকে ঋগ্বেদের উপবেদ, এইরূপ পারিভাষিক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শল্যচিকিৎসা ও তদুপযোগী শারীরশাস্ত্রকে শস্ত্রশাস্ত্র এবং তাহা অথর্ব্ববেদেরই উপবেদ, এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার পরেই হয়ত ঐসকল তন্ত্র একত্র সঙ্কলিত হইয়া সংহিতাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল, তাই তৎকালের আচার্য্যেরা অর্থাৎ সুশ্রুত প্রভৃতি তাৎকালিক মুনিরা তাদৃশ সংহিতা, বা তাদৃশ সংগ্রহগ্রন্থকে স্থূলতঃ আয়ুর্ব্বেদ সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেন। তৎকালে বোধ হয়, শস্ত্রপ্রধান চিকিৎসা প্রবল হইয়াছিল, সুশ্রুতপ্রোক্ত গ্রন্থখানিতেও শস্ত্রচিকিৎসার বিবরণ কিছু অধিক পরিমাণে উপদিষ্ট হইয়াছিল, তজ্জন্যই বোধ হয়, সুশ্রুত মুনির অভিমত আয়ুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ বলিয়া খ্যাপিত হইয়াছিল। চরকের সূত্রস্থান অন্বেষণ করিলেও এতদ্রূপ একটী মীমাংসা পাওয়া যায়। যথা,—

"তত্র চেৎ প্রষ্টারঃ স্যুশ্চতুর্ণামৃক্সামযজুরথর্ব্ববেদানাং
কং বেদমুপদিশন্ত্যায়ুর্ব্বেদবিদঃ ?"

চরকের সূত্রস্থান দেখুন।

আয়ুর্ব্বেদবেত্তারা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব,—এই চারি বেদের মধ্যে কোন্ বেদ উপজীবন করিয়া (মূলপত্তন বা অবলম্বন করিয়া) উপদেশ করিয়া থাকেন ? যদি কেহ এরূপ প্রশ্নকারী হয়, তবে,—

"তত্র ভিষজা পৃষ্টেনৈবং চতুর্ণামৃক্সামযজুরথর্ব্ববেদানামাত্মনোঽথর্ব্ববেদে ভক্তিরাদেশ্যা। বেদো হ্যাথর্ব্বণঃ স্বস্ত্যয়নবলিমঙ্গলহোমপ্রায়শ্চিত্তোপবাসমন্ত্রাদিপরিগ্রহাচ্চিকিৎসাং প্রাহ।"

উক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসিত ভিষক্ বা চিকিৎসক ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব,—এই চারি বেদের মধ্যে অথর্ব্ববেদে আপনার ভক্তি থাকা ব্যক্ত করিবেন। কেন না অথর্ব্বপ্রোক্ত বেদই স্বস্ত্যয়ন, বলি, মঙ্গলবিধান, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস ও মন্ত্রাদি উপলক্ষ্য করিয়া চিকিৎসাতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন।

ভিষক্ অথর্ব্ববেদে ভক্তি থাকার কথা বলিবেন, এ কথার দ্বারা কোনরূপ সূচ্য অর্থ পাওয়া যায় কি না, তাহা বিবেচনা করুন। ভিষক্ চরক অথর্ব্ববেদে ভক্তি থাকা ব্যক্ত করিবেন, এ কথার দ্বারা অন্য বেদে অভক্তি করিবেন, এরূপ অর্থ বা এরূপ অভিপ্রায় উন্নয়ন করা যায় না। কেন না অন্য বেদেও আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে। যদিও "বেদোহ্যাথর্ব্বণঃ" এই হেতু প্রদর্শন বাক্যের দ্বারা কায়চিকিৎসা অশাস্ত্রতঃ অথর্ব্ববেদ প্রসঙ্গ এতদ্রূপ বাঞ্ছিতার্থ লক্ষ হয় এবং সুশ্রুত বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য হয়, তথাপি, "অথর্ব্ববেদে মূল হেতু মানি উপলক্ষ করিয়া চিকিৎসা বলিয়াছেন" এ কথার ভাব বা ব্যাখ্যা অন্যরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। ঐ ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য ও নিগূঢ় তথ্য আমরা "আয়ুর্ব্বেদ উন্নতিশীল কি না" এতন্নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিব। এক্ষণে প্রসঙ্গাগত বিচার পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত বিষয়ে অগ্রসর হওয়া যাউক।

বস্তুতঃ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, ঋক্ ও অথর্ব্ব এই উভয় বেদেই আয়ুর্ব্বেদের বীজ বা মূলসূত্র অধিক পরিমাণে নিহিত থাকা দৃষ্ট হইবে। চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ ও আয়ুর্ব্বেদীয় বস্তুতত্ত্ব কোন্ বেদের কোন্ স্থানে কিরূপ ভাবে লুক্কায়িত আছে, পাঠকগণকে তাহা আমরা যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছি, দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, আয়ুর্ব্বেদীয় জ্ঞান বা বস্তুতত্ত্ব কত পুরাতন।

প্রথম ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদের ৯—১১২ মণ্ডলে, সূক্তে ও মন্ত্রে, ভিষক্, চিকিৎসক ধন্বন্তরি ইনি রোগের ব্যবস্থা দাতা, এইরূপ বর্ণনা আছে।

চ্যবন ঋষি জরাজীর্ণ হইলে, অশ্বিনীকুমার তাঁহাকে ঔষধের দ্বারা যুবা করিয়াছিলেন। যথা,—

"যুবং চ্যবানং অশ্বিনা জরন্তম্
পুনর্যুবানং চক্রথুঃ শচীভিঃ॥"

(১—১১৭—১৩ এবং ৫—৭৪—৫ দেখুন।)

দিবোদাস রাজার রোগ হইলে আঙ্গিরস গোত্রীয় এক ভিষক্ তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কোথায় কোন্ ঔষধ আছে, কোথায় ভাল অথবা উপযুক্ত ঔষধ পাওয়া যায়, তাহা তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন এবং আরোগ্য হইলে পর ভিষক্ ও রাজা উভয়েই সেই সেই ঔষধের স্তব অর্থাৎ গুণ-বর্ণনা করিয়াছিলেন।

"যত্রৌষধিঃ সমাগমৎ রাজান সমিতাবিব।
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্ রক্ষোহা মীব চাতনঃ॥"

ইত্যাদি ইত্যাদি ১০—৯৭—ঋগ্বেদ দেখুন।

জলের দ্বারা রোগপ্রতীকার হয়, জলই ঔষধের যোনিস্বরূপ, কেবল জল-ভূতের দ্বারা ঔষধের কার্য্য করা যায়, এরূপ বর্ণনাও আছে। যথা,—

" অপ্‌স্বন্তরমৃত মপ্সু ভেষজং অপামুত
প্রশস্তয়ে। দেবা ভবত বাজিনঃ॥"

ইত্যাদি ইত্যাদি ঋকের ১—২৩—১৯ মন্ত্র দেখুন।

নানাপ্রকার বনস্পতি, শতসহস্র ওষধি ও ঔষধবিষয়ক স্তুতি বা বর্ণনাও পাওয়া যায়। যথা,—

"শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্ব্বী গভীরা সুমতিষ্টেঽস্তু।
বাধস্ব দূরে নিঋ´তিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ।"

ইত্যাদি ইত্যাদি ১—২৪—৯ প্রভৃতি মন্ত্র দৃষ্টি করুন।

অনেক ঋক্ মন্ত্রে ওষধির রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব ঘটিত বর্ণনা আছে। যথা,—

"অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নিদধ্মসি।"
"ইমাং খনাম্যোষধিং বীরুধাং বলবত্তমাম্।
যয়া সপত্নীং বাধতে যয়া সংবিন্দতে পতিম্॥"
"উত্তানপর্ণে সুভগে দেবজূতে সহস্বতি।
সপত্নীং পরাধমে পতিং মে কেবলং কুরু॥"
"উত্তরাহমুত্তর উত্তরেদুত্তরাভ্যঃ।
অথাসপত্নীযা মম মাধরা সাধরাভ্যঃ॥"

ইত্যাদি ইত্যাদি ১—৫—১২ প্রভৃতি মন্ত্র দেখুন।

কক্ষিবান্, দীর্ঘতমস্, ঊশিজ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতির শস্ত্র-বৈদ্যক বা শল্যতন্ত্রসম্বন্ধীয় জ্ঞান থাকা বর্ণিত আছে। যথা,—

"তস্মাদক্ষী নাসত্যা বিচক্ষ আধত্তম্ দস্রা ভিষজাথর্ব্বন্।"

ইত্যাদি ইত্যাদি ১—১১৬—১৫ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেখুন।

যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদকে আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহাদের ভ্রমের ইয়ত্তা নাই। তাঁহারা বোধ হয়, ঋগ্বেদোক্ত আথর্ব্বণ শব্দটী দেখেন নাই। না দেখিয়াই তাঁহারা তাদৃশ বৃথা জল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, বৈদিক বস্তু-সন্দর্ভ অনাদি, পরন্তু তাহার সঙ্কলন অথবা সংহিতাপ্রণয়ন ব্যাসের সমকালিক। মহাত্মা বেদব্যাসই সেই সেই বেদ বিভাগ করিয়া সংহিতা নাম দিয়াছিলেন মাত্র, বস্তুতঃ সকল বেদই তুল্যকালিক।

স্বচ্ছ জল উপকারক ও বলবর্ণাদির প্রসাধক, ইহা অনেক মন্ত্রে খ্যাপিত আছে। যথা,—

"আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তান উর্জ্জে দধাতনঃ। মহেরণায় চক্ষসে।"

"যোবঃ শিবতমোরসঃ তস্য ভাজয়তে হনঃ। উশতীরিব মাতরঃ।"

১০—৯—১ মন্ত্র।

বাস্তোষ্পতি মন্ত্রের অর্থ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, গৃহবাটিকায় ফুল গাছ লাগাইতে হয়, লাগাইলে উপকার হয়। বাস্তুযোগ্য বৃক্ষেও প্রত্যেক বৃক্ষের দোষ ও গুণ আছে। এসকল বর্ণনা দেখিলে কোন্ অভিজ্ঞ না মনে করিবেন যে, ঋক্‌বেদমধ্যে আয়ুর্ব্বেদাঙ্গ উদ্ভিদ্ বিদ্যার বীজ আছে! বাস্তোষ্পতিগণ নামক মন্ত্রগুলি ভট্টাচার্য্য মাত্রেই জ্ঞাত আছেন, সেই জন্যই আমরা তাদৃশ সুলভপ্রচার সর্ব্ব বিদিত মন্ত্রগুলি এস্থলে লিখিলাম না।

বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদে যে ত্রিধাতু বা ত্রিদোষের বর্ণনা আছে, বর্ত্ত-মান চিকিৎসকেরা যাহাকে বাতপিত্তশ্লেষ্মা বলিয়া থাকেন, তাহাও ঋগ্বেদের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

উক্ত ধাতুত্রয় সমান থাকিলে সুখ বা স্বাস্থ্য, অসমান হইলে দুঃখ বা রোগ, এ কথাও ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে। ভেষজের বা ঔষধের দ্বারা ত্রিদোষের প্রশমন হয়, ইহাও ঋগ্বেত্তা ঋষি জানিতেন। আমরা বিবেচনা করি যে, ঋগ্বেদের সেই সেই অংশই কায়চিকিৎসার মূল বা বীজ। যথা,—

"ত্রির্নো অশ্বিনা দিব্যানি ভেষজা ত্রিঃ পার্থিবানি ত্রিরুদত্তমদ্ভ্যঃ।
ওমানং শংযোর্মম কায়স্নবে ত্রিধাতু শর্ম্ম বহতং শুভস্পতী॥"

১—৩—৬ মন্ত্র।

ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য এই ত্রিধাতুকে বাত,পিত্ত ও শ্লেষ্মা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং উহার সাম্যজনিত সুখই শর্ম্ম শব্দের অর্থ, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,—

"ত্রিধাতু বাতপিত্তশ্লেষ্মধাতুত্রয়োপশমনবিষয়ং সুখং বহতম্।"

পিত্তের সহিত সূর্য্যের, রসের সহিত জলদেবতা বরুণের, শারীর বায়ুর সহিত বায়ুদেবতার, সম্পর্ক থাকা বর্ণিত আছে। সে সকল বর্ণনা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রৌদ্রের তাপে পিত্তবৃদ্ধি হয়, জল বা রস উপযোগে রস বৃদ্ধি হয়, ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতি সহন করিলে শারীর বায়ুর প্রকোপ হয়।

অপিচ, ১০—১৬৩ মন্ত্রে রাজযক্ষ্মা-রোগের বর্ণনা আছে। এতদ্ভিন্ন ফুস্‌ফুস্‌, বুক, উদর, অস্থি, মূত্রনাড়ী, ক্লোম ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক শারীর-পদার্থও প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইয়াছে।

(১০—১৬৩) (৬—৫৩—৮) (৩—৩৬—৮)
(৮—১—২৬) (৩—৫০—৬) (১০—১—৮৪) দ্রষ্টব্য।

অন্নপাকপ্রণালী, তাহা হইতে যে শরীরমধ্যে বায়ু উৎপন্ন হয় তাহার প্রসরণ, মাংস, মেদ, স্নায়ু,—প্রসঙ্গক্রমে ও দৃষ্টান্তার্থে এ সকল কথাও লিখিত হইয়াছে।

১০—১৮৬ প্রভৃতি মন্ত্র দেখুন।

যে যে স্থানে অনন্তের প্রসঙ্গ হইয়াছে, সেই সেই স্থানে "রক্ষোহা" "সপত্নীবাধনম্" "রাজযক্ষ্মঘ্নং" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকপ্রকার উল্লেখ ও তৎসঙ্গে ঔষধপ্রভাবের বর্ণনা আছে। (১০—৮৭। (১০—১১৮। (১০—৪৫) (১০—১৫) (১০—৬২) (১০—১৬৩ (১০—১৬৪) (১০—১৬৫) (১০—১৬৬) দেখুন। দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, ঋগ্বেদমধ্যে আয়ুর্ব্বেদের কত পদার্থ লুক্কায়িত আছে। আয়ুর্ব্বেদের বীজস্বরূপ সেই সকল তত্ত্ব যাঁহারা উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা তাদৃশ ঋগ্বেদকে আয়ুর্ব্বেদের মূল বা উপবেদ বলিতে পারেন কি না, তাহা বিবেচনা করুন। এবং ইহাও ভাবিয়া দেখুন যে, আয়ুর্ব্বেদ বা আয়ুর্ব্বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু সকল ঋগবেদের ন্যায় অনাদি বা অজ্ঞাত-আদি বলিয়া সিদ্ধ করা যায় কিনা। আমরা এক্ষণে প্রতিজ্ঞা সহকারে বলিতে পারি যে, যদি ঋগ্বেদ অপেক্ষা পুরাতন আর কিছু থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাতেও আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিজ্ঞান পাওয়া যাইত। যাহাই হউক, সংক্ষেপে ঋগ্বেদ অনুসন্ধান করা হইল, এক্ষণে দেখা যাউক, অথর্ব্ববেদে কি কি পাওয়া যায়।

অথর্ব্ববেদ অনুসন্ধান করিলে শারীর ব্যাকরণের অনেক মূল সূত্র পাওয়া যায়। শস্ত্রবৈদ্যকের বীজ স্বরূপ শিরা, প্রশিরা, অনেক খনিজ পদার্থ, খনিজ দ্রব্যের বীর্য্য ও নামবর্গ, গ্রাম্যৌষধি ও বনৌষধি প্রভৃতি অনেক বৈদ্যক-বীজ পাওয়া যায়। যথা,—

"হৃদি হ্যেষ আত্মা। অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনং তাসাং শতং শত মেকৈকস্যা দ্বাসপ্ততিঃ শাখানাড়ীসহস্রাণি ভবন্তি আসু ব্যানশ্চরতি"।

অথর্ব্ববেদোপনিষৎ।

এবংক্রমে ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান ও নাড়ীনির্ণয় প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে।

"ততোহস্যা এতদশ্বিনৌ চ সরস্বতী চ যজ্ঞং সমভবন্ সৌত্রামণীং ভৈষজ্যায়।"

গোপথব্রাহ্মণ, ৫, ৩।

এই মন্ত্রে ভৈষজ্যবিধির নিমিত্ত সৌত্রামণীযাগ ও তদুপলক্ষে ভেষজের বীর্য্য বর্ণনা আছে।

অথর্ব্ববেদসংহিতায় (১-১৬) শীসং, (১-২৯) মণিঃ, (১-৩৫) সুবর্ণং, (২-২) জঙ্গিড়ঃ, (৪-৬) বিষং, (৪-১০) শঙ্খঃ, (৬-২৬) পার্থিবানি রজাংসি, (৮-৫) প্রতীসারোমণিঃ, (৮-৫) স্রাক্ত্যোমণিঃ, বরণোমণিঃ, (১০-৬) মণিং ক্ষত্রস্য বর্দ্ধনম, (১৯-২৮) ঔদুম্বরোমণিঃ, (১৯-৩১) সৈন্ধবং, (ঐ-৩৮) দুর্ণামোমণিঃ—ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ভৈষজ্যোপযোগী খনিজ-পদার্থের ও ধাতুর উল্লেখ আছে। স্থানে স্থানে এই সকল পদার্থের বীর্য্যবর্ণনাও দৃষ্ট হয়। তাহার পরেই (১৯-৩৬, ১৯-৪৫)

"অস্মিন্ মণাবেকশতং বীর্য্যাণি সহস্রং প্রকাশাঃ।"

এইরূপ বিস্পষ্ট কথা আছে। ইহা দেখিলে কে না মনে করিবে যে, পূর্ব্বকালের ঋষিরা খনিজ-পদার্থের গুণাগুণ জানিতেন। বীর্য্য জানিতেন। বলকারক শক্তি জানিতেন। যদি কাহারও এরূপ সংস্কার থাকে যে, ধাতুঘটিত চিকিৎসা তান্ত্রিক, আয়ুর্ব্বেদবিহিত নহে; আয়ুর্ব্বেদে কেবল গাছ গাছড়ার চিকিৎসা আছে, ধাতুর দ্বারা চিকিৎসা করার প্রণালী আয়ুর্ব্বেদে নাই;—তাহা হইলে, সে সংস্কার তাঁহাদের অপনীত হউক। অথর্ব্ববেদ দেখুন, দেখিলেই জানিতে পারিবেন, উহা কেবল তান্ত্রিক কি বৈদিক। এক্ষণে প্রসঙ্গাগত কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক।

অথর্ব্ববেদের (১-২৩) (১-২৪) (১-৩৪) মন্ত্রে বর্ণিত আছে যে, সকল রোগই বহুভক্ষণ, আলস্য, লাম্পট্য ও স্ত্রীপ্রসঙ্গ হইতে উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্নরোগও ঐ সকলের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন উদরী, রাজযক্ষ্মা, স্বাস্থ্যনাশ, প্লীহা, কেশরোগ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ ইত্যাদি ইত্যাদি বহু প্রকার রোগের কারণব্যঞ্জক

উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয়। রোগপ্রশমকারী অনেক প্রকার বনস্পতির বর্ণনাও আছে। নিদর্শন যথা,—

"শরঃ শনঃ অঘদ্বিষ্টা দেবজাতা বীরুচ্ছপথযোপনী।
বভ্রোরর্জ্জুনকাণ্ডস্য যবস্য তে পলাল্যা তিলস্য তিলোপিঞ্জ্যা॥"

"দশ বৃক্ষ মুঞ্চমাং রক্ষসো গ্রাহ্যা।"

"শং নো দেবী প্রশ্নিপর্ণ্যাশম্।"

"পাঠামিন্দ্রো জলায় ভেষজ।"

"ইদং হিরণ্যং গুগ্‌গুলুঃ।"

ইত্যাদি ইত্যাদি (১-২) (২-৪) (২-৭) (২-৮) (২-৯) (২-২৫) (২-২৭) (২-৩৬) দেখুন।

অথর্ব্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণের (১-৩০) ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে,শারীরিক প্রকৃতির বিপর্য্যয় হইলেই রোগ হয়, তন্নিবারণার্থ বরুণ দেব ভৈষজ্যোপদেশ করিয়াছেন। এই বরুণদেব উত্তম আধ্যাত্মিক চিকিৎসক ছিলেন, সেই জন্যই তিনি আধ্যাত্মিক ভৈষজ্যও উপদেশ করিয়াছেন। যথা ;—

"অধ্যাত্মমাত্মভৈষজ্যম্। আত্মকৈবল্যমোঙ্কারঃ।
আত্মানম্ নিরুধ্য সঙ্গমমাত্রীং ভূতার্থচিন্তাং চিন্তয়েৎ॥"

ইত্যাদি প্রকরণ দেখুন।

এইরূপ স্থানে স্থানে অনেক কথা আছে। অথর্ব্ববেদের গর্ভোপনিষদে শুক্রশোণিতের উৎপত্তি, গর্ভব্যাকরণ, শারীর-ব্যাকরণ, অস্থি প্রভৃতি শারীরপদার্থের সংখ্যা ও সংস্থান, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বিষয়ের উপদেশ আছে। অনুসন্ধান করিলে শস্ত্রবৈদ্যকের অংশ বিশেষও পাওয়া যায়। পুরাতন আর্য্যেরা যজ্ঞকালে পশুবধ করিতেন। মারিত-পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ অবদান অর্থাৎ কর্ত্তন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন। সেই সেই স্থানে, যে প্রকার অবদান-বর্ণনা দৃষ্ট হয়, সেরূপ বর্ণনা শস্ত্রবৈদ্যক জানা

না থাকিলে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ফল, অথর্ব্ববেদেই প্রচুর পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদের মূল সূত্র পাওয়া যায়। এক্ষণে দেখা যাউক, যজুর্ব্বেদে কিছু আছে কি না। (ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদ ও উহার উদ্দেশ্য।

শরীর-জীবয়োর্যোগো জীবনম্ তদবচ্ছিন্নঃ কাল আয়ুরিতি।

ভাবপ্রকাশ।

—————————তস্য হিতাহিতং।

মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে॥

চরক।

যে শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে হইবে, সেই শাস্ত্র কি ও উহার উদ্দেশ্যই বা কি, অগ্রে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। অতএব আমরা আয়ুর্ব্বেদ ও উহার উদ্দেশ্য শীর্ষক প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

যত কাল পর্য্যন্ত শরীরের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ, সেই কালকে আয়ুঃ * বলা যায়, সুতরাং জীবনের আরম্ভ হইতে উহার সমাপন পর্য্যন্ত আয়ুঃ শব্দের বাচ্য। এই আয়ুঃ বা জীবনবাহি-কালকে সুখময় করিবার জন্য উহার হিতকর কি, অহিতকরই বা কি, পরিমাণ কত এবং স্বরূপই বা কিরূপ এই সকল তত্ত্বের বিষয় যে শাস্ত্র দ্বারা শিক্ষা করা যায় তাহাই আয়ুর্ব্বেদ †।

---

* আয়ুসম্বন্ধে ইহা মোটামুটি লক্ষণ। বিস্তৃত লক্ষণ, পরিমাণ ও স্বরূপ প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ু-তত্ত্ব নামক প্রবন্ধে বিবৃত হইবে।

† আয়ুর্ব্বেদ একটী যৌগিক শব্দ (আয়ুঃ + বেদ, বিদ ধাতুর অর্থ জ্ঞান, লাভ বা বিদ্যমানতা। সুতরাং যদ্দ্বারা আয়ুর বিষয়ে জ্ঞান হয়, কিংবা আয়ু লাভ হয় অথবা আয়ুর বিষয় যে শাস্ত্রে বিদ্যমান আছে তাহাই আয়ুর্ব্বেদ।
আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে অনেন বা আয়ুর্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ। সুশ্রুত।

অনেন পুরুষো যস্মাদায়ুর্বিন্দতি বেত্তি বা। তস্মান্মুনিবরৈরেষ আয়ুর্ব্বেদ ইতি স্মৃতঃ। ভাবপ্রকাশ।

অপরাপর জাতি তাঁহাদের অবলম্বিত চিকিৎসাশাস্ত্রের ভৈষজ্য-শাস্ত্র (Medical Science) ইত্যাদি সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুচিকিৎসকগণ ঐরূপ সংজ্ঞা পর্য্যাপ্ত বোধ করেন না. কেন না কেবল রোগ বা ঔষধের তত্ত্ব আলোচিত হইলেই শরীর, মন ও আত্মার স্বাস্থ্য সম্পাদিত হইতে পারে না। উহার সহিত ধর্ম্মভাব চাই, বিশুদ্ধ নীতির আচরণ চাই। মনে কর তোমার শরীর বিলক্ষণ সবল, প্রচুর আহারক্ষম, কোন প্রকার রোগের চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু তুমি ধর্ম্মভাব বিসর্জ্জন দিয়া হিংসাদিরত এবং নীতিমার্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া কোনরূপ ব্যসনে আসক্ত; এইরূপ জীবনে তোমার আত্মার শান্তি কোথায়, চিত্তেরই বা প্রসন্নতা কোথায়? সুতরাং তোমার প্রকৃত স্বাস্থ্য কিরূপে বলিব? অতএব হিন্দুচিকিৎসকগণ ধর্ম্ম, নীতি ও সদাচার ইত্যাদির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ঔষধ ও রোগের তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন।

দেহ, আত্মা ও মনঃ এই তিনটীর যোগের উপরে জীবনের স্রোত নির্ভর করিতেছে। এই তিনটীর যোগ যাহাতে হিতময় ও সুখময় হয়, আমাদের আয়ুর্ব্বেদের তাহাই লক্ষ্য। যাহাতে দেহ সমদোষ, সমাগ্নি ও সমধাতু হয়, আত্মা ও মনঃ প্রসন্ন থাকে, মনুষ্য-সম্বন্ধে আমরা তাহাকেই স্বাস্থ্য বলি। দেহ, মনঃ, আত্মা এই সকলের যোগ-সামঞ্জস্য-বিধান করা আয়ুর্ব্বেদের লক্ষ্য বলিয়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র দেহবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকবিজ্ঞানের উপর সমভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করে। যখন দেহ ব্যতীত মনঃ থাকিতে পারে না, মনঃ ব্যতিরেকে দেহের স্বতন্ত্র উপলব্ধি নাই, আবার দেহ, মনঃ ব্যতীত আমাদের আত্মানুভূতি হইতেছে না। তখনই তিনে এক, এবং একে তিন ইহা কে না স্বীকার করিবে? দেহ, মনঃ, আত্মা তিনই যখন এককে লক্ষ্য করিয়া অবস্থান করিতেছে, একের হিতাহিত যখন তিনেরই হিতাহিত,

তখন দেহের পুষ্টি এক, এবং মনের তুষ্টি আর ইহা কখনই হইতে পারে না। কাম ক্রোধাদি মনোবিকার উপস্থিত হইলে, যখন দেহের রক্তস্রোত, বায়ুস্রোত, জলস্রোতাদি বিকৃত হয়; যখন বাহিরের পদার্থ দেহে প্রবিষ্ট হইলে, আবার মনঃস্রোতঃ পরিবর্ত্তিত হয়, তখন একমাত্র জড়শক্তির প্রাধান্য বিবেচনা করা স্থূলবুদ্ধির কার্য্য। ইহার মধ্যে কেহ প্রধান, কেহ অপ্রধান নয়, সকলেই সমভাবে একের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

কোন কোন জাতির চিকিৎসাশাস্ত্রে কেবল ভৈষজ্যের আড়ম্বর দেখিয়া বোধ হয়, যে মনুষ্যের মধ্যে মনঃ বা আত্মা কিছুই নয়, কেবল ভৈষজ্যতত্ত্বের উপর জীবের পরমায়ু অবলম্বিত রহিয়াছে। মনঃ রাগ, ঈর্ষ্যা বা শোক কর্ত্তৃক বিলোড়িত হইতে থাকুক, আত্মা পাপভরে গ্লানি বোধ করিতে থাকুক; যদি দেহে বল থাকে, দেহের হস্ত পদাদি কিছুমাত্র না ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে; আহার ও মৈথুন-শক্তি যদি অব্যাহত থাকে, তবে তাহাই তাহাদের মতে স্বাস্থ্য। আহার, বিহার, মৈথুন ব্যতীত পশুগণ যেরূপ অপর কোন বিষয়ে প্রকৃতিস্থ হইতে পারে না, মনুষ্যের পক্ষে সত্য সত্যই যদি তাহাই হইত, তবে মনুষ্যত্বের বিশিষ্টভাব কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেক?

আয়ুর্ব্বেদ বেদপ্রসূত, বেদের ন্যায় সর্ব্বাবভাসকতা ও সর্ব্বজ্ঞতা আছে বলিয়া আমরা ইহাকে বেদের অংশ বলিয়া থাকি। জগতে যত প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত আছে, আয়ুর্ব্বেদে সেই সমুদয় প্রণালীই নিহিত রহিয়াছে। সদৃশ চিকিৎসা-প্রণালী (Homeopathic) বিরোধি-চিকিৎসাপ্রণালী (Alleophathic) জলচিকিৎসা প্রণালী (Hydropathic) প্রভৃতি সমুদায়ই আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্ভূত। অপরাপর জাতির চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণালীভেদে অভিহিত হইয়া থাকে, বোধ হয় যেন সমুদয় জীবন-স্রোতঃই সেই প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, পরন্তু

আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র সকলকেই সম-দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়া দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় সকলকেই মানবায়ুর অনুকূল করিয়া লয়। এক আয়ুর্ব্বেদই সমুদায় চিকিৎসা-প্রণালীর সম্মিলন বা সঙ্গতিক্ষেত্র। ভূত-প্রেত পিশাচ গ্রস্তের রোগ কি প্রকারে উপশমিত হয়, হস্তাবমর্শ দ্বারা কি প্রকারে ব্যাধি নিবৃত্ত হইয়া থাকে, জলের অমৃতত্ব ও অগ্নির দাহিকা শক্তি কোন্ চিকিৎসায় প্রয়োজনীয়, কোন্ ক্ষেত্রেই বা বিষ দ্বারা বিষ চিকিৎসিত হয়, কোন্ পাত্রেই বা বিষম চিকিৎসা প্রযোজ্য ইত্যাদি আধুনিক জগতের সমুদয় নবীন তত্ত্ব অতি পুরাতন কাল হইতেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার অন্তর্ভূত রহিয়াছে। যেমন পার্থিব ওষধি, বনস্পতি, মৎস্য, মাংস, স্বর্ণ, প্রস্তর, অন্নাদি সমস্তই মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইয়া মনুষ্যের সাত্ম্যতা গুণে স্ব স্ব শক্তি বিসর্জ্জন দিয়া মানবশক্তির বৃদ্ধি সাধন করিতেছে, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া সমুদয় চিকিৎসাশাস্ত্রই এই আয়ুঃস্রোতে লয় পাইয়া আয়ুর্ব্বেদের মাহাত্ম্য বিজ্ঞাপন করিতেছে। যেমন একই বেদ হইতে স্মৃতি, পুরাণ,তন্ত্রাদি বিবিধ শাস্ত্র বিনিঃসৃত হইয়াছে ; যেমন একই সমুদ্রে মণি, মুক্তা, প্রবাল, রত্ন, পশু, কীট, বৃক্ষ পর্য্যন্ত সকলে একত্রে সমবেত হইয়া একেরই উদ্দেশ্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে, তদ্রূপ এই আয়ুর্ব্বেদ-সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন মত সমাবিষ্ট হইয়া একই উদ্দেশ্যে প্রয়োজিত হইতেছে।

আয়ুর্ব্বেদ কি এবং বিজাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র অপেক্ষা আমাদের আয়ুর্ব্বেদ কোন্ অংশে বিভিন্ন ইহা এক প্রকার বলা হইল। এক্ষণে দেখা যাউক উহার উদ্দেশ্য কি ? সুশ্রুত বলেন—

> 'ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদ-প্রয়োজনম্ ব্যাধ্যুপসৃষ্টস্য ব্যাধি পরিমোক্ষঃ স্বস্থস্য রক্ষণঞ্চ।'

অর্থাৎ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ মোচন এবং সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষা আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন। সুতরাং কোন প্রকার রোগ উপস্থিত হইলে, তাহা নিবারণ করা এবং অনুপস্থিত রোগের

হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়া আমাদিগকে সুস্থ ও সুখী করা ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদের অন্য প্রয়োজন নাই। ফলতঃ পুরুষের বা ব্যক্তির স্বাস্থ্য-সুখ বিতরণ করাই উহার চরম উদ্দেশ্য। পুরুষ ধর্ম্ম, অর্থ, বিষয়, বিভব প্রভৃতি যাহাই অন্বেষণ করুন, শরীর প্রকৃত সুস্থ না হইলে ঐ সকল কে উপভোগ করে? অসুস্থ সম্রাটের নিকটে সসাগরা পৃথিবীও শ্মশানভূমি। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পুরুষই কর্ত্তা, পুরুষই ভোক্তা, পুরুষই সুখী, পুরুষই দুঃখী, পুরুষই জ্ঞানী। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে পুরুষ ই বিষয়ী, আর সমুদয় তাঁহার বিষয় বা উপকরণ।

'তত্র পুরুষঃ প্রধানং তস্যোপকরণমন্যৎ।'

বৃক্ষ সকল যে সুমিষ্ট ফল ধারণ করিতেছে, বৃক্ষ উহার আস্বাদ জানে না; পুষ্প সকল যে পরম শোভন-ভাবে বিরাজ করিতেছে, পুরুষ বিনা কেহই এ মাধুরী অবগত নহে। মণি, মুক্তার মধ্যে যে রমণীয় কান্তি নিহিত রহিয়াছে; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গে যে মনুষ্যের উপকার সাধিত হইয়া থাকে, উহারা নিজের রহস্য কেহই অবগত নহে। পরন্তু পুরুষ সকলের কথাই অবগত আছেন। ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু দ্রব্য-শক্তি আছে, পুরুষ সর্ব্বগুণাধার বলিয়া, সকলের গুণ সাম্যভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ কারণ ওষধি বনস্পতি, প্রস্তর, ধাতু, কীট, পতঙ্গাদি জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই মনুষ্যের উপকরণ। মানব-শরীরের রক্ষার্থ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আয়োজন করিতে হয়, মানবের সহিত সহানুভূতি আছে বলিয়া সমুদায় পদার্থ মানবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব গুণ শক্তি বিসর্জ্জন দিয়া মানবের শক্তি সকলকে বর্দ্ধন করিয়া থাকে। দ্রব্যে যে রস, বিপাক বীর্য্যাদি আছে, মানবেই তাহাদের সম্পূর্ণ বিকাশ অনুভূত হয়। অতএব পুরুষ নিরাময় দেহে জগতের সমগ্র নির্ম্মলসুখ যাহাতে উপভোগ করিতে পারেন, আয়ুর্ব্বেদের ইহাই চেষ্টা, এই কারণেই আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি এবং এই কারণেই আয়ুর্ব্বেদের উপাসনা বা চর্চ্চা।

আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গ-বিভাগ।

"ততোঽল্পায়ুষ্ট্বমল্পমেধস্ত্বঞ্চাবলোক্য নরাণাং
ভূয়োঽষ্টধা প্রণীতবান্।" সুশ্রুত।

মহর্ষি সুশ্রুত বলেন, অতি পূর্ব্বে ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদ নামক লক্ষ-শ্লোকময় একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তৎপরে মানবগণের অল্প আয়ু ও অল্প মেধা অবলোকন করিয়া উহাকে আট অংশে বিভক্ত করেন। চিকিৎসাশাস্ত্র অপার সমুদ্র বিশেষ। উহার সমগ্র অংশের তত্ত্বজ্ঞ হওয়া অল্পায়ু ও অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির শিক্ষার অতীত। এমন কি এক জ্বররোগের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার তত্ত্ব, প্রকার-ভেদ, চিকিৎসা প্রভৃতি একজন লোক আজীবন চেষ্টা করিয়াও শিক্ষা করিতে সমর্থ নহেন; যেহেতু উহা কাল-সহকারে নূতন আকারে ও নূতন প্রকারে আবির্ভূত হইতেছে, তাহার প্রকৃত নির্দ্ধারণে কত গবেষণার প্রয়োজন। ঐ যে ওলাউটা রোগে কত দেশ উৎসন্ন-প্রায় হইল, উহার উৎপত্তি-কারণ, স্বরূপ ও চিকিৎসা প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য কত দেশের কত চিকিৎসক কত কাল অনুসন্ধান করিলেন, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কত পরীক্ষাই করিলেন, কত কমিসনই বসিল, তথাপি এ পর্য্যন্ত কি করিতে পারিয়াছেন? ঐরূপ বিষ-চিকিৎসা সম্বন্ধে একাল পর্য্যন্ত কত অনুসন্ধান হইল, কত দেশ হইতে কত বিষধর সর্প আনীত হইল, কত পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি হইল, তথাপি অভীষ্ট সিদ্ধির দিকে একপদও অগ্রসর হইল না। যখন চিকিৎসা শাস্ত্রের এমন দুরূহ অবস্থা, তখন সমগ্র চিকিৎসাশাস্ত্র একব্যক্তি সুন্দর-রূপে শিক্ষা করিতে পারিবে ইহা কখনই সম্ভব-পর নহে। তজ্জন্য অগাধ-ধী ঋষিগণ চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভাগার্থ এবং শিক্ষা বিধানের সৌকর্য্যার্থ উহাকে আট অংশে বিভক্ত করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রের

প্রতি তাঁহাদের দুরূহ জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও বহুজ্ঞতার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতিপদে এমন সকল দুর্জ্ঞেয় বিষয় নিহিত রহিয়াছে, তাহাতে আমাদের বোধ হয়, উহা আট অঙ্গ কেন, আটশত অঙ্গে বিভক্ত হইলেও এবং উহার এক একটী বিষয় পরীক্ষা ও চিন্তা করিয়া আজীবন অতিবাহিত করিলেও এই বিদ্যা প্রসন্ন হইবে কি না বলা যায় না।

সুশ্রুত মুনি আয়ুর্ব্বেদকে যে অষ্ট অঙ্গে বিভক্ত করেন, সেই অঙ্গগুলির নাম যথা,—শল্য, শালাক্য, কায়-চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র এবং বাজীকরণতন্ত্র।

১। শল্যতন্ত্র— চিকিৎসা শাস্ত্রের যে অঙ্গ অধ্যয়ন করিলে বিবিধ তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, ভস্ম, লৌহ, লোষ্ট্র, অস্থি, কেশ, নখ, পূয়াস্রাব, গর্ভ-শল্য (মৃতভ্রূণাদি) ইত্যাদি উদ্ধরণার্থ যন্ত্র, অস্ত্র, ক্ষার, অগ্নি প্রভৃতির প্রয়োগ এবং ব্রণাদি নিরূপণের বিষয় সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করা যায়, তাহাকে শল্যতন্ত্র কহে।

২। শালাক্যতন্ত্র—চিকিৎসা শাস্ত্রের যে অঙ্গে ঊর্দ্ধজত্রুগত অর্থাৎ শ্রোত্র, নেত্র, মুখ, নাসিকাদি সংশ্রিত ব্যাধি-সমূহের উপশমের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাকে শালাক্য কহে।

৩। কায়চিকিৎসা—আয়ুর্ব্বেদের যে অঙ্গে জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতি সর্ব্বা-

---

১। তত্র শল্যং নাম বিবিধতৃণকাষ্ঠপাষাণ-পাংশু-লৌহ-লোষ্ট্রাস্থি-বাল-নখ-পূয়াস্রাবান্তর্গর্ভ শল্যোদ্ধরণার্থং যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নিপ্রণিধানব্রণাবিনিশ্চয়ার্থঞ্চ।

২। শালাক্যং নাম ঊর্দ্ধজত্রুগতানাং রোগাণাং শ্রবণ-নয়ন-বদন-ঘ্রাণাদি-সংশ্রিতানাং ব্যাধীনামুপশমনার্থম্।

৩। কায়চিকিৎসা নাম সর্ব্বাঙ্গ-সংসৃতানাং ব্যাধীনাং জ্বরাতিসার-রক্তপিত্ত-শোষোন্মাদাপস্মার-কুষ্ঠমেহাদীনামুপশমনার্থম্।

ঙ্গিক রোগের শান্তির বিষয় বিবৃত আছে, তাহাকে কায়চিকিৎসা কহে।

৪। ভূতবিদ্যা——আয়ুর্ব্বেদের যে অঙ্গে দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষঃ, পিতৃ, পিশাচ, নাগ ও গ্রহাদি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের আরোগ্যার্থ গ্রহোপশম, শান্তি-কর্ম্ম, বলিদানাদি লিখিত আছে, তাহাকে ভূতবিদ্যা কহে।

৫। কৌমারভৃত্য—বালকের পোষণ, ধাত্রীর দুগ্ধের দোষ-সংশোধন এবং স্তন্যদোষ ও গ্রহদোষ সমুৎপন্ন ব্যাধি সমূহের চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদের যে অঙ্গের উদ্দেশ্য, তাহাকে কৌমারভৃত্য কহে।

৬। অগদতন্ত্র—সর্প, কীট, লূতা, বৃশ্চিক, মূষিকাদি দংশন-জনিত বিষের লক্ষণ, বিবিধ বিষ এবং সংযোগ-বিষ (সমান ঘৃত মধু ইত্যাদি) দ্বারা উপহত প্রাণীর বিষোপশম আয়ুর্ব্বেদের যে অঙ্গে বিবৃত আছে, তাহাকে অগদতন্ত্র কহে।

৭। রসায়নতন্ত্র—আয়ুর্ব্বেদের যে অঙ্গে বয়ঃস্থাপন, আয়ু, মেধা ও বল বৃদ্ধির উপায় এবং রোগাপহরণের বিষয় বিবৃত আছে, তাহাকে রসায়নতন্ত্র কহিয়া থাকে।

৪। ভূতবিদ্যা নাম দেবাসুর-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রক্ষঃ-পিতৃ পিশাচ-নাগগ্রহাদ্যুপসৃষ্ট-চেতসাং শান্তিকর্ম্ম-বলিহরণাদি-গ্রহোপশমনার্থম্।

৫। কৌমারভৃত্যং নাম কুমারভরণধাত্রী-ক্ষীরদোষ-সংশোধনার্থং দুষ্টস্তন্য গ্রহসমুত্থানাঞ্চ ব্যাধীনামুপশমনার্থম্।

৬। অগদতন্ত্রং নাম সর্প-কীট-লূতা-বৃশ্চিক-মূষিকাদি-দষ্ট-বিষব্যঞ্জনার্থং বিবিধ-বিষ-সংযোগ-বিষোপহতোপশমনার্থম্।

৭। রসায়নতন্ত্রং নাম বয়ঃস্থাপনমায়ুর্মেধাবলকরং রোগাপহরণসমর্থঞ্চ।

৮। বাজীকরণতন্ত্র—আয়ুর্ব্বেদের যে অঙ্গ অল্প, দুষ্ট, বিশুষ্ক ও ক্ষীণ শুক্রের আপ্যায়ন, প্রসাদন ও উপচয় নিমিত্ত ঔষধ, শুক্রদোষ সংস্করণ এবং রতিশক্তি বর্দ্ধনের বিষয় শিক্ষা দেয় তাহাকে বাজীকরণতন্ত্র কহে।

আবশ্যক মতে এই অষ্টাঙ্গের আরও প্রত্যঙ্গ বিভাগ করা যাইতে পারে। আবার ঐ অঙ্গ গুলিকে সঙ্কুচিত করিয়া তিনটী প্রধান অংশে স্থাপন করা যায়, শাস্ত্রীয় সংজ্ঞায় এই এক একটী অংশকে বৃহ, কাণ্ড বা স্কন্ধ কহে। তদনুসারে আয়ুর্ব্বেদ ত্রিকাণ্ড। যথা,—হেতুকাণ্ড, লক্ষণকাণ্ড এবং ঔষধকাণ্ড। স্থানান্তরে এই বিষয়ের বিশেষরূপে আলোচনা করা যাইবে।

৮। বাজীকরণতন্ত্রং নাম অল্প-দুষ্ট-বিশুষ্ক ক্ষীণরেতসামাপ্যায়ন-প্রসাদোপচয় জনন-নিমিত্তং প্রহর্ষজননার্থঞ্চ।

শল্য প্রভৃতি নাম গুলির ব্যুৎপত্তি-লব্ধ অর্থ ও তাৎপর্য্য নিম্নে লিখিত হইল।

শল্যতন্ত্র——শল্য অর্থাৎ অস্ত্র, তদ্বিষয়ক শাস্ত্র কিংবা শল্য = অন্তর্নিহিত তৃণকাষ্ঠাদি, তদাহরণার্থ শাস্ত্র শল্য-তন্ত্র।

শালাক্য তন্ত্র ——শলাকা পটলবেধক অস্ত্রবিশেষ, তৎপ্রধান অঙ্গ শালাক্য।

ভূতবিদ্যা——ভূতবিষয়ক বিদ্যা।

কৌমারভৃত্য—কুমারগণের ভরণ এবং পোষণ-বিষয়ক বিদ্যা।

কায়চিকিৎসা—'কায়স্যান্তরগ্নেশ্চিকিৎসা' (চক্রপাণি) কায় = অগ্নি, তাহার চিকিৎসা। এই নামের বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগ অগ্নির বিকৃতি বশতই সচরাচর জন্মিয়া থাকে, সুতরাং সেই সকল রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসককে অগ্নির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবেক।

অগদ তন্ত্র——অগদ = নানাপ্রকার বিষ-নাশক ঔষধ, তদ্বিষয়ক শাস্ত্র।

রসায়ন তন্ত্র—রস = রসরক্তাদি, অয়ন = আপ্যায়ন বা বৃদ্ধি, তদ্বিষয়ক শাস্ত্র।

বাজীকরণ তন্ত্র—বাজি = অশ্ব অথবা শুক্রধাতু। যদ্দারা রতিকালে অশ্ববৎ বল লাভ করা যায় অথবা প্রচুর পরিমাণে শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহাই বাজীকরণ, তদ্বিষয়ক শাস্ত্র। শ্রীজ—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা আমাদিগকে অগ্রিম মূল্য না পাঠাইয়া কেবল পত্র লিখিয়াছেন তাঁহাদিগকে এক খণ্ড পুস্তক প্রেরণ করা গেল। কিন্তু দ্বিতীয়বারে অগ্রিম মূল্য না পাইলে পুস্তক প্রেরণ করা যাইবে না।

কার্য্যাধ্যক্ষ

মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

সন ১২৯১।৯২

স্থানীয়।

শ্রীযুক্ত বাবু ভূতনাথ নন্দী	জানবাজার তালতলা	২
,, ত্রৈলোক্যনাথ রায়চৌধুরী	হাটখোলা	৩
,, শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী	হাটখোলা	৩
,, হরেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী	হাটখোলা	৩
,, ব্রজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী	হাটখোলা	৩
,, কৃষ্ণনাথ পাল	কুমারটুলী	৩
,, সীতানাথ চৌধুরী	হাটখোলা	৩
,, রাজচন্দ্র চৌধুরী	হাটখোলা	৩
,, শশীভূষণ পালচৌধুরী	কুমারটুলী	৩
,, জনমেজয় কুণ্ডু	কুমারটুলী	৩
,, যদুনাথ পাল	কুমারটুলী	৩

বিদেশীয়।

১২৯১ ৯২ সাল

শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ মিরমুন্সী	বাবেলখণ্ড	৩
,, শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	ডের ডুনা	৩
,, দীনবন্ধু সেন	দাশেরা	৩
,, প্রাণবন্ধু চক্রবর্ত্তী	ধারিয়াবাবলপুর	৩
,, বিশ্বম্ভর শাসমল	চণ্ডীভেটীমেদিনীপুর	৩
,, আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস	সাহাবাদপুর যশোহর	৩
,, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী	পয়ারকান্দি মজ্জারগাছা	৩

(ক্রমশ)

ব্রাহ্মণ।

"ব্রাহ্মণ" নামে আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিকা মাসিক পত্রিকা ২১১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্ মণিরাম যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে। শাস্ত্র ও যুক্তির সহিত আর্য্যধর্ম্মের সমুদায় তত্ত্ব ইহাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে। সর্ব্বসাধারণে ইহা গ্রহণ করিতে পারেন এজন্য ইহার মূল্য, মায় ডাক মাসুল, দুইটী টাকা স্থির করা হইয়াছে। অগ্রিম মূল্য প্রেরণ না করিলে মফঃস্বলে ইহা পাঠান হয় না। স্থানীয় মূল্য ১৸০ টাকা মাত্র।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
প্রকাশক।

বিজ্ঞান প্রবেশ প্রথম ভাগ।

আহীরীটোলা গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক, খালিয়া নিবাসী পণ্ডিত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় কৃত। মূল্য ।৵ আনা। কলিকাতা কুমারটুলি ১৭ নং ভবনে, বটতলা বৈষ্ণবচরণ বসাকের দোকানে, সংস্কৃত ডিপজিটারিতে অথবা কলেজষ্ট্রীট্ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

ভৈষজ্যতত্ত্ব—আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষা। চিকিৎসক শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশারদ কর্ত্তৃক সমগ্র আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে পূর্ণাবয়বে সঙ্কলিত। ইহার নূতন রচিত সংস্কৃত টীকাতে অনেক গুরুতর তত্ত্বের মীমাংসা আছে। বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কৃত মূল, টীকা, বাঙ্গালা অনুবাদের মূল ও টীকা সহ অল্পদিন মধ্যে মুদ্রিত হইবে। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

সংবাদ।

আমরা আহ্লাদসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনীর উন্নতি জন্য পণ্ডিত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টা ও উৎসাহ আছে।

রোগ ও রোগের বিভাগ।

"তদ্দুঃখ-সংযোগা ব্যাধয় ইতি"

সুশ্রুত।

"বিকারো ধাতু-বৈষম্যং——।"

"————বিকারো দুঃখমেবচ ॥"

চরক।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে রোগ-প্রতিকার আয়ুর্ব্বেদের একটী উদ্দেশ্য। অতএব রোগ কি, এবং মহর্ষিগণ রোগের কিরূপ বিভাগই বা প্রদর্শন করিয়াছেন, এই দুইটী বিষয় প্রস্তাবিত প্রবন্ধের আলোচ্য।

রোগ কি? ইহার স্থূলজ্ঞান প্রায় সকলের মনেই নিহিত আছে। কেন না, প্রায় সকল রোগেই কোন না কোন প্রকার যাতনা অনুভূত হয়। রোগ উপস্থিত হইয়াছে, অথচ যন্ত্রণা-বোধ নাই, এমন রোগ বিরল, এবং কখন কোন রোগ ভোগ করেন নাই, এমন লোকের সংখ্যাও অতি অল্প। সুতরাং রোগ বলিলেই আমাদের স্থূলতঃ বোধ হয় যে, কোন প্রকার ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকার জ্ঞান মোটামুটী অনুভবমাত্র। ইহা দ্বারা কোন রোগেরই প্রকৃত স্বরূপ-নির্ণয় করা যাইতে পারে না। যেহেতু জ্বরের যে আকার, উদরাময়ের সেরূপ আকার নহে; উদরাময়ের যেরূপ আকার, আবার অর্শ-রোগের সেরূপ আকার নয়। এক রোগও নানা-প্রকার আকার ধারণ করে। অনেক রোগও একপ্রকার আকারে আবির্ভূত হয়। কতকগুলি রোগের বা আকার স্পষ্টতঃ প্রকাশই পায় না। এই সকল কারণে রোগ-নির্ণয় এত দুরূহ ব্যাপার। এবং এই হেতু বশতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রেরও অনেক মত-ভেদ লক্ষিত হয়।

পরন্তু রোগের আকারাদিগতপার্থক্যপ্রভৃতি থাকিলেও এমন অনেক

গুলি ধর্ম্ম আছে, যাহা প্রায় সকল রোগেই বর্ত্তমান থাকে। সেই ধর্ম্ম গুলিকে সাধারণ ধর্ম্ম বলে। সেই সাধারণ ধর্ম্ম লইয়া ঋষিগণ সমুদয় রোগের ব্যাপক-লক্ষণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রস্তাবের মুকুটে যে তিনটী সূত্র-বিন্যাস করা হইয়াছে, উক্ত তিনটী সূত্রই রোগের সাধারণ-স্বরূপ-বোধক অথবা রোগের সাধারণ ধর্ম্ম বা লক্ষণ-জ্ঞাপক। উহাদের ব্যাখ্যা বুঝিলেই আমরা ঋষি-গণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিব। উক্ত সূত্রের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়, এই দুটীর অর্থ এই যে, "যাহা দ্বারা পুরুষে বা ব্যক্তিতে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাই রোগ" সুতরাং দুঃখজনক মাত্রই রোগ বলিয়া গণ্য। কথাটী সংক্ষিপ্ত হইলেও, উহার অর্থ বহুদূর ব্যাপক ; এমন কি, অধ্যাত্ম-প্রকরণ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে। কেননা জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ প্রভৃতি দেহের স্বাভাবিক ব্যাপার সমস্তও রোগেরই অন্তর্ভূত। যেহেতু ইহাদের দ্বারা পুরুষে যে দুঃখ উপস্থিত হয়, সে দুঃখের অভিঘাতে পুরুষ সদাই জর্জ্জরিত ও সর্ব্বদাই ব্যাকুল। অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাদের নিকটে জ্বরপ্রভৃতি রোগসমূহকে অতি সামান্যই মনে করেন। তাঁহারা বলেন, জ্বরাদি রোগ লৌকিক চেষ্টাতেই প্রশমিত হইতে পারে। কিন্তু জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি স্বাভাবিক রোগ সমূহ সামান্য মানবের সামান্য চেষ্টার আয়ত্ত নহে। তুমি যত বড় পণ্ডিত, যত বড় বুদ্ধিমান্, যত বড় চেষ্টাশীল হও না কেন, স্বাভাবিক রোগের হস্ত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। শৈশবের পশ্চাদ্গামিনী জরা তোমাকে আক্রমণ করিবেই,—জন্মের সহচর মৃত্যুও তোমাকে নিশ্চয়ই গ্রাস করিবে। প্রকৃতির এই সকল স্বাভাবিক নিয়ম সামান্য মানবের অলঙ্ঘনীয়। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয় দ্বারা এই বুঝায় যে, মানবের যে কোন প্রকার দুঃখদায়ক অবস্থা উপস্থিত হইলে, ঋষিগণ তাহাকেই ব্যাধিসংজ্ঞা প্রদান করিতেন।

কিন্তু আমরা সাংসারিক ও ঘোর বিষয়ী; ঐহিক সুখই আমাদের সর্ব্বস্ব। ঋষিগণের নিকট সংসার বিষময় হইলেও আমাদের নিকট অমৃতের প্রস্রবণ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তাঁহাদের বৈরাগ্য-বুদ্ধিতে রোগ বলিয়া গণ্য হইলেও, আমাদের প্রার্থনীয় সুখ। সুতরাং এতদূর-ব্যাপক লক্ষণ এক্ষণে আর আমাদের মনঃপূত হয় না। এই কারণে আর একটী সূত্র প্রথমোক্ত সূত্রদ্বয়ের সহিত বিন্যস্ত হইয়াছে। উহার অর্থ এই যে "ধাতু-গণের বৈষম্যই রোগ" শরীরের বিধান, ধারণ, বা পোষণোপযোগী পদার্থ মাত্রই ধাতু। সুতরাং শরীরের উপাদান বা জীব - সমুদয় দ্রব্যকেই (রস, রক্ত প্রভৃতি পদার্থ এবং যকৃৎ-প্লীহাদি যন্ত্রমাত্রকেই) ধাতু[১] বলা যায়। তাহাদের যে কোন রূপ বৈষম্য [২] বা অন্যথা ভাব হইলেই রোগ।

এইকথাগুলিকে প্রকারান্তরে এইরূপে বলা যাইতে পারে। জীবিত শরীরে যে সকল যন্ত্র, যে ভাবে থাকিয়া, যেরূপ কার্য্য

[১] শরীরং দধাতি, বিধত্তে ধারয়তি পুষ্ণাতি বা ইতি ধাতুঃ।

[২] বৈষম্যশব্দে উল্লিখিত পদার্থসকলের দ্রব্যগত, গুণগত ও ক্রিয়াগত হ্রাস অথবা বৃদ্ধি এবং যন্ত্রাদির নির্ম্মাণগত অন্যথা ভাব বুঝিতে হইবে।

কোনওমতে অন্যথাভাব ৪ চারিপ্রকার। যথা—

১—প্রকোপ, ২—আশয়াপকর্ষ, ৩—হীনতা, ৪—বহুলতা।

১ প্রকোপ। এস্থলে প্রকোপশব্দে বাতপিত্তাদির রুক্ষতা তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি স্বতঃসিদ্ধ গুণ সকলের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি।

২ আশয়াপকর্ষ। কোনও তরল অথবা লঘুপদার্থ, অর্থাৎ শরীরগত বায়ু, পিত্ত, কফ, রস, রক্ত, প্রভৃতি পদার্থের কোন একটি ধাতু, বলবান্ অন্য ধাতুর আকর্ষণে স্বকীয় আশয় পরিত্যাগ করিয়া বিকৃতভাবে অন্য আশয়ে গমন করার নাম "আশয়াপকর্ষ"।

৩ হীনতা। এস্থলে হীনতা শব্দে দ্রব্যগত হ্রাস।

৪ বৃদ্ধি। এস্থলে বৃদ্ধি শব্দে দ্রব্যগত পরিমাণাধিক্য।

করিতেছে; এবং যে যে পাদার্থ, যতখানি পরিমাণে ও যে ভাবে থাকা আবশ্যক, তাহার বিকৃতিকে রোগ কহে।

আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, উল্লিখিত লক্ষণ দ্বারা শারীরিক রোগের কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র পাওয়া গেল, কিন্তু মানসিক রোগের বিষয় অস্পষ্ট রহিল। অথচ, শারীর ধাতুর বৈষম্যবশতঃ যেমন জ্বর প্রভৃতি জন্মে; মানস ধাতুর বৈষম্যবশতঃ তেমন উন্মাদ, মূর্চ্ছা, কাম, ক্রোধাদি মনোবিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। শারীর-রোগের চিকিৎসা করা, আয়ুর্ব্বেদের যেমন একটী লক্ষ্য, মানসিক রোগের চিকিৎসা করাও তেমন আর একটী লক্ষ্য। সুতরাং মানসিক রোগের বিষয়ও এস্থলে স্থূলতঃ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। পরন্তু, পাঠকগণ ধাতুশব্দের আর একটী অর্থের প্রতি অভিনিবেশ করিলেই;মানসিক রোগের স্বরূপও সামান্যাকারে জানিতে পারিবেন। ধাতু শব্দে যেমন শারীরিক ধাতু রসপ্রভৃতি বুঝায়, তেমন মানসিক ধাতু সত্ত্বগুণপ্রভৃতিও বুঝায় [৩] এই সত্ত্বপ্রভৃতির বৈষম্য বশতই উন্মাদাদি মনোবিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং ধাতুবৈষম্য বলিলে,শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ রোগেরই লক্ষণ উপস্থিত হইতেছে।

উক্ত কথাগুলির বিবৃতি এই—আমাদিগের শরীরে আমাশয় (যে যন্ত্রে আহারীয় দ্রব্য প্রথমে উপস্থিত হয়), পক্বাশয় (ভুক্ত দ্রব্যের অসার অংশগুলি যে যন্ত্রে গিয়া মূত্র ও মলরূপে পরিণত হয়) এবং রক্তাশয় প্রভৃতি যন্ত্র সকল, নিরন্তর আপন আপন কার্য্য করিতেছে। আহারীয় দ্রব্য হইতে রস, তাহা হইতে রক্ত, তাহা হইতে মাংস ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া শারীরিক পদার্থ সকলের ক্ষতি-পূরণ ও পুষ্টিসাধন করিতেছে। বাত,পিত্ত ও কফ এই ত্রিবিধ শারীর-

[৩] "ধাতবো বাতাদয়ঃ রসাদয়শ্চ, তথা রজঃপ্রভৃতয়ঃ।"
[চক্রপাণিকৃত টীকা]

পদার্থ এবং সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ মানস পদার্থ, আপন আপন সিরা ও ধমনী প্রভৃতি পথে গতাগতি করিয়া জীবনক্রিয়ার সহায়তা করিতেছে ; এই নিমিত্ত আমরা সচ্ছন্দ শরীরে ও সুস্থ মনে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি এবং বাল্য হইতে যৌবনে ; তাহা হইতে প্রৌঢ়তায় এবং তাহা হইতে বৃদ্ধাবস্থায় নীত হইতেছি। কিন্তু এই সকল পদার্থের ও এই সকল কার্য্যের কোনরূপ অন্যথাভাব ঘটিলেই আমরা পীড়িত বা রোগগ্রস্ত বলিয়া গণ্য হই।

জগতের বাহ্য পদার্থের সহিত আমাদিগের শরীর ও মনের নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে। জল, বায়ু, সূর্য্যকিরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ, আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি দৈহিক ব্যাপার, বাগ্‌বিতণ্ডাপ্রভৃতি বাচনিক কার্য্য, কাম ক্রোধাদি মানসিক উত্তেজনা, অথবা চিন্তন, অনুধ্যান ইত্যাদি মানসিক ব্যাপার, আমাদিগের আত্মা ও শরীরের সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধ রহিয়াছে। ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহার ও ঘটনার অনুষ্ঠান বিবিধ কারণে প্রয়োজনমত হইয়া উঠে না। কখনও প্রয়োজনাতিরিক্ত কদাপি বা প্রয়োজনাপেক্ষা ন্যূন হইয়া যায়। এই নিমিত্তই আমাদিগের জীবিত শরীরের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও ঘটনাগুলির অন্যথা ভাব ঘটিয়া তাহা "রোগ" নামে পরিগণিত হইয়া থাকে।

বিষমতাপ্রাপ্ত বাত পিত্তাদি হইতেও কতকগুলি রোগের উৎপত্তি হয়। ঐ রোগগুলিকে দুইভাগ করা যাইতে পারে। যথা অমিশ্র ও মিশ্র রোগ।

বাতের প্রকোপাদি জন্য যে রোগগুলি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে বাতজন্য অমিশ্র রোগ বলা যাইতে পারে। পিত্তের প্রকোপাদি জন্য যে অমিশ্র রোগগুলি জন্মে,তাহাদিগের নাম পিত্ত জন্য অমিশ্র রোগ, শ্লেষ্মার প্রকোপাদি-বশতঃ উৎপন্ন রোগগুলি,শ্লেষ্মজন্য অমিশ্র রোগ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করি-

য়াছেন যে, বাতজন্য নখভেদ (কোনও স্থান বিদারণ করিলে যেরূপ বেদনা অনুভব হয়, নখে সেইরূপ বেদনা), পাদশূল (গোড়ালির নিম্নদেশে বেদনা), প্রভৃতি ৮০ প্রকার এবং পিত্তজন্য জোষ (পার্শ্বে অগ্নি থাকিলে, যেরূপ তাপ অনুভব হয়, সেইরূপ অনুভব) প্রোষ (কিঞ্চিৎ দগ্ধ করিলে যেমন ক্লেশ অনুভব হয়, সেইরূপ অনুভব), প্রভৃতি ৪০ প্রকার ও শ্লেষ্মজন্য তৃপ্তি (সর্ব্বদা ক্ষুধা ও আহারপ্রবৃত্তির অভাব), তন্দ্রা, গাত্রগুরুতা প্রভৃতি ২০ প্রকার অমিশ্র রোগ হইয়া থাকে [৪]। এই রোগগুলির কোন্‌টী বাতজন্য, কোন্‌টী পিত্তজন্য, তাহা বহুকালের বহু পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অমিশ্র রোগগুলির মিশ্রণ দ্বারা অপর কতকগুলি রোগ উৎপন্ন হয়। উহাদিগকে মিশ্র রোগ বলা যাইতে পারে। যথা, জ্বর অতিসার, গ্রহণী, অর্শঃ ইত্যাদি। যে সময়ে বাত পিত্তাদির বিষমতা হইতে জ্বর রোগের উৎপত্তি হইবে, সেই সময়েই ঐ বাতপিত্তাদির বৈষম্য হইতে কম্প, দাহ, গাত্রগৌরব প্রভৃতি অপর কতকগুলি অমিশ্র রোগ উৎপন্ন হইয়া ঐ জ্বরনামক রোগের সহিত মিশ্রিত হইবে, ইহা স্থির আছে। শেষোক্ত রোগগুলিকে প্রথম রোগের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন বলে। [৫]

জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগ সকল উৎপন্ন হইবার পর, রোগীর অত্যাচার বা অন্য কোন কারণ প্রযুক্ত বাত পিত্তাদির প্রকোপের আধিক্য হওয়াতে অপর কতকগুলি অমিশ্র রোগ উৎপন্ন হইয়া প্রথমোৎপন্ন রোগের সহিত মিলিত হইয়া যায়। ঐ শেষোক্ত

---

[৪] চরক, সূত্রস্থান, মহারোগাধ্যায় দেখ।

[৫] জ্ঞানার্থং যানি চোক্তানি ব্যাধিলিঙ্গানি সংগ্রহে।
ব্যাধয়স্তে তদাত্বে তু লিঙ্গানীষ্টানি নামশঃ ॥ চরক।

রোগগুলিকে প্রথমোক্ত রোগের উপদ্রব বলে। [৬] কোন্ কোন্ রোগের সহিত কোন্ কোন্ উপদ্রব ঘটিয়া থাকে, আয়ুর্ব্বেদিক পণ্ডিতেরা তাহা এক প্রকার স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন।

অপর এক শ্রেণীর রোগ আছে, তাহাতে প্রথমে বাত. পিত্ত বা কফের প্রকোপাদি হয় না, অথচ অন্যরূপে ধাতুবৈষম্য ঘটে ; পশ্চাৎ বাতাদির প্রকোপাদি উপস্থিত হয় ; অনন্তর বেদনা, দাহ প্রভৃতি অমিশ্র রোগ, তদনন্তর ব্রণপ্রভৃতি মিশ্র রোগ আবির্ভূত হয়। ইহাদিগকে আগন্তু রোগ বলে। তরবারিদ্বারা কোনও ব্যক্তির হস্তচ্ছেদ করিলেই, তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গহানিরূপ ধাতুবৈষম্য ঘটিল, পরক্ষণেই আঘাত জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাতপ্রকোপ এবং পরম্পরা সম্বন্ধে পিত্তাদির প্রকোপ, অনন্তর বেদনা, দাহ প্রভৃতি ; তদনন্তর ব্রণ বা ক্ষত রোগ ঘটিয়া থাকে। [৭]

মনুষ্যশরীরে রোগের সংখ্যা কত, তাহা স্থির করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। এই অসংখ্য রোগ, কতগুলি শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহা যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ যাবতীয় রোগকে তিন ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—

১ আধ্যাত্মিক,—২ আধিভৌতিক,—৩ আধিদৈবিক।

[৬] ঔপসর্গিকো নাম, যঃ পূর্ব্বোৎপন্নং ব্যাধিং জঘন্যকালজাতো ব্যাধিরূপসৃজতি স তন্মূলমূলএব উপদ্রবসংজ্ঞঃ। সুশ্রুত

[৭] স্বধাতুবৈষম্যনিমিত্তজা যে বিকারসংঘা বহবঃ শরীরে।
ন তে পৃথক্ পিত্তকফানিলেভ্য আগন্তবস্তে তু ততো বিশিষ্টাঃ।
আগন্তুরন্বেতি নিজং বিকারং নিজস্তথাগন্তুমতিপ্রবৃদ্ধঃ ॥
তে পূর্ব্বং কেবলাঃ পশ্চাৎ নিজৈর্ব্যামিশ্রলক্ষণাঃ।
হেত্বৌষধিবিশিষ্টাশ্চ ভবন্ত্যাগন্তবো জ্বরাঃ ॥ চরক।

এস্থলে আত্মা শব্দে মনঃ ও শরীর একত্র এই দুই পদার্থ বুঝিতে হইবে। ভুত শব্দে অস্ত্র, শস্ত্র প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ। দেব শব্দে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ প্রভৃতি এবং গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুরূপ কাল-ঘটিত প্রাকৃতিক নিয়ম।

আত্মা অর্থাৎ মনঃ ও শরীর ঘটিত যে সকল রোগ আহার বিহারাদির অত্যাচার জন্য উৎপন্ন হয়, তাহার নাম আধ্যাত্মিক। ভুত পদার্থ হইতে যে রোগ জন্মে, তাহার নাম আধিভৌতিক। দেব হইতে যে সকল রোগের উৎপত্তি, তাহাদিগকে আধিদৈবিক বলা যায়।

আধ্যাত্মিক রোগ তিন শ্রেণীতে গণ্য। যথা—

১ আদিবলপ্রবৃত্ত,—২ জন্মবলপ্রবৃত্ত,—৩ দোষবলপ্রবৃত্ত।

মানবশরীরের আদি উপাদানস্বরূপ শুক্র শোণিতের বিকৃতি থাকিলে তদুৎপন্ন শরীরে তজ্জন্য যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদিগের নাম আদিবলপ্রবৃত্ত। যথা—আজন্মজাত কুষ্ঠ এবং সহজাত অর্শ, সহজাত প্রমেহ প্রভৃতি।

আদিবল প্রবৃত্ত রোগ পুনরায় দুই প্রকার। যথা—১ মাতৃজাত, —২ পিতৃজাত।

মাতৃশরীরের রজোবিকৃতি জন্য সন্তানে যে রোগ জন্মে, তাহার নাম মাতৃজাত। পিতার শুক্রদোষজন্য সন্তানের যে রোগ জন্মে, তাহার নাম পিতৃজাত।

অবিকৃত শুক্রশোণিত হইতে মানবদেহের অঙ্কুরোৎপত্তি হইবার পর, মাতৃগর্ভে ঐ অঙ্কুরের পরিপোষণ কালে গর্ভস্থ শিশুর যে রোগ জন্মে, এস্থলে তাহার নাম জন্মবলপ্রবৃত্ত।

জন্মবল প্রবৃত্ত রোগ পুনরায় দুইপ্রকার। যথা—

১ রসকৃত,—২ দৌহৃদাপচার কৃত।

জরায়ুস্থিত সন্তান মাতৃশরীরের আহারজনিত রসধাতু দ্বারাই

জীবিত থাকে এবং পরিপুষ্ট হয় [৯] যদি তদবস্থায় মাতার আহার বিহারাদির অত্যাচার ঘটে, তবে ঐ রসধাতুর বিকৃতি জন্মে। তাদৃশ বিকৃত রসদ্বারা পরিপোষিত হওয়াতে উদরস্থ সন্তানের রোগ জন্মিয়া থাকে। ঐ রোগকে রসকৃত রোগ বলে, যথা—সন্তানের অতিক্ষীণতা প্রভৃতি।

গর্ভ চতুর্থ মাসে উপনীত হইলে [১০] জরায়ুস্থ সন্তানের হৃদয়-দেশের গঠন সম্পন্ন হয় এবং চেতনা ধাতু ব্যক্ত হইয়া উঠে। তখন ঐ সন্তানের আহারাদির প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়। ঐ প্রবৃত্তি গর্ভি-ণীর মনোরথ দ্বারা প্রকাশ পায়। এইরূপ একাধারে দুইটী হৃদয়ের অবস্থান প্রযুক্ত ঐ সময়ে গর্ভিণীকে দ্বি-হৃদয়া [১১] এবং গর্ভবতীর ঐ রূপ আহারাদির অভিলাষকে দৌহৃদ বলে। ঐ দৌহৃদের পূরণ না হইলে, ক্ষোভবশতঃ গর্ভিণীর বাতপ্রকোপ হয়; তজ্জন্য জরায়ুস্থ সন্তান কুব্জ, পঙ্গু, মূক (বোবা) ইত্যাদি বিকৃতাবস্থা-পন্ন হইয়া থাকে [১২]। ঐরূপ রোগকে দৌহৃদাপচারজনিত ব্যাধি বলে।

শরীরস্থ বাত, পিত্ত ও কফ এবং মানসিক রজঃ ও তমঃ এই

---

[৯] মাতুস্তু খলু রসবহায়াং নাড্যাং গর্ভনাভিনাড়ী প্রতিবদ্ধা সাস্য মাতুরাহাররসবীর্য্যমভিবহতি, তেনোপস্নেহেনাস্যাভিবৃদ্ধি র্ভবতি।

সুশ্রুত, শারীরস্থান।

[১০] সুশ্রুতের মতে চতুর্থ মাসে, আর চরকের মতে তৃতীয় মাসে দৌহৃদ উপস্থিত হয়।

[১১] "দ্বিহৃদয়াঞ্চ নারীং দৌহৃদিনীমাচক্ষতে।"

সুশ্রুত।

[১২] "গর্ভো বাতপ্রকোপেণ দৌহৃদে চাবমানিতে।
ভবেৎ কুব্জঃ কুণিঃ পঙ্গুর্মূকো মিম্মিন এব চ॥"

সুশ্রুত।

পাঁচটীকে বিকৃত অবস্থায় দোষ [১৩] বলে। এই দোষদিগের প্রবলতাদি প্রযুক্ত যে সকল রোগ জন্মে তাহাদিগের নাম দোষবল-প্রবৃত্ত। যথা—জ্বর, অতিসার; উন্মাদ ইত্যাদি। ঐ সকল দোষবল-প্রবৃত্ত রোগ দুইটী শ্রেণীতে পরিগণিত। যথা—১শারীর,—২মানস।

যে রোগ মনকে অধিক আক্রমণ না করিয়া শরীরকে অধিক আক্রমণ করে, তাহার নাম শারীর যথা, জ্বর অতিসার প্রভৃতি। যে রোগ শরীরকে অধিক আক্রমণ না করিয়া মনকে অধিক আক্রমণ করে, তাহার নাম মানস। যথা, উন্মাদ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি। শারীর রোগ স্থূলতঃ দুইটী শ্রেণীতে গণ্য হইয়া থাকে। যথা—১ আমাশয়-সমুৎপন্ন,—২ পক্বাশয়সমুৎপন্ন।

নাভিদেশ হইতে স্তনদ্বয়ের নিম্ন পর্য্যন্ত স্থানে [১৪] আম অর্থাৎ অপক্ব বস্তুর পরিপাক হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ঐ স্থানকে আমাশয় বলে। আর নাভির নিম্নবর্ত্তী স্থানে (অন্ত্রে) পাচকাগ্নি দ্বারা পাক করা বস্তুর অসার অংশ গুলি (যাহা পরিশেষে পুরীষ ও মূত্ররূপে পরিণত হইবে) গিয়া পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এই জন্য সেই স্থানকে পক্বাশয় বলে।

যে রোগ আমাশয়স্থ ক্লেদক শ্লেষ্মা (Gastic Juice) এবং পাচকাগ্নির বিকৃতি প্রযুক্ত প্রাদুর্ভূত হয়, তাহার নাম আমাশয়-সমুৎপন্ন। যথা,—জ্বর, বমি ইত্যাদি। পক্বাশয়কে দূষিত করিয়া যে রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহার নাম পক্বাশয়সমুৎপন্ন। যথা—গ্রহণী, অতিসার ইত্যাদি। [ক্রমশঃ]

কবিরাজ শ্রীঈশানচন্দ্র শর্ম্ম-বিশারদ।

[১৩] বাতঃ পিত্তং কফঃ প্রোক্তঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ।
মানসঃ পুনরুদ্দিষ্টো রজশ্চ তম এব চ॥ চরক
শরীরদূষণাৎ দোষাঃ * * ॥ বাগভট।

১৪] নাভেঃ স্তনান্তরং জন্তো রামাশয় ইতি স্মৃতঃ।

আয়ুর্ব্বেদ কত কালের ?

[প্রথম সংখ্যার অনুবৃত্তি]

আয়ুর্ব্বেদের মূলতত্ত্ব, আয়ুর্ব্বেদীয় বস্তু বীজ—যাহা ঋগ্বেদে আছে তাহা দেখিয়াছেন—যাহা অথর্ব্ববেদে আছে তাহাও শুনিয়াছেন ; এক্ষণে যজুর্ব্বেদ অনুসন্ধান করা যাউক ; যজুর্ব্বেদ আয়ুস্তত্ত্বের কি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন দেখা যাউক; তাহাতেও দেখিবেন, প্রচুর পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদসূত্র বা আয়ুর্ব্বেদীয় বস্তু বীজ নিহিত আছে।

"যা ওষধিঃ পূর্ব্বজাতা দেবেভ্যস্ত্রিযুগং পুরা।
মনৈন্নু ব্রভ্রূণামহং শতং ধামানি সপ্ত চ॥"

[শুক্ল যজুঃসংহিতা, ১২, ৭৪, ৭৫ ।

মাধ্যন্দিনী শুক্ল যজুঃশাখার এই মন্ত্রটী এবং ইহার পরবর্ত্তী আর ২৬টী মন্ত্র অথর্ব্বপুত্র কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে ও পরবর্ত্তী মন্ত্রসমূহে ওষধি-স্তুতি উপলক্ষে অশেষবিধ ঔষধতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ ওষধির বল, বীর্য্য, তাহাদের রোগহারকত্ব শক্তি, সমস্তই অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। উদ্ধৃত মন্ত্রটীর অক্ষরার্থ এইরূপঃ—

যে সকল ওষধি পূর্ব্বকালে বা আদিসৃষ্টিকালে দেবের উদ্দেশে অর্থাৎ ঋতুবিশেষের জন্য ভবিষ্যৎ ওষধি অপেক্ষা প্রথম প্রজাত হইয়াছিল, যাহা ত্রিযুগে অর্থাৎ বসন্ত কালে, প্রাবৃট্‌কালে ও শরৎ কালে জন্মিয়াছিল, যাহা বভ্রু অর্থাৎ জন সাধারণের ভরণ বা রক্ষা করিতে সমর্থ, সেই সকল ওষধির একশত সাতটী ধাম অর্থাৎ একশত আয়ুঃস্থান ও সাতটী শিরঃস্থান (ওষধির অসংখ্যভেদ আছে, তন্মধ্যে এক শত সাত প্রকার ভেদ প্রধান, সেই সকল প্রভেদকে ধাম শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে) আমরা জ্ঞাত আছি।

কি বুঝিলেন ? এই একটী মাত্র মন্ত্রে যে শত শত বৈদ্যক-বীজ লুক্কায়িত আছে—তাহা কিছু বুঝিতে পারিলেন ? না আমাদিগকে বলিতে হইবে ? উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্যের অভ্যন্তরে যে আয়ুর্ব্বেদীয় উদ্ভিদ্ বিদ্যার প্রথম সোপান লুক্কায়িত আছে, ঐ মন্ত্রের মধ্যে যে ওষধির জাতিভেদ, তাহাদের অসংখ্যতা, তাহাদের ব্যাধিহর-ক্ষমতা, তাহাদের সহিত গ্রীষ্মাদি ঋতুর সম্বন্ধ থাকা বর্ণিত হইয়াছে, বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ পাঠক তাহা অত্যল্প অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ইহার পরেই আবার—

"উচ্ছুষ্মা ওষধীনাং গাবো গোষ্ঠাদিবেরতে।"

ইত্যাদি ক্রমে ওষধির সহিত মানব শরীরের সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে ; মানব শরীরে তাহাদের বল বা বীর্য্য প্রকাশ হয়, ইহাও উত্তমরূপে দর্শিত হইয়াছে। পুনর্ব্বার "নিষ্কৃতির্নাম বো মাতা" এতদাদিক অন্য একটী মন্ত্রের দ্বারা তাহার ব্যাধিনাশক ক্ষমতা থাকার প্রশংসা করাও হইয়াছে।

"যস্যৌষধীঃ প্রসর্পথাঙ্গমঙ্গং পরুষ্পরুঃ।"

[শুক্লযজুর ১২ অধ্যায় দেখ]

এই মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে একটী আশ্চর্য্য তথ্য লক্ষ্য হয় যে, ওষধিসকল বা ওষধির বীর্য্যসকল অঙ্গে অঙ্গে প্রসর্পিত হইয়া, পারম্পর্য্য ক্রম অবলম্বন করিয়া, স্বীয় বীর্য্যের দ্বারা রোগ হরণ করিতে সক্ষম হয়। একস্থানে ঔষধ সংযোগ করিলে শরীরের স্থানান্তরবর্ত্তী রোগ নষ্ট হয়, উদরান্তরে ঔষধ প্রয়োগ করিলে মস্তকের পীড়া পলায়ন করে, নখমূলে তৈল প্রয়োগ করিলে নেত্র-তিমির অপহৃত হয়, এ সকল আধুনিক বিধানের মূলতত্ত্ব কেবল উল্লিখিত যজুর্মন্ত্রেই পাওয়া যায়, অন্যত্র নহে।

আধুনিক বৈদ্যগ্রন্থে যে সুরাপ্রকরণ আছে, সুরাবিধান আছে,

সুরার দ্বারা রোগ হরণ হওয়ার কথা আছে, তাহার মূলসূত্র বা যৎকিঞ্চিৎ আভাস উক্ত যজুর্ব্বেদের 'অশ্বিভ্যাং পচ্যস্ব—' ইত্যাদিক ১০, ৩০, ৩১ মন্ত্রে এবং তৎপৃষ্ঠবর্ত্তী অন্যান্য কতিপয় মন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার ইতিকর্ত্তব্যতাভাগে লিখিত আছে, সাঙ্কুর ও নিরঙ্কুর ধান্য ওষধিলিপ্ত ভাণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া অশ্বিনীদেবতার উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আতপপক্ক করিতে হইবে, পরে তদ্দ্বারা হোম করিতে হইবে। যজুর্ব্রাহ্মণের পশুসংজ্ঞপন প্রকরণ দেখুন, দেখিতে পাইবেন, সেই অংশে অতি পরিষ্কাররূপে শস্ত্রবৈদ্যকের আংশিক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

"হৃদয়াস্যাগ্রেঽবদ্যত্যথ জিহ্বায়া অথ বক্ষসঃ—"

ইত্যাদি ক্রমে যজ্ঞার্থ-মারিত পশুর হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষঃ, যকৃৎ, বৃক্ক (ক্ক) দ্বয়, বামহস্ত, দুই পার্শ্ব, শ্রোণী, গুদনাল-মধ্যভাগ, বপা ও বসা * প্রভৃতি, অস্ত্রবিশেষের দ্বারা নিঃসারিত করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে বলিয়াছেন। এ সকল দেখিলে কে না বলিবে যে, যজুর্ব্বেদে শস্ত্রবৈদ্যকের বীজ লুক্কায়িত আছে! যজ্ঞার্থে মারিত পশুর বাহ্যাঙ্গ ও অভ্যন্তরাঙ্গ শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তন (তদ্রূপ কর্ত্তন করার বৈদিক নাম অবদান) পূর্ব্বক নিঃসারণ করা অভ্যস্ত হইলে শস্ত্রবৈদ্যকাধিকার আপনা হইতেই আয়ত্ত হইয়া আইসে; সুতরাং যজুর্ব্বেদের ঐ সকল অংশকে শল্যতন্ত্রের মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই বেদের আরণ্যক ব্রাহ্মণ অনুসন্ধান করিলে শস্ত্রবৈদ্যকাভিহিত শারীর-ব্যাকরণের মূলসূত্রও দেখিতে পাওয়া যাইবে। যথা—

* যকৃৎ—প্রসিদ্ধ। হৃদয়—আম্রফলাকার অংশ। বৃক্ক—উভয় কুক্ষিস্থ আমলকী ফলাকার অবয়ব বিশেষ। বপা—জীর্ণবস্ত্রাকার হৃদয় বেষ্টক পদার্থ। —বসা—মাংসস্নেহ। গুদনালমধ্যভাগ—মলবহা নাড়ী।

"যথা বৃক্ষো বনস্পতিস্তথৈব পুরুষোঽমৃষা।
তস্য লোমানি পর্ণানি ত্বগস্যোৎপাদিকা বহিঃ।
ত্বচ এবাস্য রুধিরং প্রস্যন্দি ত্বচ উৎপটঃ।
তস্মাৎ তদাতৃণাৎ প্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাৎ॥
মাংসান্যস্য শকরাণি কিনাটং স্নাব তৎ স্থিরম্।
অস্থীন্যন্তরতো দারূণি মজ্জা মজ্জোপমাকৃতা॥
যৎ বৃক্ষো বৃক্ণো রোহতি মূলান্নবতরং পুনঃ।"

* * * * * *

যজুরারণ্যকের প্রথম অধ্যায়স্থ এই সকল মন্ত্রের তাৎপর্য্য লইয়া এমন কি এখনকার বিজ্ঞবৈদ্যেরাও একটী পৃথক্ শারীর ব্যাকরণ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহাদের শিরা প্রশিরার সংস্থান জানা আবশ্যক হয়, তবে উক্ত ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ অধ্যায় দেখিলেই তৎকার্য্যে কৃতকৃত্য হইতে পারিবেন। যথা—

"য এষোঽন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ। অথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণম্॥
যদেতদন্তর্হৃদয়ে জালকমিব। অথৈনয়োরেষা সৃতিঃ সঞ্চরণীরৈষা॥
হৃদয়াদূর্দ্ধনাড়ী উচ্চরতি যথা কেশঃ সহস্রধা।। ইত্যাদি শ্লোকের পরে)
ভিন্ন এবেতাস্য হিতা নাম নাড্যোঽন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতাঃ...।" ইত্যাদি।

এই বেদের আরণ্যক ব্রাহ্মণের অষ্টমাধ্যায়ে অগ্নিস্তুতি উপলক্ষে অধিভূত অগ্নির, অধিদৈব অগ্নির ও অধ্যাত্ম অগ্নির বর্ণনা করা হইয়াছে। অধ্যাত্ম অগ্নিকে জীবদেহের নিধন, সম্বরণ ও জ্যোতিষ্ট, এই প্রকারত্রয়ের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ বলিতেছেন—

"ভ্রমদসি জ্বলদসি + + + + আর্দ্রে সন্দিপ্তমসি + প্রভূরসি জ্যোতিরসি নিধনমসি সংবর্গোঽসি প্রতিষ্ঠোঽসি।"

হে অগ্নে! তুমিই প্রাণরূপে জীবদেহের পরিচালক, আবার তুমিই বহিরিন্ধনে প্রজ্বলন রূপে প্রকাশমান। তুমি মেঘোদরে

বিদ্যুৎরূপে প্রদীপ্ত হও, তুমিই স্থাবর জঙ্গমে থাকিয়া তাহাদের প্রভু হও ও সামর্থ্য প্রদান কর। তুমিই তাহাদের জ্যোতিষ্টি কারণ, তুমিই তাহাদের নিধন কারণ, আবার তুমিই তাহাদের সংহারের হেতু এবং তুমিই তাহাদের স্থিতি কারণ।

বুদ্ধিমান্ পাঠক! ভাবিয়া দেখুন, যজুর্ব্বেদ কি বলতেছেন। যজুর্ব্বেদ কি এস্থলে উক্ত উপলক্ষে কায়-চিকিৎসার বীজ বপন করিতেছেন না? আমরা দিব্যজ্ঞানে দেখিতেছি, এই স্থানে ও এই উপলক্ষে, আমাদের সেই বেদপুরুষ ভঙ্গিক্রমে কায়াগ্নির বা অধ্যাত্ম অগ্নির সমতায় জীব দেহের স্থিতি, তাহার অভাবে জীবের নিধন, এই অলঙ্ঘ্য উপদেশ করিতেছেন; সুতরাং ইহা দ্বারা অবশ্যই বুঝিয়া লইতে হইবে যে, অধ্যাত্ম অগ্নি বা কায়াগ্নি যাহাতে অবিকৃত থাকে, তাহা করা আমাদের অতীব কর্ত্তব্য, এবং এই মূলসূত্রের অনুসরণ করিয়া অধ্যাত্ম অগ্নির বা কায়াগ্নির সাম্যবিধানার্থ বাহ্যাগ্নির এবং বাহ্য ওষধির সাহায্য লওয়া অত্যাবশ্যক। চরক মুনি যে কায়চিকিৎসা বলিয়াছেন, (কায়স্য কায়াগ্নেরধ্যাত্মাগ্নের্ব্বা বৈকৃতমাপন্নস্য চিকিৎসা বৈকৃত্যনিবারণ রূপা ক্রিয়া) তাহা অবৈদিক নহে। এই যজুর্ব্বেদেই তাহার বীজ বা সূক্ষ্ম সূত্র লুক্কায়িত ছিল। যজুর্ব্বেদে ও অন্যান্য বেদে অগ্নির যে 'তনূনপাৎ' নাম আছে, তাহার ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করিলে কায় চিকিৎসার কারণীভুত সূক্ষ্মতম তত্ত্ব আকর্ষণ করা যায়। যথা,—

তনুং ন পাতয়তি বলদানেন রক্ষতি।

যদ্বা তম্বা দেহস্য উনং হানং পাৎ পালনঞ্চ (ভাবে ক্বিপ্) যস্মাৎ।

তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নিই অধ্যাত্মরূপে জীবদেহে থাকিয়া এই ভৌতিক দেহকে কখন ঊন করিতেছে, গ্লান করিতেছে ও ক্ষরিত করিতেছে এবং কখন বা ইহাকে পালন করিতেছে, পুষ্ট করিতেছে এবং বয়ঃশেষ পর্য্যন্ত ইহাকে অবস্থিত রাখিতেছে। অগ্নির এতদ্রূপ

দুর্বোধ্যতম মহিমা যিনি জানিতে পারেন, আমাদের বিশ্বাস এই যে, অবশ্যই তিনি কায় চিকিৎসা-নামক বিজ্ঞান বিশেষের সোপান বা মূল সূত্র রচনা করিতে সমর্থ হন। অতএব কথিত প্রকারের শত শত আয়ুর্ব্বেদীয় বস্তু এই বেদে দৃষ্ট হয়, পরন্তু তত্তাবতের দুই চারিটী মাত্র স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠক সমীপে উপহার প্রদান করিলাম, অধিক আহরণ করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া এই স্থানেই উপরত হইলাম।

চরকমুনি যে বালাধিকারে, প্রসূত বালককে নালচ্ছেদের পর,

"ততো মধুসর্পিষী মন্ত্রোপমন্ত্রিতে যথাম্নায়ং প্রাশিতুমস্মৈ দদ্যাৎ।"

মধুমিশ্রিত ঘৃত পান করাইতে বলিয়াছেন, ইহা তিনি কোথা পাইলেন? আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, এই তত্ত্ব বা এই ঔষধ তিনি যজুরারণ্যকের অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের নিকট সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"অথ দধি মধু ঘৃতং সন্নীয় অনন্তর্হিতেন জাতরূপেণ প্রাশয়তি।"

(জাতকর্ম্মপ্রকরণ দেখুন)

যদি কোন পাঠক এইরূপ বিশেষ বিশেষ বা নামগ্রাহী ঔষধ-দেখিতে বা জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন বেদ মন্ত্রগুলি মনোযোগ দিয়া অধ্যয়ন করেন, করিলে অবশ্যই তাঁহাদের অভীষ্ট লাভ হইবে।

দিগ্দর্শনের নিমিত্ত, বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত, অদ্য আমরা যজুর্ব্বেদনিহিত আয়ুর্ব্বেদীয় বস্তুতত্ত্বের অত্যল্প অংশ উদ্ধৃত করিলাম; আগামী মাসের সঞ্জীবনীতে সামবেদ নিহিত আয়ুর্ব্বেদ-বীজের অংশবিশেষ দেখাইব, অনন্তর "আয়ুর্ব্বেদ কত কালের?" এই প্রশ্নের যথা সাধ্য প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা।

"কৃৎস্নো হি লোকো বুদ্ধিমতামাচার্য্যঃ"

অর্থাৎ

"সমস্ত জগৎই বুদ্ধিমানের গুরু"

ঋষিবাক্য।

আয়ুর্ব্বেদ কত কালের নামক প্রবন্ধে সমুদায় বেদে ও বেদের শাখাস্বরূপ উপনিষৎপ্রভৃতি প্রাচীনতম অনেক গ্রন্থেই আয়ুর্ব্বেদের সমুদয় অঙ্গের যে বীজভাগ পাওয়া যায়, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং এই বিষয়ে কোন পাঠকের আর সন্দেহ না থাকিতে পারে। কিন্তু বেদে বা তাহার সমকালীন কোন গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদের যে সকল বীজাংশ পাওয়া যায়, উহা কোনরূপ ধারাবাহিক প্রণালীতে লিখিত নহে; কেবল সামান্য ইঙ্গিত মাত্র। সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন গ্রন্থ বা শাস্ত্র বলা যাইতে পারে না। কাজেই তদ্দ্বারা চিকিৎসা কার্য্যেরও আনুকূল্য সম্ভবপর নহে। যে শাস্ত্র আজ সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত হইয়াও রোগ ও ওষধি-রাজ্যে মানবের প্রকৃত বা সম্পূর্ণ আধিপত্য জন্মাইতে পারিতেছে না, তাহার সামান্য ইঙ্গিতে কি হইবে? উক্ত সামান্য ইঙ্গিতই বা কোথা হইতে আসিল, কেই বা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা, ঐ ইঙ্গিত-পরম্পরা হইতে কোন্ কৌশলেই বা এই বিশ্ব-ব্যাপক শাস্ত্রের উদ্ভব হইল, আয়ুর্ব্বেদ-জিজ্ঞাসু মাত্রেরই এই রহস্য জানিবার কৌতূহল জন্মিতে পারে। কেবল চিকিৎসা শাস্ত্র কেন, যে কোন বিষয়ই কেন না হউক, মানবের সেই অন্ধকার-ময় আদিম অবস্থা হইতে

বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিলে সকলের হৃদয় বিস্ময়-রসে প্লাবিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রের যে বিষয় আজ একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশুও সহজ বলিয়া বোধ করিতেছে, প্রথমাবস্থায় তাহা একেবারে অজ্ঞাত ছিল। আজ যাহা সামান্য আবিষ্কার বলিয়া বোধ হয়, তাহাতেও এক সময়ে মানব-বুদ্ধি চমকিত হইয়াছিল, জয়নাদে গগন বিদীর্ণ হইয়াছিল। চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ সকল এক দিনের এক মাসের বা এক বৎসরের সংগ্রহ নহে। কত যুগযুগান্তর অতীত হইয়াছে; বহু দর্শন, বহু চিন্তা ও বহু পরীক্ষায় কত মানবের জীবন ব্যয়িত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? এক ব্যক্তি কোন বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র প্রাপ্ত হইলেন, সেই ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সেই বিষয়ের উপদেশ দিলেন, তিনি আবার অপর ব্যক্তিকে উপদেশ দিলেন, এইরূপ উপদেশ-পরম্পরা ক্রমে শাস্ত্র-মাত্রেরই শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে, পরন্তু এই পরম্পরিত শিক্ষা আয়ুর্ব্বেদে কি ভাবে চলিতেছে এবং অজ্ঞ মানব কিরূপে প্রকৃতির রহস্য ভেদ করিয়া, আয়ুর্ব্বেদীয় ভাব-সমূহ সংগ্রহ করিল, তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য। বেদের সময়ে, পুরাণের সময়ে এবং তন্ত্রের সময়ে, আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা-গত কোন পার্থক্য ছিল কি না, হিন্দুগণ জ্ঞানের ক্রম-বিকাশের সহিত তাঁহাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, এই প্রস্তাবে আমরা তাহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন, অথবা শিক্ষা প্রদান করেন, তাঁহাদের শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ, প্রকৃত শাস্ত্রের দিকে কতদূর লক্ষ্য এই সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ও এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। শিক্ষাবিষয়ক আলোচনার ফল কি ইহা পাঠক স্বয়ংই বুঝিয়া লইবেন।

শিক্ষা বলিলে কি বুঝায়, এবং শিক্ষার গুণ কি ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন, কেননা শিক্ষার স্রোতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে

বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং শিক্ষার প্রভাবও সাধারণে অবগত হইতেছেন। পরন্তু শিক্ষার সহিত চিকিৎসার যে অনেক অংশে সাদৃশ্য বা সাম্য আছে,ইহা হয় ত সাধারণে না জানিতেও পারেন। অতএব আমরা প্রস্তাবের প্রারম্ভে উক্ত সাম্য প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

চিকিৎসার যেমন চিকিৎসক, ঔষধদ্রব্য, পরিচারক ও রোগী এই চারিটী পাদ বা অঙ্গ বলিয়া গণ্য ; এই কারণে চিকিৎসাকে চতুষ্পাদ (১) বা চতুরঙ্গ বলে ; শিক্ষারও তেমন শিক্ষক, গ্রন্থ, অভিভাবক (২) ও শিষ্য এই চারিটীকে পাদ বা অঙ্গ বলা যাইতে পারে। কেন না উহাদের কোনটীর অভাবে চিকিৎসা বা শিক্ষা চলিতে পারে না। এবং উহাদের গুণদোষের উপর চিকিৎসা বা শিক্ষার উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করে। চিকিৎসাপাদের সহিত শিক্ষাপাদের নিম্নলিখিত সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা যাইতে পারে।

(১) ভিষগ্ দ্রব্যাণ্যুপস্থাতা রোগী পাদ-চতুষ্টয়ম্।
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারব্যুপশান্তয়ে ॥

চরক।

পাদ শব্দের অর্থ চতুর্থাংশ। যেমন কোন বস্তু চতুর্থাংশ হীন হইলে, তাহার পূর্ণতা থাকে না, অঙ্গ-ভঙ্গ-দোষ ঘটে। সুতরাং তাদৃশ বস্তু দ্বারা প্রকৃত কার্য্য সম্পাদনের সম্পূর্ণ আশা করা যায় না। তদ্রূপ চিকিৎসক প্রভৃতির একতম অঙ্গ বিহীন হইলেও, চিকিৎসা সম্পন্ন বা সুচারু নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়েই মহর্ষিগণ পাদ শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

(২) কেহ কেহ বলিতে পারেন অভিভাবক বা নেতা বালকেরই আবশ্যক, বয়ঃপ্রাপ্ত বা জ্ঞানবানের শিক্ষায় অভিভাবক কেন ? ইহার উত্তর এই যে, অভিভাবক বা নেতার আবশ্যকতা নাই এমন কথা হইতে পারে না। তবে বিনা জ্ঞানপ্রাপ্ত বয়সে নিজেই নিজের অভিভাবক।

চিকিৎসাপাদ।

(৩) চিকিৎসক—শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ, দৃষ্টকর্ম্মা, স্বয়ংকৃতী, ক্ষিপ্রহস্ত, শুচি, শূর, চিকিৎসোপযোগী-সজ্জা ও উপকরণযুক্ত, প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান্, উদ্যমশীল, বিশারদ, সত্য-ধর্ম্মপরায়ণ।

(৪) ঔষধ—প্রশস্তদেশসম্ভূত, প্রশস্ত-দিনোদ্ধৃত, মাত্রোচিত, মনোহারী, গন্ধবর্ণরসান্বিত, দোষঘ্ন, অগ্লানিকর, বিপর্য্যয়ে অবিকারী।

(৫) পরিচারক—স্নেহবান্, অনিন্দুক, বলবান, রোগি-রক্ষণতৎপর, বৈদ্যবাক্য-প্রতিপালক, শ্রমশীল।

(৬) রোগী—আয়ুষ্মান্, ক্লেশ-সহিষ্ণু, সাধ্য, দ্রব্যবান্ নির্লোভ, আস্তিক, বৈদ্যবাক্যস্থ।

শিক্ষাপাদ।

শিক্ষক—শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ, দৃষ্ট-কর্ম্মা, অভিজ্ঞ, ক্ষিপ্রকর্ম্মা, শুচি, শূর, শিক্ষোপযোগী উপকরণ-সম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্ন-মতি, বুদ্ধিমান্, উদ্যমশীল, বিশারদ, সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ।

গ্রন্থ——সুলেখনী-প্রসূত, সু-সময়-লিখিত, শিষ্যের ধারণযোগ্য, মনোহারী, রসভাবাদি-গুণ-সমন্বিত, চরিত্র-সংশোধক, সন্তোষদায়ক, অনপকারী।

অভিভাবক—স্নেহবান্, অনিন্দুক, বল-বান্, ছাত্রশাসনপটু, শিক্ষক-বাক্যানুসারী, শ্রমশীল।

শিষ্য——আয়ুষ্মান, ক্লেশসহিষ্ণু, উপদেশ-গ্রহণ-ক্ষম, গ্রন্থো-পকরণ-সম্পন্ন, নির্লোভ, আস্তিক, শিক্ষকাদেশানুগ।

---

(৩) তত্ত্বাধিগতশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্মা স্বয়ংকৃতী।
লঘুহস্তঃ শুচিঃ শূরঃ সজ্জোপস্কর-ভেষজঃ॥
প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্ ব্যবসায়ী বিশারদঃ।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ স ভিষক্ পাদ উচ্যতে॥

(৪) প্রশস্তদেশসম্ভূতং প্রশস্তেঽহনি চোদ্ধৃতম্।
যুক্তমাত্রং মনস্কান্তং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্॥
দোষঘ্নমগ্লানিকরমবিকারি বিপর্য্যয়ে।
সমীক্ষ্য দত্তং কালে চ ভেষজং পাদ উচ্যতে॥

(৫) স্নিগ্ধোঽজুগুপ্সুর্বলবান্ যুক্তো ব্যাধিতরক্ষণে।
বৈদ্যবাক্য-কৃদশ্রান্তঃ পাদঃ পরিচরঃ স্মৃতঃ॥

(৬) আয়ুষ্মান্ সত্ত্ববান্ সাধ্যো দ্রব্যবানাত্মবানপি।
আস্তিকো বৈদ্যবাক্যস্থো ব্যাধিতঃ পাদ উচ্যতে॥ সুশ্রুত।

রোগীর রোগমোচন করিয়া সুনির্ম্মল স্বাস্থ্য সুখ বিতরণ বা তাহার পথ প্রদর্শন করা যেমন চিকিৎসকের কার্য্য ; শিষ্যের মনো-মালিন্য দূর করিয়া প্রকৃত জ্ঞানালোক বিতরণ বা তাহার দ্বার উন্মোচন করিয়া দেওয়া শিক্ষকের তেমন কর্ত্তব্য। রোগ পরীক্ষার জন্য রোগীর বাহ্য ও আভ্যন্তর দেশ তন্ন তন্ন ভাবে পরীক্ষা করা যেমন চিকিৎসকের কর্ত্তব্য ; শিষ্যের অন্তঃকরণ কিরূপ মল বা কুসংস্কার ইত্যাদিতে আচ্ছন্ন, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বাহ্য গঠনের সহিত তাহার মানসিক বৃত্তি-নিচয় তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করাও শিক্ষকের তেমনই কর্ত্তব্য। রোগীর প্রকৃতি, বয়স ইত্যাদির সহিত দেশকাল প্রভৃতির সামঞ্জস্য রাখিয়া মাত্রোচিত ঔষধ প্রয়োগ করা যেমন চিকিৎসকের কার্য্য ; শিষ্যেরও মানসিক প্রকৃতি— মনের গঠন কিরূপ, কোন্ বৃত্তি প্রবল, কোন্ বৃত্তি অপ্রবল, মেধা কেমন, বুদ্ধি কেমন, মনের স্বাভাবিক আসক্তি কোন্ দিকে, কোন্ বিষয় শিক্ষায় সমধিক ফলোপধায়ক হইতে পারে ইত্যাদি মনের স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা বা গতি বয়স্ প্রভৃতি বিচার করিয়া দেশ কাল ইত্যাদি বিবেচনা পূর্ব্বক যথোচিত শিক্ষা প্রদান করা তেমন শিক্ষ-কের কর্ত্তব্য। নতুবা শিক্ষা সুসিদ্ধ বা সুফলপ্রদ হইতে পারে না। রুগ্ন, ভগ্ন ও জীর্ণদেহ সংস্কার এবং মুমূর্ষু জীবনের পুনরানয়ন রূপ উৎকট কার্য্য সাধন করেন বলিয়া চিকিৎসক যেমন জীবন দাতা পিতা, অজ্ঞান-তিমিরান্ধ বিমূঢ় ব্যক্তির আত্মসংস্কার এবং জ্ঞানালোক প্রদান করেন বলিয়া শিক্ষক তেমন জ্ঞানদাতা পিতা। কটু তিক্ত প্রভৃতি ঔষধ রোগীর রুচিকর হয় না বলিয়া চিকিৎসককে সময়ে সময়ে যেমন সুখপেয় কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় ; আপাত অপ্রীতি-কর দুর্গম ও জটিল বিষয় সকল অরুচিকর ও অপ্রবেশ্য হয় বলিয়া শিক্ষককেও সময়ে সময়ে গল্প, উপন্যাস ও রূপক প্রভৃতি নানাবিধ কল্পনার তেমন আশ্রয় লইতে হয়। ফলতঃ চিকিৎসা যেমন দুরূহ,

শিক্ষকতাও তেমনই দুরূহ। এই কারণে প্রকৃত চিকিৎসক যেমন দুর্লভ, প্রকৃত শিক্ষকও তেমনই দুর্লভ। এইরূপ শিক্ষক দুর্লভ বলিয়া ভারতের কোন শিক্ষাকুশল ও নীতিনিপুণ কবি বলেন—

"বিষমোঽপি বিগাহ্যতে নয়ঃ কৃততীর্থঃ পয়সামিবাশয়ঃ।
স তু তত্র বিশেষদুর্লভঃ সদুপন্যস্যতি কৃত্য-বর্ত্ম যঃ॥"

অর্থাৎ "যেমন জলাশয় দুরবরোহ হইলেও কেহ যদি সোপান করিয়া দেন. তবে তাহাতে অবগাহন করা যাইতে পারে; তেমন শাস্ত্র দুর্ব্বোধ হইলেও কেহ যদি সোপান অর্থাৎ শিক্ষা পদ্ধতি করিয়া দেন, তবে তাহাতে প্রবেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু সুন্দর সোপান প্রস্তুত করিয়া দেওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়াই ভার।"

চিকিৎসার সহিত শিক্ষার এইরূপ অনেক সাদৃশ্য প্রদর্শন করা যাইতে পারে। আমরা তাহার কিয়দংশ মাত্র দেখাইলাম। এই রূপ সাদৃশ্যপ্রসঙ্গের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা চিকিৎসার্থী বা চিকিৎসার উৎকর্ষাভিলাষী তাঁহাদের যেমন চিকিৎসক, ঔষধ, রোগী ও পরিচারক এই চারিটীর প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, এই চারিটীর উৎকর্ষবিধানে যত্নশীল হওয়া উচিত। তেমন যাঁহারা শিক্ষার্থী বা শিক্ষার উন্নতি-কামী তাঁহাদেরও শিক্ষক. শিষ্য প্রভৃতি চারিটী অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইহাদের একের দ্বারা কখনও শিক্ষার উন্নতি হইতে পারে না। যে কার্য্য পরস্পর যোগ-সাপেক্ষ, সে কার্য্যের প্রত্যেক অঙ্গের বল বা গুণ কত বিচার করা কর্ত্তব্য। যে আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা প্রসঙ্গে আমরা এই সকল কথা উত্থাপন করিলাম, বলিতে গেলে উহার শিক্ষার সমস্ত অঙ্গেরই অভাব। সেই সমস্ত অভাব মোচন না করিয়া যাহারা কেবল উন্নতি উন্নতি শব্দ লইয়া ব্যাকুল হন; তাঁহাদের দ্বারা কোন কালেও চিকিৎসা শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারিবে না। যাহা হউক

এক্ষণে আনুষঙ্গিক কথা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত বিষয়ের সূত্রপাত করা যাউক।

যাঁহারা বেদকে নিত্য, অপৌরুষেয় বা ঈশ্বর-বৎ স্বতঃসিদ্ধ বলেন, ভগবান্ কমল-যোনির মুখ কমল-বিনিঃসৃত বেদবাক্যকে যাঁহারা সমুদয় বিদ্যার আকর, সকল জ্ঞানের প্রস্রবণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তির মীমাংসাবিষয়ে কোন গোলই নাই। আদিশরীরী ব্রহ্মা মানবসৃষ্টির পূর্ব্বে মানবের অভাব মোচনের অন্যান্য উপকরণ সকল যেমন সৃষ্টি করিলেন, অমনি স্বয়ংসিদ্ধ বেদও তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া মানবের রোগ-মোচনের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশ অনুসারে তিনি বিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহার নিকট সেই আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন(৭), ইন্দ্র প্রজাপতির নিকটে শিক্ষা করিলেন, এইরূপ শিষ্যপরম্পরায় আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষাও চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং যেমন এক কথায় প্রশ্ন, তেমন এক কথায় উত্তর হইয়া গেল।

পরন্তু যাঁহারা বেদকে পৌরুষেয় বলেন, মনুষ্যপরম্পরার জ্ঞান বা বাক্য রাশির সংগ্রহ মনে করেন, তাঁহাদেব মতে মীমাংসার বড়ই গোল ও মতভেদ। 'পক্ষী অণ্ডজ কি অণ্ড পক্ষিজ' ইত্যাদি বিচারচক্রের ন্যায়, অনন্ত তর্কের অনন্ত ভ্রমণে ঘুরিতে হয়। ঘুরিতে হইলেও এই শ্রেণীর লোকের আত্মাবলম্বন কিছু বেশী। 'আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ' ইত্যাদি বাক্যের অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ইহাঁরা হেতুবাদে নিরস্ত বা

(৭) বিধাতাঽথর্ব্বসর্ব্বস্বমায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়ন্।
স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে লক্ষশ্লোকময়ীমৃজুম্॥
ততঃ প্রজাপতিং দক্ষং দক্ষং সকলকর্ম্মসু।
বিধির্ধীনীরধিং সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমুপাদিশৎ॥ ভাবপ্রকাশ।

অভিনব জ্ঞানসংগ্রহে পরাঙ্মুখ হন না। পূর্ব্বাপর যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ধ্রুব এবং অকাট্য বলিয়া সিদ্ধান্তও করেন না। দৈবাবলম্বী বা অদৃষ্টবাদি-গণের ন্যায় কোনবিষয়েই নিতান্ত হতাশ হন না, ইহাঁরা জ্ঞানসংগ্রহ নিজের আয়ত্ত ও জীবনের মুখ্যব্রত ভাবিয়া জ্ঞানানলে আহুতি প্রদান করিতেও প্রস্তুত। সুতরাং আদি কাল হইতে এই শ্রেণীর লোকের শিক্ষাও ভিন্নরূপ। ইহাঁরা ঈশ্বর প্রণীত কোন গ্রন্থ স্বীকার করেন না; এবং মানবের লিখিত কোন গ্রন্থের পাঠসমাপ্তিকে শিক্ষার সীমা বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন না। ইহাদের মতে শিক্ষা অসীম, প্রকৃতি শিক্ষাগ্রন্থ বা শিক্ষক, নিজেরাই শিষ্য বা অভিভাবক। ইহাঁরা আত্মাকে শিষ্য ও অভি-ভাবকস্থানীয় জ্ঞান করিয়া বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে প্রকৃতিদেবীর নিকট প্রকৃত জ্ঞানোপার্জ্জন আরম্ভ করেন। এবং প্রকৃতিকেই সকল জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী বা আদি-গুরু বলিয়া মানেন। ইহাঁদের সিদ্ধান্তে আয়ুর্ব্বেদেরও আদি গুরু প্রকৃতি। প্রাকৃতিক পদার্থ বা প্রাকৃতিক ঘটনা হইতে আবশ্যকতা বা অভাবের তাড়নায় মানুষ আপনা হইতেই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছেন।

ইহাঁরা বলেন যে, কোন্ সূত্রে বা কোন্ পন্থায় আদিশিক্ষা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত চিত্র যদিও আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করার কোন আদর্শ নাই। "আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।" ভাবিলেই আমরা একেবারে আকুল হইয়া পড়ি,যদিও সেই তমোময় অবস্থার সহিত তুলনা করিলে আজ কোটী সূর্য্যের উদয় দেখিতে পাই বটে; সুতরাং সে যুগের সহিত এ যুগের তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু বাহ্য প্রকৃতি ও আমাদের আভ্যন্তরিক প্রকৃতির বিষয় চিন্তা করিলে, বোধ হয় আমরা আয়ুর্ব্বেদের আদি শিক্ষার কিঞ্চিৎ উন্নয়ন করিতে পারি। শ্রীজ—

[ক্রমশঃ]

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উপযোগিতা।

কালের ভীষণ ভেরী প্রকৃতির প্রতি প্রান্তে প্রতিনিয়তই বজ্রগম্ভীর-নির্ঘোষে পরিকীর্ত্তন করিতেছে—"চির দিন সমান না যায়।" হায়! সেই এক দিন আর এই এক দিন! যখন আমরা বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, দর্শন, সংহিতা, জ্যোতিষ, কাব্য, সাহিত্যপ্রভৃতি পাঠ করিয়া জগতের সর্ব্বাদিম সভ্য, অষ্টাদশ বিদ্যার খনি ভারতের সেই পবিত্রতম চিত্র—অত্যুদার ভাব হৃদয়ে অঙ্কিত করি, তখন এমন পাষণ্ড কে আছে, যাহার অন্তঃকরণ অননুভূতপূর্ব্ব ভাবরসে—স্বর্গীয় পূতরসে বিগলিত না হয়। সেই সরস্বতী-তীরে ঋষিগণের সপ্তমস্বরে বেদগান, সেই পুণ্য তপোবনে বৈদিক যজ্ঞ, সেই সভ্যতা, সরলতা, ধর্ম্মের পূর্ণ বিস্তার, সেই স্বর্গীয় শান্তির পূর্ণ আবির্ভাব, সেই রাজসিংহাসনে সমাসীন সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত পিতৃতুল্য নরপতি, সেই চারিদিকে দেবভাষার প্রতিধ্বনি, সেই মনীষি-গণের বহু চিন্তার ফলস্বরূপ—বহু মস্তিষ্ক-ক্ষয়ের চিহ্নস্বরূপ সামাজিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিধান সমূহ, সেই সামান্য কর দানে প্রজাপুঞ্জের সুখ-সমৃদ্ধি, সেই জাহ্নবী, যমুনা, শতদ্রু, সিন্ধুলহরীর কল কল নিনাদের সহিত মিলিত প্রকৃতি পুঞ্জের আনন্দধ্বনি, যখন স্মৃতিপথে উদিত হয়; আবার যখন চিন্তা করিয়া দেখি সমাজবদ্ধ প্রত্যেক বর্ণ নির্দ্ধারিত কার্য্য সাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে—সমুদয় বর্ণই আয়ুর্ব্বেদচিকিৎসাশাস্ত্রের সহায়তায় ভারতের প্রতি প্রান্তে শান্তিসুখ উপভোগ করিতেছে। হায়! সেই এক দিন আর ঊনবিংশ শতাব্দীর এই এক দিন! সেই ভারত, আর এই এ ভারত! জগতের শিক্ষাদাতা দীক্ষাগুরু ভারত, আজি ম্লেচ্ছের পদতলে সমাসীন। অনন্ত ধনে

ধনী ভারত আজি ক্ষুদ্র দ্বীপের নিকট ভিক্ষার্থী! নিদাঘের দীপ্ত দিনমণি আজি জলদজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া, খদ্যোতের নিকট আলোক-প্রত্যাশী! স্বাধীনতার জন্মভূমি ভারতের গলে আজি পরাধীনতার কালকূটময় বিষম নিগড়! এমন একদিন ছিল, যেদিন আর্য্যগণ ম্লেচ্ছের ছায়া স্পর্শ করিলেও আপনাদিগকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন, ম্লেচ্ছের সংসর্গে আপনাদিগকে প্রায়শ্চিত্তার্হ মনে করিতেন, কিন্তু হায়! "তে হি নো দিবসা গতাঃ।" সে দিনও নাই, সে ভাবও নাই। এখন ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, অশন, বসনপ্রভৃতি সকল বিষয়েই ম্লেচ্ছ আমাদিগের আদর্শস্থল! এমন কি কাহারও নাম যদি রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় থাকে, তাঁহাকে মিষ্টার্ আর, সি, বনার্জ্জি না বলিলে, তিনি আপনাকে মহা অপমানিত জ্ঞান করেন। "রাজা যচ্ছীলঃ প্রকৃতয়স্তচ্ছীলা ভবন্তি।" রাজার অনুকরণ করিতে প্রকৃতিবর্গ স্বতঃই বাধ্য হয় বটে, কিন্তু যাহা ভাল, যাহার অনুকরণ বা অনুশীলনে ব্যক্তিগত, জাতিগত বা ...জগত মঙ্গল-সম্ভাবনা, সে অনুকরণ অবশ্যই প্রার্থনীয়, কিন্তু যাহা আমাদিগের প্রকৃতির অনুকূল নহে, স্বভাবের অনুমোদিত নহে, বাহ্যদৃশ্যে তাহা শোভনীয় হইলেও, অগ্নিদর্শী পতঙ্গের ন্যায়, তাহাতে আত্মাহুতি দান করা, তাহার অনুকরণ করা, এই বিজিত দেশের পতিত জাতির বিষম রোগ হইয়া পড়িয়াছে। কাল-মাহাত্ম্যে আমাদিগের পবিত্র আর্য্যধর্ম্ম, প্রাচীন আচার, ব্যবহার, স্মরণাতীত কালের চিকিৎসা প্রণালী আমাদিগের উপযোগী কিনা, ইংরাজি শিক্ষিত অনেকেরই মনে তাহা সন্দেহাত্মক বলিয়া বোধ হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবল তরঙ্গে ভাসমান ইংরাজি শিক্ষিত যুবকগণ অধুনা জাতীয় ধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আন্দোলনানল প্রজ্বলিত করিতেছেন, কিন্তু প্রাণরক্ষার প্রথম সহচর অতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ভারতবাসি-গণের পক্ষে কতদূর, উপযোগী

সে বিষয়ে অতি অল্পলোকই চিন্তা করেন, অতি অল্পলোকই তাহা সমালোচনা করিয়া থাকেন। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালী আমাদিগের পক্ষে কতদূর উপযোগী বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাহাই সমালোচিত হইবে। বিষয়টী কত দূর প্রয়োজনীয় কতদূর গুরুতর, ভাবুক তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম।

এই সসাগরা ধরা একটী প্রকাণ্ড পদার্থ, পরমকরুণাময় পরমেশ্বর অসীম অনন্ত অজ্ঞেয় সৃষ্টিশক্তি-বলে সেই একটি মাত্র বিরাট্ পদার্থের সমগ্র অঙ্গটী একভাবে গঠিত করেন নাই। প্রাকৃতিক অবস্থাভেদে চারিটি মহাদেশের মধ্যস্থ এক একটি প্রদেশ বিভিন্নরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কোন একপ্রদেশের সহিত ভিন্ন প্রদেশের তুল্যতা পরিদৃষ্ট হয় না। জগতের অগণিত নরনারী যেরূপ প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি-ধারী, যেমন দুইটী মনুষ্য অবিকল এক-আকৃতি-বিশিষ্ট দেখা যায় না, সেই মত প্রত্যেক প্রদেশও পরস্পর বিভিন্ন। প্রাকৃতিক অবস্থাই এই বিভিন্নতার কারণ। প্রকৃতির বিচিত্রতা সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। কোনদেশ গ্রীষ্ম-প্রধান, কোনদেশ শীত-প্রধান, কোনটীতে পর্য্যায়-ক্রমে ছয় ঋতুর আবির্ভাব হয়, কোথায়ও শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষামাত্র পর্য্যায়ক্রমে দেখা দেয়, কোথায়ও কেবল নিরবচ্ছিন্ন শীত দৃষ্ট হয়, কোথায়ও বা দুইটী মাত্র ঋতু দর্শন দান করে। একমাত্র ঐ প্রাকৃতিক কারণেই আমরা এ জগতের প্রত্যেক প্রান্তের মূর্ত্তি বিভিন্ন দেখিতে পাই। যাহারা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থাভেদে যেমন দেশ সমূহের অবস্থা বিভিন্ন, সেইমত ভিন্ন ভিন্ন দেশসমূহের মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা বিভিন্ন রূপে সৃষ্ট। যদিও বিভিন্ন দেশের মনুষ্য গণের মনুষ্যত্ব এক ই, তথাপি বিভিন্ন দেশের মানব শ্রেণীর অবান্তর ধর্ম্ম বা মধ্য-

গত ভাব দেশভেদসূত্রে অনেকাংশে ভিন্ন ভাবাপন্ন। এই বিভিন্নতার জন্যই কোন দেশের লোক গৌরাঙ্গ, কোন দেশের লোক ঘোর কৃষ্ণাঙ্গ, কোন দেশের লোকদিগের বর্ণ গৌর, শ্যাম, কৃষ্ণ, কোন দেশের মানব দীর্ঘাবয়ব, কোন দেশের লোক খর্ব্ব, কোন দেশের লোক সবল, কোন দেশের লোক দুর্ব্বল, কোন দেশের লোক শ্রমশীল, কোন দেশের লোক অলস, কোন দেশের লোক ভীরু, কোন দেশের লোক অসমসাহসী, কোন দেশের লোক দীর্ঘজীবী, কোন দেশের লোক অল্পায়ুঃ। যখন দেশ-ভেদে বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট, বিভিন্ন শারীরিক ধর্ম্ম বিশিষ্ট, বিভিন্ন প্রকার মানব সমাজ দেখিতে পাইতেছি, তখন তত্ত্বদর্শিগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, সেই বিভিন্ন দেশবাসী মানব সমাজের আহার, আচার, এবং ব্যবহার প্রভৃতি অবশ্যই বিভিন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে যাইলেই অমঙ্গল আসিয়া দেখা দেয়। প্রকৃতির অনুকূলগামী আচার, ব্যবহার, অশন, বসন, প্রভৃতি বিশ্বজনীন মঙ্গলসাধনের মূল।

এইরূপ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থা দর্শনে দেশ ভেদে আহার আচার প্রভৃতি যেরূপ বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক, চিকিৎসা প্রণালী এবং ঔষধ ভেদও সেইরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। কেননা, একদেশের মানবপ্রকৃতিতে যে ঔষধ বা যে আচার প্রভৃতি উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, অন্য দেশের অন্যরূপ মানব প্রকৃতির পক্ষে তাহা কখনও অনুকূল হইতে পারে না। যাঁহারা এ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না, তাঁহারা প্রকৃতিতত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এবং যাঁহারা জানিয়া শুনিয়া বিভিন্নকেন্দ্রস্থিত বিভিন্নপ্রকৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন শারীরিক অবস্থাপন্ন দুইটি বিভিন্ন জাতিকে একদেশ-প্রচলিতচিকিৎসা প্রণালীমত একবিধ ঔষধে নীরোগ করিতে চাহেন, আমরা বলি তাঁহারা প্রকৃতির শত্রু এবং প্রকৃতির

বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া এ জগতে কেবল অমঙ্গলের জন্মদান করিতেছেন। শীত প্রধান প্রদেশের চিকিৎসা প্রণালী—ঔষধাবলী সেই দেশের লোকদিগের শারীরিক প্রাকৃতিক অবস্থামত আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং তৎসমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশের বিভিন্ন শারীরিক এবং প্রাকৃতিক অবস্থাপন্ন রোগীর প্রতি কি সমান গুণ প্রকাশ করিতে পারে?—না তাহা উপযোগী? একজন অসিদ্ধ-মাংসভোজী, নিয়তমদ্যপায়ী, সবলকায় শীতপ্রধানদেশবাসী রোগীকে চিকিৎসা করিবার জন্য, যে পর্য্যায়ের যে মাত্রায় যে ঔষধ প্রদান করা যায়, এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের নিরামিষাশী দুর্ব্বলদেহ ক্ষীণপ্রাণ ব্যক্তি কি সেই তীব্র ঔষধ সেবনের উপযুক্ত পাত্র? যাহা যে দেশের উপযোগি-রূপে দৃষ্ট, তাহা ভিন্ন দেশে প্রচলন করা অমঙ্গলের বীজ রোপণ ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

যদিও কোন কোন রোগে ভিন্নদেশ প্রচলিত ঔষধ অন্যত্র উপকার প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু সেই উপকারসূত্রে রোগীর পরিণামে অনিষ্ট সাধিত হয়। সেঅনিষ্ট কি? তাহা সাধারণে অনুভব করিতে সমর্থ নহে। আজি কালি আমাদের দেশে অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি যে অল্প বয়সে জীবনলীলা সমাপণ করিতেছেন, ইহা লইয়া মহান্ কোলাহল এবং তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, ভাবিয়া দেখিলে চিরাভ্যস্ত আচার, ব্যবহার ও চিকিৎসার বিপর্য্যয় ঘটাই ঐরূপ অকাল মৃত্যুর যে একটি কারণ, তাহা নিঃসন্দেহ বলিয়া বোধ হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা কর, প্রায় সকলেই বলিবেন; তাহার পিতা বা পতামহ প্রচুর আহারক্ষম ছিলেন, যথেষ্ট বল ধারণ করিতেন অনেকদিন জীবিতও ছিলেন, এমন বৃদ্ধ এখন ও অনেক দেখা যায়, যাহাদের জন্মাবচ্ছিন্নে কখন কোন রোগ হয় নাই সুতরাং কখন ঔষধ সেবনও আবশ্যক হয় নাই। আজ

তাহাদের সন্তানগণ নানাবিধ নূতন রোগের লীলাক্ষেত্র হইয়াছে। যে সমস্ত বিজাতীয় চিকিৎসক বা তাঁহাদের শিষ্যগণ সচরাচর চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই হিম প্রধান দেশের সহিত প্রায় তুল্যজ্ঞানে এদেশীয় লোকের চিকিৎসা আরম্ভ করেন; এদেশীয় লোকের বাহ্য গঠনের ন্যায় আভ্যন্তরিক প্রকৃতি, সত্ব ও অগ্নিবল প্রভৃতি যে ভিন্ন ইহা তাঁহাদের মধ্যে অল্প লোকই চিন্তা করিয়া থাকেন। জ্বরে রোগীর পরিপাক শক্তি একবারে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ক্ষুধা নাই, না থাকুক, তথাপি পুষ্টিকর আহার দাও, নতুবা বল থাকিবে না, এই বিবেচনায় মদ্য, মাংস ও ডিম্ব প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার দিয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি আহার করিতে অক্ষম হয়েন, অন্তত পিচকারীযোগে বলপূর্ব্বক আহারীয় দ্রব্য প্রয়োগ করেন। কিন্তু এমন বিবেচনা নাই যে, আহার বল পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলেই বলকারক হয় না; উহার যথারীতি পরিপাক হওয়া চাই, তাহা না হইলেই ঐ আহার রস রক্ত মাংস প্রভৃতিতে পরিণত হইতে পারে না। এইরূপে অসাময়িক এবং অনুপযোগী আহার প্রয়োগ করিলে যে অম্লপিত্ত, গ্রহণী, প্লীহা, প্রভৃতি আনীত হয় তাহা কয়জন ব্যক্তি বিবেচনা করেন। এইরূপ অনুপযোগী চিকিৎসায় যে কত নূতন রোগের সৃষ্টি হইতেছে; কত ব্যক্তি জীর্ণ, শীর্ণ, অকাল বৃদ্ধ হইয়া অসময়ে জীবন সমাপন করিতেছে, তাহা কয় ব্যক্তি চিন্তা করিয়া দেখেন।

সহস্রবর্ষ হইল, ভারতের পতন হইয়াছে। ভারতের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বিজাতীয় রাজার আধিপত্য সূত্রেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অনাদিকাল হইতে অতীত সহস্রবর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একমাত্র এই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার দ্বারাই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে অনাময় সুখ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন ভারতে নানাজাতীয় চিকিৎসা প্রণালী বিরাজমান। কিন্তু এদেশীয়

অধিবাসিগণ প্রত্যক্ষপরীক্ষা দ্বারা প্রত্যহ দেখিতেছেন যে, বিজাতীয় কোন চিকিৎসাই—ভারতীয় রোগ প্রতীকার পক্ষে সর্ব্বথা উপযোগী নহে, চিরপ্রসিদ্ধ ঢাকাই মসলিন বস্ত্রের অঙ্গরাখা প্রস্তুত করিতে হইলে অতিসূক্ষ্ম সূচ এবং সূত্র দ্বারা সীবন করিতে হয়, কিন্তু যদি কেহ গুণসূচ দ্বারা তাহা সীবন করিতে অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে আমরা সেই সীবন-কারীকে কি বলি?

(ক্রমশঃ)

আয়ুতত্ত্ব*।

নিকৃষ্টতম কীট হইতে উৎকৃষ্টতম দেবলোকপর্য্যন্ত যাহার জন্যে লালায়িত; ঋষিগণ নিষ্কাম হইয়া ও যাহার কামনায় ধ্যান-পরায়ণ, যাহার অভাবে সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব, সম্পদ্, বিপদ্ সকলই সমান; যাহার সত্তায় দেহের সত্তা, মনের অস্তিত্ব, আমার আমিত্ব ও ইন্দ্রিয়গণের স্ফূর্ত্তি; যাহা ভারতের প্রধান আশীর্ব্বাদ (দীর্ঘায়ুরস্তু, কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষমিত্যাদি) সেই আয়ু কিংস্বরূপ

---

*আমরা যখন 'আয়ুস্তত্ত্ব শীর্ষক' প্রস্তাবটী লিখিতে আরম্ভ করি, তখন, কোন ব্যক্তি উহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয়! আয়ু এই শব্দটী কিরূপে প্রয়োগ করিতেছেন? আয়ুশব্দের পরিবর্ত্তে আয়ুস্ হওয়া উচিত এই বক্তার ন্যায় সহসা কোন কোন পাঠকেরও ভ্রম উপস্থিত হইতে পারে, এ জন্য আয়ুশব্দের কথঞ্চিৎ বিবৃতি প্রদান করা অত্যাবশ্যক বোধ হইতেছে।

ব্যাকরণ অনুসারে আয়ুশব্দ ইন্ ধাতুর উত্তর উন্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হয়, কেবল ব্যাকরণ দ্বারা নিষ্পাদিত হইতে পারে বলিয়াও আমরা ইহাকে সাধুশব্দ বলিতাম না, 'বায়ুনা জগদায়ুনা' ইত্যাদি বহু শিষ্ট প্রয়োগও দেখাগিয়াছে। ফলকথা আয়ু শব্দ ইন্ ধাতুর উত্তর উণ প্রত্যয়যোগে [ইন্ × উণ্] নিষ্পন্ন হয় এবং আয়ুস শব্দ ইন্ ধাতু উস প্রত্যয়যোগে [ইন্ × উস] সিদ্ধ হয়, এই মাত্র প্রভেদ। তদ্ভিন্ন তাৎপর্য্যবিষয়ে কোনই পার্থক্য নাই। এই জন্য কর্কশ যুক্তাক্ষর 'আয়ুস্তত্ত্ব' শিরোমুকুট না দিয়া 'আয়ুতত্ত্ব' শিরোনাম দেওয়া হইল।

ও কতকাল স্থায়ী ইত্যাদি বিষয় এই প্রবন্ধের আলোচ্য, বিষয়টী অতি সন্দিগ্ধ, সন্দিগ্ধ বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসকসম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মত। ভিন্ন ভিন্ন মত বলিয়াই চিকিৎসার ভিত্তিও ভিন্ন ভিন্ন। যাঁহারা শোণিতকে আয়ু বলেন, তাহাদের দৃষ্টি শোণিতের দিকেই। যাঁহারা দেহের তাপকে আয়ু বলেন, তাহাদের চিকিৎসা তাপের দিকেই প্রবর্ত্তিত। যাহারা বলকে আয়ু বলেন, তাহারা বলরক্ষার্থেই যত্নশীল।

আয়ু-সম্বন্ধে এইরূপ নানা প্রকার মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, "সমস্তানামিন্দ্রিয়াণাং তুষজ্বালাবৎ যুগপদুত্থিতা জীবন শব্দবাচ্যবৃত্তি রস্তি। তস্যা এব প্রাণাদিলক্ষণা পঞ্চতয়ী ক্রিয়া।" জীবনশব্দে শব্দিত আয়ু ইন্দ্রিয় সমষ্টির এক অসাধারণ ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই অত্যাল্প কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ :—

শরীরস্থ ইন্দ্রিয়গণ শরীরে দ্বিবিধ কার্য্য করিতেছে। বাহ্য কার্য্য ও আন্তর কার্য্য ; রূপাদি গ্রহণ করা তাহাদের বাহ্য কার্য্য এবং শরীর সংঘাত অক্ষত রাখা তাহাদের আন্তর কার্য্য। অপিচ, এক এক ইন্দ্রিয় এক একটি অসাধারণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতেছে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় মিলিত হইয়া অন্য একটী সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহিত করিতেছে। বহির্বস্তু ও তন্নিষ্ঠ রূপাদি নির্ণয় করা তাহাদের যথাক্রমে অসাধারণ কার্য্য এবং শরীর সংঘাত স্থিরভাবে রাখা, জীবন অবস্থাপিত রাখা, তাহাদের সাধারণ কার্য্য। সমস্ত ইন্দ্রিয় মিলিত হইয়া একটী ব্যাপক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে বলিয়া শাস্ত্রকারেরা সেই ব্যাপক ক্রিয়াকে এই সাধারণ নাম দিয়াছেন। বহুতুষ (ধান্যের ত্বক) একত্রিত হইয়া যেমন এক স্বতন্ত্র ব্যাপক প্রবল বহ্নিজ্বালা উত্থাপিত করে, তদ্রূপ, সমস্ত ইন্দ্রিয় মিলিত হইয়া সংঘাত রক্ষক ক্রিয়াবিশেষ নির্ব্বাহ করে। সেই বিশিষ্ট ক্রিয়া যতক্ষণ চলিবে, ততক্ষণই জীবন।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদ কত কালের ?

"আয়ুর্ব্বেদ কত কালের ?" এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সংগ্রহের জন্য আমরা ঋক্, যজু, ও অথর্ব্ব,—এই তিন বেদ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছে, তিন বেদেই আয়ুর্ব্বেদীয় বিবিধ বস্তু আছে। এবার সামবেদ অনুসন্ধান করিলাম; দেখিলাম, তাহাতেও আয়ুর্ব্বেদীয় কোন কোন অংশ বিরাজ করিতেছে।

সামবেদ সংহিতার দ্বিতীয় প্রপাঠকের শেষ মন্ত্রটী পাঠ করিলে জানা যায় যে, সামবেদ বায়ু-সম্বোধন উপলক্ষ্যে ভৈষজ্যের দ্বারা মনুষ্যের আয়ুঃস্থৈর্য্য থাকার কথা বলিয়াছেন। যথা,—

"বাত আবাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভুনো হৃদে।
প্র ন আয়ুংষি তারিষৎ।"

[সামবেদ সংহিতার ২, ১০, ৭০, ১৮৪]

ভেষজের সহিত জীবের আয়ুঃসম্বন্ধ জানা থাকিলে অবশ্যই আয়ুর্ব্বেদ জানার ফল হয়, সুতরাং উক্ত বেদের আয়ুর্ব্বেদ-মূলকতা পক্ষে কোন রূপ সংশয় করা যায় না। এই বেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ দেখুন, দেখিতে পাইবেন, তাহাতে জাঠরাগ্নি, অন্ন পরিপাক প্রণালী ও ইন্দ্রিয় পরিপুষ্টি,—এই তিনটী প্রধানতম আয়ুর্ব্বেদীয় তত্ত্ব উত্তম রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে। তস্য যঃ স্থবিষ্ঠস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽনিষ্ঠস্তন্মনঃ।"

ইহার অর্থ এই যে, বায়ুসহকৃত জাঠরাগ্নি দ্বারা পচ্যমান ভুক্তান্ন প্রথমত তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যাহা তাহার স্থূলতম ভাগ তাহা পুরীষ, যাহা তাহার মধ্যম ভাগ তাহা মাংস (রসরক্তাদিক্রমে মাংস), যাহা তাহার সূক্ষ্মতম অংশ তাহা উৎক্রমণশীল বলিয়া "হৃদয়ং প্রাপ্য সূক্ষ্মাসু হিতাখ্যাসু নাড়ীষু অনুপ্রবিশ্য কারণসংঘা-

তস্য স্থিতিমুৎপাদয়ন্ মনোভবতি" অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডে উৎপাত হইয়া তত্রস্থ সূক্ষ্ম নাড়ী পথ দ্বারা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে গিয়া সংপ্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে তাহা মনকে উপচিত করে। এই রূপ ;—

"আপঃ পীতা ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠোধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽণিষ্ঠঃ সঃ প্রাণঃ।"

"তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠোভাগস্তদস্থি ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোঽণিষ্ঠঃ সা বাক্।"

[ঐ ঐ]

জল বা জলবহুল দ্রব্য উপযোগের পর জাঠরাগ্নি তাহাকে পরিপাক করতঃ প্রথমতঃ ত্রিধা বিভক্ত করে। তাহার স্থূল ভাগ মূত্রের, মধ্যম ভাগ রক্তের এবং সূক্ষ্মতম ভাগ প্রাণের বা প্রাণ-বায়ুর উৎপত্তিকারণ হয়। তেজঃ (তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি) বা তেজঃপ্রধান দ্রব্য উপযোগের পর তাহাও ঔদর্য্য বায়ুপ্রেরিত পৈত্ত তেজের দ্বারা পাক প্রাপ্ত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যাহা তাহার স্থূলতম ভাগ তাহা এই দেহের অস্থি, যাহা তাহার মধ্যম ভাগ তাহা এই দেহের মজ্জা এবং যাহা তাহার সূক্ষ্মতম ধাতু তাহা বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের উৎপাদক বা পরিপোষক। *

* তাৎপর্য্য এই যে, তৈল, ঘৃত ও ঘৃতসজাতীয় বসা প্রভৃতি তৈজস বস্তু উপযোগ করিলে বাগ্বৈশদ্য হয়, অস্থি সকল দৃঢ় ও স্থূল হয় এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুণ গুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই অত্যল্প বৃত্তান্ত শুনিলে মনোমধ্যে অবশ্যই পূর্ব্বপক্ষ উঠিবে যে, তবে অন্নমাত্রভোজী আখু প্রভৃতি জীবেরা বাক্যবন্ত ও প্রাণবন্ত হয় কেন? কেননা তাহারা-ত জল উপযোগ করে না, বা তেজঃ উপযোগ করেনা, তবে তাহাদের বাক্যশক্তি ও প্রাণশক্তি কোথা হইতে আইসে? এতদ্ভিন্ন জলমাত্রভোজী কোন কোন মৎস্য অন্নাদি ভক্ষণ করে না, তবে কিসে তাহাদের মনস্বিতা থাকে? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বেদ পুরুষ বলিয়াছেন, কেবল জল, কেবল অন্ন ও কেবল তেজ

বালক শ্বেতকেতু পিতার এই নির্দ্দিষ্টান্ত কথা বুঝিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! পুনর্ব্বার ইহা আমাকে বুঝাইয়া দিউন। পিতা বলিলেন,—

"দধ্নঃ সোম্য! মথ্যমানস্য যোঽণিমা স উর্দ্ধঃ সমুদীষতি
তৎ সর্পির্ভবতি এবমেব খলু সোম্য! অন্নস্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা
স উর্দ্ধঃ সমুদীষতি।"

বৎস্য! দধি আলোড়িত হইলে তাহা হইতে যেমন তাহার সূক্ষ্মতম সার সকল ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, ক্রমে একত্রিত হইয়া নবনীতাকারে পরিণত হয়, তৎপরে তাহাই যেমন ঘৃতরূপ ধারণ করে; সেইরূপ, 'ভুজ্যমানস্যান্নস্য ঔদর্য্যেণাগ্নিনা বায়ুসহিতেন খজেন ইব মথ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি।' অন্নাদি ভোজন করিলে পর বায়ুসহায় জাঠরাগ্নি তখন খজের ন্যায়, মন্থ দণ্ডের ন্যায়, তত্তাবৎকে মথিত করিতে থাকে, ক্রমে তাহা হইতে তাহার স্থূল, মধ্যম ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সার অসার প্রভৃতি পৃথক্ হইয়া, সার সকল ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, পরে তাহা পৃথক্ পৃথক্ পথে গমন করে।

পাঠকগণ! এখন বিবেচনা করুণ, সামবেদে কি প্রকার বৈদ্যক বীজ আছে। সামবেদের অন্নপাক প্রণালীটী কেমন বিশদ তাহা উক্ত মন্ত্রের ভাষ্য ও টীকা দেখিয়া বিবেচনা করুণ।

পরিপাক ক্রিয়ার প্রকৃত তথ্য কি তাহা বোধ হয় কেহই নির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন। তথাপি, উক্ত তথ্য সম্বন্ধে বৈদিক সিদ্ধান্ত সংকলিত হইতেছে।

কেহই উপযোগ করিতে পারে না, সমস্ত বস্তুই ত্রিবৃৎকৃত অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুতেই প্রত্যেক ভূতের মিশ্রণ বা ভাগ আছে; সুতরাং যে জলপায়ী সে প্রকৃত জলপায়ী নহে; জলের সঙ্গে তাহারা অন্যান্য বস্তুও ভক্ষণ করে, তাহাতেই তাহাদের মনস্বিতা প্রভৃতি সমস্ত গুণ তারতম্যক্রমে সংরক্ষিত হয়।

"নাভেরূর্দ্ধং হৃদয়াদধস্তাদামাশয়মাচক্ষতে।" [ছান্দোগ্যভাষ্যম্।

নাভির উপরে হৃদয়ের নীচে, আমাশয় নামক (পাকস্থলী) স্থান আছে। ভুক্তান্নসকল, গল-নালীর দ্বারা তথায় প্রক্ষিপ্ত হইবা মাত্র আমাশয় অঙ্গে প্রথমতঃ স্পর্শাঘাত জনিত ক্রিয়াবিশেষ জন্মে। যেরূপ ক্রিয়ায় ভুক্তদ্রব্যের আন্দোলন বা আলোড়ন হইতে পারে, এ সেইরূপ ক্রিয়া। সেই জন্যই আমাদের বেদ পুরুষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন,—

"দধ্নঃ সৌম্য! মথ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি
এবমেব খলু সৌম্য! অন্নস্যাশ্যমানস্য।" [ছান্দোগ্যম্।

আচার্য্য ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—

"অন্নস্য ওদনাদেবশ্যমানস্য ভুজ্যমানস্য ঔদর্য্যেণাগ্নিনা বায়ুসহিতেন খজেন ইব মথ্যমানস্য।" ইত্যাদি।

আম-কোষস্থ বহ্নি বা উষ্মা কোষ্ঠবায়ুকে আন্দোলিত করতঃ ভুজ্যমান অন্ন সকলকে আলোড়িত করিতে থাকে। ঔদর্য্য বহ্নি কি? বেদ পুরুষ তাহা আপনিই ব্যক্ত করিবেন। ফল,লিখিত বর্ণনার দ্বারা বুঝা গেল যে, খাদ্য সকল আমকোষ্ঠে পতিত হইবা মাত্র প্রথমতঃ আমকোষ্ঠের আন্দোলন, অনন্তর তন্মধ্যগত খাদ্যের আলোড়ন, তৎসঙ্গে রসনিস্রুতি হয়। চক্ষুতে কিছু পড়িবা মাত্র যেমন চক্ষু দিয়া জল বহির্গত হয়, জিহ্বায় কিছু রাখিবা মাত্র যেমন তাহার সর্ব্বস্থান হইতে লালা-রস নিস্রুতি হয়, সেইরূপ,পাকাশয়েও অন্নাদি পড়িবা মাত্র তত্রত্য রসকোষ হইতে এক প্রকার রস নিস্রুত হয়। সেই রসই অশ্যমান অন্নকে আলোড়ন ক্রিয়া সহকারে দ্রবীকৃত করিতে থাকে। এই তথ্যটী সামবেদ অন্য এক স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথাঃ—

"অশিশিষতি নাম আপ এব তদশিতং নয়ন্তে তদযথা—" ইত্যাদি।

আচার্য্য এই ব্রাহ্মণবাক্য ব্যাখ্যা কালে বলিয়াছেন যে,—

"অশিতমন্নং কঠিনং রসরূপা আপঃ নয়ন্তে দ্রবীকৃতা রসাদিভাবেন বিপরিণাময়ন্তে।" [ভাষ্যম্।

সেই নিস্রুত রসই অশ্যমান কঠিন অন্নকে দ্রবীকৃত করিয়া, গলাইয়া দিয়া, জীর্ণ করিয়া, রসাদি আকারে পরিণামিত করে। পুনরপি বলিয়াছেন ;—

"অশিতং হ্যন্নমদ্ভির্দ্রবীকৃতং জঠরেণোষ্মণা পচ্যমানং রসাদিভাবেন পরিণমতে। রসাচ্ছোণিতং শোণিতান্মাংসং মাংসান্মেদোমেদসোঽস্থীনি অস্থিভ্যো মজ্জা মজ্জাতঃ শুক্রম্।" [ভাষ্যম্।

ভুজ্যমান অন্ন ক্লিন্নকারক ঔদর্য্য জলের দ্বারা অর্থাৎ উদর্য্য রসের দ্বারা দ্রবীভূত হয়, জঠরস্থ উষ্মা তাহার পাক করে। করিলে, তাহা রসাদি আকারে পরিণত হয়। প্রথমে রসপাক, রসপাক অন্তে রক্তের জন্ম; রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থিসার মজ্জা, এবং মজ্জাসার শুক্র।

"তথা যোষিদ্ভুক্তমন্নং রসাদিক্রমেণৈব পরিণতং লোহিতং ভবতি।" [ভাষ্যম্।

নারীভুক্তান্নও উক্ত ক্রমে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া লোহিত অর্থাৎ স্ত্রীশোণিতের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

জল-নামক ও আপ্-নামক পাচক রস কিরূপ এবং তাহার কোষই বা কোথায় ? আচার্য্য তাহা উক্ত নিগদবাক্য ব্যাখ্যায় বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

"হৃদয়মাংসপিণ্ডাৎ সর্ব্বতোবিনিঃসৃতা আদিত্যমণ্ডলাদিব রশ্ময়স্তাশ্চ এতা পিঙ্গলস্য বর্ণবিশেষবিশিষ্টস্য অণিম্নঃ সূক্ষ্মরসস্য রসেন পূর্ণাস্তদাকারা এব তিষ্ঠন্তি ভবন্তীত্যর্থঃ।"

অস্যটীকা।

"পিত্তাখ্যং সৌরং তেজঃ। তেন পাকোঽশিতস্য জায়তে। তেন অভিনির্ব্বৃত্তেন অন্নেন কফেন সম্পর্কাৎ তদেব পিত্তাখ্যং সৌরং তেজঃ ভবতি পিঙ্গলম্। তেন সম্পর্কাৎ রসস্য নাড়ীনাঞ্চ জায়তে পিঙ্গলত্বম্। তদেব

পিত্তাখ্যং সৌরং তেজঃ যথোক্তপাকাভি নির্ব্বৃত্তেন প্রভূতেন বাতেন সম্বন্ধাৎ ভবতি নীলম্। তেন চ সম্পর্কাৎ অন্নরসস্য নাড়ীনাঞ্চ জায়তে নৈল্যম্। তদেব পিত্তাখ্যং সৌরং তেজঃ যথোক্তপাকবশাদভিনির্ব্বৃত্তকফস্য স্বসম্বন্ধিনোভূয়স্ত্বাৎ ভবতি শুক্লম্। তেন চ সম্পর্কাৎ অন্নরসস্য নাড়ীনাঞ্চ ভবতি শৌক্ল্যম্।'' ইত্যাদি।

এই সমুদায় বৈদিক ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ এইরূপঃ—

হৃৎপিণ্ড হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সকল জীর্ণ অশ্বত্থ পত্রের শিরা প্রশিরার ন্যায় চারিদিকে চলিয়া গিয়া পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং আমাশয়স্থ অন্তস্ত্বকেও ঐ সকল সূক্ষ্ম শিরার সংযোগ আছে। সূর্য্য হইতে যেমন সূর্য্যরশ্মি, হৃদয় হইতে তেমনি নাড়ী প্রণাড়ী। সেই সকল সূক্ষ্ম শিরা জাল কেবল রসময় বা রসপরিপূর্ণ। সুতরাং আমাশয়স্থ ও হৃৎপিণ্ডস্থ রসবহা শিরা সকল কতক পিঙ্গলবর্ণ, কতক শুক্লবর্ণ এবং কতক বা নীলবর্ণ এবং কতক বা প্রকৃত রক্তবর্ণ। এই প্রকার বর্ণোৎপত্তির প্রকৃত কারণ আমাশয়স্থ বা পচ্যমান আশয়স্থ সৌর-তেজঃ। কেননা তত্রস্থ সৌর-তেজের দ্বারাই পাক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। ইহারই অন্য নাম পিত্তরস। পিত্তরস বা পাচক রস উৎপাদনের প্রকৃত স্থান পৃথক্ প্রদেশে থাকিলেও তাহারই দ্বারা আমাশয়ের সৌর-তেজ সন্ধুক্ষিত হয়। পাককালে কফোৎপাদক ঝিল্লিতে শ্লেষ্মা থাকে, সেই শ্লেষ্মার বহুমিশ্রণ হইলেই সৌর-তেজঃ পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যায়; সুতরাং তত্রত্য রস ও রসবহা সূক্ষ্ম শিরাজালক (Cecaw cause gland) সকল পিঙ্গলাকার ধারণ করে। এইরূপ, বাতবহুল হইতে নীলিমা, কফবাহুল্য হইতে শুক্ল, ইত্যাদি ইত্যাদি বর্ণবিশেষের কারণ অনুসন্ধান করিবেন।

আমাশয়স্থ পিত্তনামক সৌরতেজঃই যে অন্নপরিপাকের প্রধান কারণ, উষ্মাযুক্ত রসই যে ভুজ্যমান অন্নকে দ্রবীকৃত করিয়া থাকে, তেজ বা উষ্মা যে কোষ্ঠগত রসে বসতি করে, এবং সেই উষ্মাই

যে স্বাশ্রয়ীভূত পাচক রসে থাকিয়া ধাত্বন্তরের সংসর্গ বশতঃ বর্ণ বিশেষের সৃষ্টি করে, তাহা প্রদর্শিত বর্ণনার দ্বারা উত্তমরূপ বুঝায়।

বেদোক্তির এতদ্রূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা দেখিয়া আমরা আধুনিক ভাষায় এইমাত্র বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, পাকক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের বেদ পুরুষ নিম্নলিখিত প্রকার ভিন্ন অন্য কোনরূপ পাকক্রিয়ার উপদেশ করেন নাই।

'খাদ্য দ্রব্য আমাশয়ে প্রবিষ্ট হইলে পর, স্পর্শাঘাত জন্য তত্রস্থ উষ্মাযুক্ত বায়ুতে আন্দোলনাত্মক ক্রিয়া জন্মে। সুতরাং তদাধার স্বরূপ বা তাহার আশ্রয়স্থান মাংস পেশীময় পাকযন্ত্রের সঙ্কোচন ও প্রসারণ রূপ ক্রিয়া উদ্দীপ্ত হয়। তৎপ্রভাবে সৌরতেজ অথবা পিত্ত নামক রস নিস্রুত হইয়া খাদ্য সকল দ্রব করিতে থাকে, সুতরাং খজের দ্বারা অর্থাৎ মন্থদণ্ডের দ্বারা দধি পরিচালিত করিলে তাহা হইতে যেমন তাহার সূক্ষ্ম সার সকল ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া নবনীত ভাব প্রাপ্ত হয়, স্থূল অর্থাৎ অসারভাগ পৃথক্ হয়, আর মধ্যম ভাগ যেমন ঘোল রূপে অবস্থিত থাকে, উষ্মাসংযুক্ত ঔদর্য্যবায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত খাদ্যদ্রব্যও তেমনি বায়ুসহিত সৌরতেজের বা পিত্তরসের মিশ্রণে আলোড়িত ও দ্রবীকৃত হইলে পর তাহার সারভাগ অসার ভাগ যথাযোগ্য পৃথককৃত হয়, অনন্তর তাহা ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবেশ করে। অতএব, উষ্মা ও ঔদর্য্য বায়ুই নিজ নিজ আশ্রয়ীভূত আশয়ে থাকিয়া উক্তরূপ পৃথক পৃথক কার্য্য সমাপ্ত করিয়া থাকে।

এ ত গেল বেদোক্তি বা বৈদিক মত। এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ কি বলেন, তাহা আমরা পৃথক প্রস্তাবে প্রকটিত করিব। এক্ষণে এই প্রক্রিয়ার উপর বেদবাদী ঋষিদিগের যে এক প্রকার মত আছে, উপদেশ আছে, তাহাও আমরা এস্থলে পাঠকগণের গোচর করিতেছি। বেদবাদী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিতেছেন,—

"আয়ুষ্যং ভুক্তমাহারং সহসা তৈঃ সমীকৃতম্।
তুন্দমধ্যগতঃ প্রাণস্তানি কুর্য্যাৎ পৃথক পৃথক।"
"পুনরগ্নৌ জলং প্রাপ্য অন্নাদীনি জলোপরি। [জলং রসঃ।
স্বয়ং হ্যপানঃ সংপ্রাপ্য তেনৈব সহ মারুতঃ॥
প্রয়াতি জ্বলনং তত্র দেহমধ্যগতঃ পুনঃ।"
"জ্বালাভিজ্বলনং তত্র প্রাণেন প্রেরিতং মুহুঃ।
জলত্ব্যাদকমাশ্রিত্য কোষ্ঠমধ্যগতং তদা॥
অন্নং ব্যঞ্জনসংযুক্তং জলোপরি সমর্পিতং। [জলং পাচকোরসঃ।
ততঃ প্রসুপ্তমকরোৎ বহ্নিসন্তপ্তবারিণা॥"
"অথাহৃতং ষড্রসং বা প্যাহারং কণ্ঠমার্গগম্।
শ্লেষ্মণানুগতং তস্য প্রভাবান্মধুরীভবেৎ॥
তত্র স্বাদ্বম্ললবণ তিক্তোষণকষায়কাঃ।
ষড্রসাঃ কথিতা ভূত-বিকৃত্যা দ্রব্যমাশ্রিতাঃ॥
অথৈবমাশয়গতং পশ্চাৎ পিত্তাশয়ং ব্রজেৎ।
তদা তস্যানুগমনাৎ কটুকং সংপ্রপদ্যতে॥
তথাত্রান্তরসংশ্লিষ্টং পচ্যতে পিত্তবারিণা।"
"গ্রহণীনাম যা পাত্রী প্রসৃতাঞ্জলিসম্মিতা।
অধস্তস্যাঃ প্রধানাগ্নিঃ সমানেনাপি ধুক্ষ্যতে॥
(প্রধানাগ্নির্দোষভূষ্যস্থাগ্নিভ্যোভিন্নো বড়বানলরূপোজাঠরাগ্নিঃ)
পচ্যমানাদ্রসং ভিন্নং বায়ুবক্ত্রাদিকং নয়েৎ।
তত্র কিট্টং পৃথক্ ভিন্নং গ্রহণ্যাং চিনুতেঽনিলঃ।
তচ্চীয়মানং বিশ্রাম গ্রহণীং পূরয়েন্মুহুঃ।
সা তয়া শকৃতা পূর্ণা বলিতা প্রতিমুঞ্চতি॥
পুরীষং পায়ুমার্গেণ তৎপাকে + + + ॥" ইত্যাদি।

এই সকল শ্লোকের ভাষা অত্যন্ত সরল ও সহজ। সুতরাং ইহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল না। অপিচ, বৈদিক ব্যাখ্যার সহিত এই সকল শ্লোকের সুন্দর ঐক্য আছে। অনেক অজ্ঞলোক মনে

করিয়া থাকেন, পূর্ব্বকালের লোকেরা অন্নপাক-প্রক্রিয়া জানিতেন না। এ সকল দেখিলে শুনিলে বিবেচনা হয়, যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদকে উক্ত প্রকারে তুচ্ছ বোধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বহুদর্শী নহেন।

এতদ্ভিন্ন এই বেদে, ক্ষুধা ও পিপাসা প্রভৃতির কারণ উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শারীর ধাতুর হ্রাস হইলে বা বৃদ্ধি হইলে কিরূপে তাহার পূরণ ও শমতা করিতে হয়, তাহাও উপদিষ্ট আছে। প্রস্তাববাহুল্য ভয়ে সে সকল কথা বা সে সকল সংক্ষিপ্ত উপদেশ আহৃত করিলাম না। ফল, যাহাতে এই সকল মূলীভূত শারীরতত্ত্ব ও আয়ুস্তত্ত্ব বিদ্যমান আছে, কি জন্য না তাহাকে আয়ুর্ব্বেদের মূল বা ভিত্তি বলিয়া উল্লেখ করিব ?

যাক, এখন দেখা যাক, আমাদের আয়ুর্ব্বেদ কত কালের। আমরা যখন দেখিতেছি যে, আয়ুর্ব্বেদের সমস্ত তত্ত্বই বীজভাবে বেদমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে তখন আমরা অবশ্যই বলিতে পারি যে, আয়ুর্ব্বেদীয় বস্তু সকল অনাদি অথবা বেদসমকালিক। বৈদিক সময়ে, না হয় তাহা সূক্ষ্মভাবে ছিল, বীজরূপে ছিল, এখন না হয় তাহা অঙ্কুরিত বা শাখাপ্রশাখান্বিত হইয়াছে, বিস্তৃত বা বিশাল হইয়াছে। সুতরাং তাহাকে আধুনিক বলিতে পারি না। অন্যান্য বেদের ন্যায় ইহা হয় সর্ব্বাদিম, না হয় অনাদি, এইরূপ বলাই কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি কেহ এরূপ জিজ্ঞাসা করেন যে, আয়ুর্ব্বেদীয় বস্তু সকল চিরপরিচিত হয় হউক, পরন্তু তদ্গ্রথিত সংহিতা অর্থাৎ যাহাকে আমরা আয়ুর্ব্বেদসংহিতা বলি, তাহা কত কালের ? এইরূপ প্রশ্ন হইলে অবশ্যই তাহার পৃথক প্রত্যুত্তর দিতে হইবে, পৃথক প্রকারের অনুসন্ধানও আরম্ভ করিতে হইবে।

আগে উপবেদ শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করুণ, পরে দেখিবেন, অথর্ব্ববেদের কিংবা ঋগ্বেদের সহিত আয়ুর্ব্বেদের কিরূপ উপাঙ্গতা আছে। আয়ুর্ব্বেদ সংহিতাটী কত পুরাতন তাহা জানিবার জন্য

অগ্রে উপবেদ শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করুন। উপবেদ শব্দের এক অর্থ এই :—

"উপমিতঃ বেদেন।" বেদের তুল্য অর্থাৎ অন্যান্য বেদ যেমন প্রামাণিক ইহাও তদ্রূপ প্রামাণিক; কিংবা অন্যান্য বেদ যেমন স্থির নিত্য, ইহাও তদ্রূপ স্থিরনিত্য। এতদ্ভিন্ন, "যে বেদের নিকট বা যে বেদ হইতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে বা আবিষ্কৃত হইয়াছে সে তাহার উপবেদ।" এরূপ অর্থও হইতে পারে।

এই শেষ অর্থ অনুসারে বিবেচনা করুণ, উপবেদ গুলিকে মূল বেদের পরবর্ত্তী বলা যায় কি না। যদি যায়, তবে, অবশ্যই আমরা উপবেদাত্মক আয়ুর্ব্বেদসংহিতার আবির্ভাব কাল অনুমান করিবার জন্য অগ্রসর বা উদ্‌যোগী হইতে পারিব, অন্যথা বৃথা প্রয়াস স্বীকার করা হইবে। ফল, এসম্বন্ধে যতদূর অন্বেষ্টব্য আছে তত দূরই আমরা অন্বেষণ করিব।

ক্রমশঃ—

ঔষধ-সূত্র।

(Principle of Medicine)

সভ্যজগতে যত প্রণালীর চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সকল প্রণালীরই কতকগুলি মূল-নিয়ম আছে। ঐ মূল-নিয়মের নাম সূত্র বা Principle। উক্ত সুত্রের ভেদ অনুসারে চিকিৎসা এবং উহার নামের ভেদ হইয়া থাকে। সূত্রই শাস্ত্রের জীবন এবং সূত্রই শাস্ত্রের সোপান। যে কোন বিদ্যাই হউক, যত দিন সৌত্রিক আকারে উপস্থিত না হয়—সৌত্রিক পন্থায় ধাবিত না হয়—অথবা সৌত্রিক নিয়মের অধীন না হয়, তত দিন উহার প্রকৃত শাস্ত্র-সংজ্ঞা বা Science সংজ্ঞা দেওয়া যুক্তি-যুক্ত নহে। সুত্রের উৎকর্ষ বা অপ-

কর্ম অনুসারে শাস্ত্রেরও উন্নতি বা অবনতি বিচার করা উচিত। শাস্ত্রীয়-সূত্র অতি দুর্ব্বোধ ও জটিল। দুর্ব্বোধ বলিয়া সূত্রমর্ম্ম সহসা ভেদ করা যায় না এবং এই কারণেই বিবাদ বিসংবাদ ঘটিয়া থাকে। আজ পর্য্যন্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রের সর্ব্বাংশের সম্পূর্ণসূত্রনির্ম্মাণ হয় নাই বলিয়া এই শাস্ত্রও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। জ্ঞানের প্রকৃত উন্মেষ ও প্রকৃত অনুশীলন না জন্মিলে সূত্রের মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। পরন্তু হিন্দুগণ সূত্রের মহিমা অনেক কাল পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন, এবং তদনুযায়িনী চেষ্টাও করিয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদের এক স্থানে সূত্রের একটী সুন্দর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে——

" যো বিদ্যাৎ সূত্রং বিততং
যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ।
সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ
স বিদ্যাৎ ব্রাহ্মণং মহৎ ॥"

যদিও এই সূত্রটী ব্রহ্ম-বিষয়ক, ব্রহ্ম-প্রতিপাদনই এই সূত্রের উদ্দেশ্য, তথাপি ইহা দ্বারা এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, যাহা মূল, যাহা হইতে সমুদয়ের সূচনা হইয়াছে, যাহা সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ, যাহাতে সমুদয়ই গ্রথিত, তাহা জ্ঞাত হওয়াই কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশের অনেকেই ব্যাকরণ ও সামান্য সাহিত্যাদি পাঠ করিয়া বৈদ্যক অধ্যয়ন আরম্ভ করেন, এবং সচরাচর যে সকল বৈদ্য চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই সংগ্রহ বা তালিকাগ্রন্থপাঠী। অনেকে বা আয়ুর্ব্বেদকে নিতান্ত আজ্ঞা-সিদ্ধ মনে করেন, সুতরাং যে রোগে যে ঔষধ, ঘৃত বা তৈল ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অবিচারিত-ভাবে গ্রহণ বা ব্যবহার করিয়া থাকেন (ক)। রোগী ও রোগের প্রকৃতি, ঔষ-

(ক) যাঁহারা মূলগ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করেন, তাঁহাদেরও শাস্ত্রীয়-সূত্রাদির প্রতি দৃষ্টি নাই বলিলেও হয়। বৈদ্যশাস্ত্রের আলোচনা করিতে গিয়া

ধের সহিত তাহার মূলসম্বন্ধ, অংশাংশ-কল্পনা, দেশ কাল ইত্যাদির চিন্তা ও অনুধাবনের সহিত অল্প ব্যক্তিরই সংস্রব দেখা যায়। সুতরাং ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের আবার সূত্র কি ?

সূত্র কি ? ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই—যে যুক্তির উপরে শাস্ত্রের ভিত্তি, বিস্তীর্ণ বিষয় যদ্দ্বারা সঙ্কলন করা যায় এবং যাহাতে গ্রথিত থাকে, অনুক্ত বিষয়ও যদ্দ্বারা উহ্য করিয়া লওয়া যায়, তাহাই সূত্র(খ)। মনে কর, রাম + আদি = রামাদি, অথবা দয়া + আনন্দ = দয়ানন্দ, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সংহিত পদ যাঁহার জানা আছে, তিনি সেই কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট পদেরই সন্ধি করিতে পারিবেন, কিন্তু ঐরূপ উদাহরণ সমূহের সন্ধি যে নিয়মে নিষ্পন্ন হয়, যাঁহার সেই নিয়ম পরিগ্রহ হইয়াছে, তিনি ঐরূপ অনন্ত পদের সন্ধি নিষ্পাদন করিতে পারেন, অনন্ত পদকে এক জাতি বা ভিন্ন জাতিতেও গ্রন্থন

ইহাঁরা ব্যাকরণের কারক সমাস ইত্যাদি এবং ন্যায়ের দুই চারিটা অবচ্ছেদাবচ্ছিন্ন লইয়াই প্রায় বৃথা কালহরণ করেন। বৈদ্যশাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতি পক্ষে অনেককাল হইতেই ইহাও একটী অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই চিকিৎসা-বিষয়ে নূতন সঙ্কলন বা আবিষ্কার ও যথার্থ চিন্তা আর নাই। এই সমস্ত কারণে বিজাতীয় চিকিৎসকগণ বর্ত্তমান বৈদ্যদিগকে যে হাতুড়িয়া বলিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি ? কবে যে দেশীয় বৈদ্যদিগের ঐরূপ কুসংস্কার দূর হইয়া কার্য্যকারিণী বুদ্ধি উপস্থিত হইবে, তাহা বলা যায় না।

(খ) যদিও ব্যাকরণের সূত্র বা নিয়মের সহিত চিকিৎসাশাস্ত্রের সূত্রের প্রকৃত তুলনা হইতে পারে না, কেননা ব্যাকরণের নিয়মসমূহ মানব-কল্পিত শব্দের উপর আধিপত্য করে, আর চিকিৎসাসূত্রসকল স্বভাবজাত ব্যাপার বা প্রাকৃতিক ঘটনার উপর কর্ত্তৃত্ব করে। তবে যাহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রথমপ্রবেশী তাহাদের স্থূল জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণসূত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

করিতে পারেন, ঐরূপ নিয়মের নামই সূত্র (গ)। ঐরূপ জ্ঞান-কেই সূত্র-জ্ঞান বলে। যাহার সূত্র যত ব্যাপক বা যত অব্যভি-চারী তাহার সূত্র তত পরিপক্ক ও তত প্রশংসনীয়। সৌত্রিক বা লাক্ষণিক প্রথার সন্ধান না পাইলে, মনুষ্য কোন বিষয়ই আয়ত্ত করিতে পারিত না। এই কারণে কোন প্রবীণ পণ্ডিত বলেন—

"ঋষয়োঽপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্‌ত্বশঃ।
লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ॥"

কোনরূপ নিদর্শনাদি ব্যতিরেকে শাস্ত্রমাত্রেরই প্রায় সূত্রনির্ম্মাণ হয় না, সুতরাং চিকিৎসা শাস্ত্রেরও সূত্র একেবারে বিনা নিদর্শনে নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা সম্ভবপর নহে। কোন স্থলে কোন ঘটনা অগ্রে প্রত্যক্ষ হওয়া চাই (ঘ)। সেই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অনুসারে

(গ) সূত্রণাৎ সূচনাৎ সীবনাচ্চার্থসন্ততেঃ সূত্রং।
চক্রপাণি।

(ঘ ১। অন্ন-রন্ধন স্থালীর উপরিস্থিত শরাবের উত্থান ও পতন দৃষ্টি করিয়া জেমস্ ওয়াট্ জলীয় বাষ্পের যে কার্য্যসাধিকা শক্তি অবধারণ করেন, তাহা হইতেই এখন বৃহৎ অর্ণবযান সুদীর্ঘ শকট শ্রেণী ও শত শত যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে।

২। উদ্যানস্থিত আপেল্ ফলের পতন দৃষ্টি করিয়া সর্ আইজাক্ নিউটন্ পৃথিবীর যে আকর্ষণী শক্তির অনুমান করেন, তাহা জগদ্ব্যাপী মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের মূল সূত্র।

৩। স্নানার্থ জলাধারে অবগাহনকালে শরীরের লঘুতা অনুভব করিয়া আর্কমিডিস্ জলাদিতে ভাসমান দ্রব্যের ভারাপচয়ের যে কারণ অবধারণ করেন, তাহা হইতেই আপেক্ষিক গুরুত্ব বিষয়ক নিয়মের সূত্রপাত হয়।

৪। একদা ঝটিকা কালে ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ী উড়াইতে উড়াইতে তড়িত স্ফুলিঙ্গই যে, বিদ্যুতের অংশ ইহা অবগত হইয়া বিদ্যুৎ ও তাহার শক্তির আবিষ্কার করেন, তাহাই বর্ত্তমান টেলিগ্রাফ্ প্রভৃতি যন্ত্রের মূল পত্তন।

অনুমান, অনুভব ও যুক্তি ইত্যাদির বলে সূত্রসকল উদ্ভাবিত হয়। সেই উদ্ভাবিত সূত্র সকল পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ ফলের সহিত সঙ্গত করিয়া দৃঢ় করা হয়। যৎকালে সূত্র দৃঢ় বলিয়া স্থির হইল, কোন স্থলেই আর উহার ব্যভিচার না দেখা গেল, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উহার আয়ত্ত হইয়া পড়ে। সহস্র যোজন

৫। এক সময়ে গ্যালিলিও এক ধর্ম্ম-শালায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, যে সেই গৃহের উপরিভাগে একটী ঘণ্টা দুলিতেছে, এবং দোলনক্রিয়ার সমভাবে হ্রাস হইতেছে, তদ্দর্শনে তিনি প্রমাণ করিলেন যে এক নির্দ্ধারিত বিন্দুতে সংলগ্ন গোলক সমভাবে দুলিবে, এই ঘটনা হইতেই জগতের মহোপকারক সময়-জ্ঞাপক ঘটিকা যন্ত্রের আবিষ্কারের সূত্রপাত হয়।

৬। একদা গ্যালিলিও শুনিলেন যে, জেনৃসন্ নামে এক ওলন্দাজ পণ্ডিত এমন এক খেলেনার সৃষ্টি করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা বস্তু সকলকে বিপরীত দেখা যায়, ইহা শুনিয়া তিনি সেই খেলেনা ক্রয় করিলেন এবং ঐ খেলেনা অবলম্বন করিয়াই ক্রমে জ্যোতিষ্ক সমূহের তত্ত্বাবধারণের মূল স্বরূপ দূরবীক্ষণযন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন।

৭। পাস্কাল নামে এক পণ্ডিত বহু অনুসন্ধানে অবধারণ করিলেন যে "তরল পদার্থের এক দিকে চাপ প্রয়োগ করিলে, তাহা তাহার চারিদিকেঁ সমভাবে সঞ্চালিত হয়" এই মূল সূত্র অবলম্বন করিয়াই সুপ্রসিদ্ধ বারি-ঘটিত ব্রামাযন্ত্রের আবিষ্কার হয়, এবং এক্ষণে তাহারই কল্যাণে, হাইড্রলিক মেশিনে সুবৃহৎ গাঁইট্ সকল ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হইয়া দূরদেশে প্রেরণের সুবিধা হইয়াছে।

৮। কথিত আছে, অধিক মাত্রায় কুইনাইন সেবন করিয়া জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় তাহা হইতেই হানিমান্ স্বপ্রবর্ত্তিত চিকিৎসার সূত্রাংশ নিষ্কাশন করেন, সেই সূত্র হইতেই চিকিৎসাবিদ্যার আর একটী ভিন্ন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়া আজ বিশ্বব্যাপক হইয়াছে। পাশ্চাত্য ভূমিতে সূত্র বিষয়ক ইত্যাদি বহুল ইতিহাসের অভাব নাই।

অন্তরের কার্য্য সকল, সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বা পরের ব্যাপার-সমূহ তখন আর দূরস্থ বলিয়া বোধ হয় না। হস্তামলকের ন্যায় সন্নিহিত বোধ হয়। অনুধ্যান করিলে সমস্ত জগৎ বুদ্ধি-দর্পণে সংক্রামিত হয়। এই সূত্র সংকলনে যিনি যে পরিমাণে পটু, তিনি সেই পরিমাণে জ্ঞানী বা সেই পরিমাণে যোগী। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উক্ত সূত্র কোন্ আদর্শ অবলম্বন করিয়া ও কোন্ প্রণালীতে প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা শিক্ষা প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

আয়ুর্ব্বেদীয় সূত্র-সমূহ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত (ঙ)। হেতুসূত্র, লক্ষণসূত্র ও ঔষধসূত্র। হেতুসূত্র দ্বারা রোগের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান হেতু সকল সঙ্কলন করা যায়, এবং লক্ষণসূত্র দ্বারা, ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান চিহ্ন এবং পীড়ার শুভাশুভ ফল স্থির করা যায়, ঔষধসূত্র দ্বারা রোগের ঔষধ বা প্রতিকারোপায় নির্ণয় করা যাইতে পারে। হেতুসূত্র ও লক্ষণসূত্র ভিন্নপ্রবন্ধে আলোচিত হইবে। ঔষধসূত্রই আমাদের এ প্রবন্ধের আলোচ্য।

ঔষধসূত্র দ্বারা প্রতি-রোগে যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, সে সকল ঔষধের কিরূপ ধর্ম্ম হওয়া চাই, কিরূপ বীর্য্য বিপাক প্রভৃতির প্রয়োজন, কোন্ প্রকার দেশে বা কোন্ প্রকার কালে বা কোন্ প্রকার প্রকৃতিতে কিরূপ দ্রব্য আবশ্যক, কোন্ ব্যক্তির প্রতি বা কোন্ রোগের পক্ষে কিরূপ আহার আচরণ প্রভৃতি পথ্য বা অপথ্য, কোন্ কোন্ দ্রব্যের সহিত মানবের কিরূপ শুভাশুভ সম্বন্ধ ইত্যাদি অত্যাবশ্যক তত্ত্ব সকল সঙ্কলিত হইয়া থাকে।

(ঙ) হেতুলিঙ্গৌষধ-জ্ঞানং স্বস্থাতুরপরায়ণং।
ত্রিসূত্রং শাশ্বতং পুণ্যং বুবুধে যং পিতামহঃ॥ চরকঃ।

কেহ কেহ উক্ত তিন প্রকার সূত্র ভিন্নও স্বতন্ত্র ক্রিয়াসূত্র (চিকিৎসা-সূত্র) স্বীকার করেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে সূত্র চারিপ্রকার।

রোগের যেমন বিচিত্র অবস্থা অর্থাৎ কোন রোগে মল-ভেদ জন্মায়, কোন রোগে বা মল কঠিন করে, কোন রোগে শীতানয়ন করে, কোন রোগে বা উত্তাপদান করে, ঔষধেরও তেমন ভিন্ন ভিন্ন শক্তি। কোন ঔষধ ভেদক, কোন ঔষধ ধারক বা গ্রাহক, কোন ঔষধ শৈত্য জনক, কোন ঔষধ বা তাপোৎপাদক ইত্যাদি। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বা লক্ষণ-যুক্ত রোগে কিরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ বিধেয়, ইহা বুঝাইবার জন্য ঋষিদিগকে অনেক সূত্রের সঙ্কলন করিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমে আমরা সামান্য সূত্রের ব্যাখ্যা করিব। তৎপরে আবশ্যক স্থলে বিশেষ সূত্রগুলি বিশদ করা যাইবে। কেন না বিশেষ জ্ঞানের পূর্ব্বে সামান্য জ্ঞান হওয়া উচিত। উক্ত সূত্র এই—

"যথাহং সর্ব্বেষাং বিকারাণামপিচ নিগ্রহে
হেতুব্যাধিবিপরীমৌষধমিচ্ছন্তি কুশলাস্তদর্থকারি বা।" (চ)
চরক বিমানস্থান দ্বিতীয় অধ্যায়।

অর্থাৎ সমুদয় রোগের প্রতীকারার্থে (১) হেতুবিপরীত, ব্যাধি-বিপরীত এবং উভয়বিপরীত অথবা (২) হেতু বিপরীতার্থকারী,

(চ) মূলে যে, সূত্রের উল্লেখ করা হইল, সেই সূত্রের এবং চরকের নিদান স্থানোক্ত "উপশয়ো হেতুবিপরীতানাং বিপরীতার্থকারিণামৌষধান্ন-বিহারাণামুপযোগঃ সুখাবহঃ"। এই সূত্রের ভিত্তি একই। বাভট প্রোক্তসূত্র দ্বয়ের যথাক্রমে নিজ পদ্যে নিম্নলিখিত অনুবাদ করিয়াছেন, যথা—

———বৈদ্যো যুঞ্জ্যাদ্ব্যাধিবিপর্য্যয়ম্।
তদর্থকারি বা——— ॥ সূত্রস্থান ৮ম অধ্যায়ঃ।
হেতুব্যাধিবিপর্য্যস্তবিপর্য্যস্তার্থকারিনাং।
ঔষধান্ন বিহারাণামুপযোগং সুখাবহম্।
বিদ্যাদুপশয়ং ব্যাধেঃ সহি সাত্ম্য ইতি স্মৃতঃ।
নিদান স্থান ১ম অধ্যায়ঃ।

ব্যাধিবিপরীতার্থকারী এবং উভয়বিপরীতার্থকারী ঔষধ, যথাযথ স্থল বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। (ছ)

এইটীকে সাধারণ সূত্র বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা সমুদয় রোগের চিকিৎসাতেই ব্যাপক। রোগ যেরূপ প্রকৃতির বা যে প্রকার ধর্ম্মের কেন না হউক, সমুদয় রোগেরই ঔষধ ইহা দ্বারা সাধারণতঃ নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ও যুক্তি-বলে স্থির হইয়াছে, যে, বিরোধী পদার্থ বা বিকারের সম্পর্কে পদার্থ মাত্রেরই হ্রাস বা বিনাশ সাধন হইয়া থাকে, শীত দ্বারা উষ্ণনিবারণ এবং উষ্ণ-যোগে শীত-প্রতিকার ইত্যাদি ব্যাপার স্বভাব-সিদ্ধ। এই স্বাভাবিক কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। উক্ত প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইলেও বৈপরীত্য বা বিরোধিতাই হ্রাস বা বিনাশের হেতু। ইহা চিকিৎসাশাস্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (জ)। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ঋষিগণ স্থির করিলেন, যে, যে রোগ যে কারণে উৎপন্ন, অথবা যেরূপ ধর্ম্মযুক্ত, উহার বিরোধী দ্রব্য বা ক্রিয়াই সেই রোগের ঔষধ বা প্রশমক। উক্ত বিরোধিতা অনেক প্রকার। স্থূলত উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা,—সাক্ষাৎ-বিরোধিতা, পরম্পরিত-বিরোধিতা ও প্রভাব-কৃত বিরোধিতা।

১ ম। সাক্ষাৎ বিরোধিতা—ঔষধ শরীরের সহিত সম্পর্কিত হইবা মাত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ অব্যবহিত পরেই যে বিরুদ্ধ বা বিপরীত ক্রিয়া

(ছ) এস্থলে ইহা বুঝা আবশ্যক যে প্রথম সংখ্যক ঔষধ এক শ্রেণীর এবং দ্বিতীয় সংখ্যক ঔষধ আর এক শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর ঔষধগুলিকে বিপরীত ঔষধ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔষধগুলিকে বিপরীতার্থকারী ঔষধ বলা যায়।

(জ) এস্থলে জানা আবশ্যক, যাঁহারা সদৃশ মতের চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের ঔষধ আপাততঃ সদৃশ হইলেও কোন কারণ বশতঃ বিরোধিতাই প্রকাশ করে, এই কারণ কি তাহা যথাস্থানে ব্যক্ত হইবে।

প্রকাশ করে তাহা সাক্ষাৎ বিরোধিতা। যথা,—অগ্নিতাপে শীত-নিবারণ এবং জল-সেচনে দাহ বা তাপ-প্রশমন ইত্যাদি।

২ য়। পরম্পারিত-বিরোধিতা—ঔষধ শরীরে সংলগ্ন হওয়া মাত্র প্রথমতঃ এক প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ করে, সেই ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক বা তাহার পরে যে আর এক প্রকার বিরোধি-ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা পরম্পরিত-বিরোধিতা। যথা,—বিরেচন-নিবারণার্থে উদরে আম্রবল্কল-প্রলেপ অথবা বমন নিবারণার্থ সর্ষপ-প্রভৃতির লেপ ইত্যাদি (ঋ)।

৩ য়। প্রভাব-কৃত-বিরোধিতার বিষয় পরে ব্যক্ত হইবে।

এমন স্থল আছে, যে স্থলে কারণের নাশ বা বিলোপ-সাধন হইলে, কার্য্যেরও বিনাশ ঘটে, এমন উদাহরণ পাওয়া যায়, যেস্থলে কার্য্যের বিনাশ ঘটিলে তাহার কারণ আপনা হইতেই লয় পায়।

আবার এমন দৃষ্টান্ত বহুল পাওয়া যায়, যে স্থলে কারণ ও কার্য্য উভয়কে একদা আক্রমণ না করিলে, উহাদের বিনাশের সুযোগ ঘটে না। ইহা পরীক্ষা-সিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম (ঞ)। রোগ এবং উহার প্রতীকারপ্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, সুতরাং উক্ত নিয়মেরও অধীন। এই নিয়মের অধীন বলিয়া ঋষিগণ ঔষধ (বিপরীত বা বিপরীতার্থকারী) ত্রিবিধ প্রকার গণনা করিয়াছেন।

(ঋ) সিদ্ধার্থক-বচালোধ্র সৈন্ধবৈশ্চ প্রলেপনং।
বমনঞ্চ নিহন্ত্যাশুপিড়কাং যৌবনোদ্ভবাম্॥ ভাব প্রকাশঃ।
সৌরীর-পিষ্টাম্রবল্কল-লেপোঽতিসারহা। চক্রপাণিঃ।

(ঞ) এই স্থলে কয়েকটী বিচার্য্য কথা আছে, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে।

বিপরীত ঔষধ।

কথিত নিয়মানুসারে এই ঔষধ তিন প্রকার।

১। হেতুবিপরীত (নামান্তর) হেতুবিরোধী বা হেতুনাশক।

২। ব্যাধিবিপরীত (নামান্তর) ব্যাধিবিপরীত বা ব্যাধিনাশক।

৩। উভয়বিপরীত (নামান্তর) হেতু ব্যাধি উভয় বিপরীত বা হেতু ব্যাধি উভয় নাশক।

১। হেতু বিপরীত ঔষধ—যে সকল ঔষধ হেতু অর্থাৎ উৎপাদক কারণের বিপরীত ধর্ম্ম যুক্ত অথবা উৎপাদক কারণের বিনাশ ঘটিলে, যদ্দ্বারা পীড়ার শান্তি হইতে পারে, সেই সমস্ত ঔষধকে হেতুবিপরীত ঔষধ বলা যায়। যথা,—শ্লেষ্ম-জ্বরে শুণ্ঠী অথবা ক্রিমি-জনিত বমন বা শূলরোগে ক্রিমি-নাশক ঔষধ।

২। ব্যাধি বিপরীত ঔষধ—যে সকল ঔষধে রোগের শক্তিকে অগ্রে খর্ব্ব করে, যে কারণে (বায়ু, পিত্ত বা কফ) রোগ উৎপন্ন হইয়াছে তৎপ্রতি চিকিৎসকের বিশেষ মনোযোগ না করিলেও চলিতে পারে। (কেন না রোগের কারণ স্বয়ং বা ক্রিয়ান্তর দ্বারা নিবৃত্ত হয়) সেই সকল ঔষধের নাম ব্যাধিবিপরীত। যথা,—খদির, কুষ্ঠ নাশক; হরিদ্রা, মেহ-নাশক; অহিফেন অতীসার-রোধক ইত্যাদি।

৩। উভয় বিপরীত ঔষধ—যে সকল ঔষধ রোগের কারণ এবং রোগ উভয়কেই একদা প্রশমিত করিতে সক্ষম, সেই সকল ঔষধকে উভয়বিপ-

রীত ঔষধ বলা যায়। যথা,—
বাতজনিত শোথ রোগে দশমূল;
পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে তিক্তরস ইত্যাদি।

বিপরীতার্থকারী ঔষধ।

১। হেতু বিপরীতার্থকারী ঔষধ (নামান্তর) হেতুসদৃশ ঔষধ।
২। ব্যাধিবিপরীতার্থকারী ঔষধ (নামান্তর) ব্যাধিসদৃশ ঔষধ।
৩। উভয়বিপরীতার্থকারী ঔষধ (নামান্তর) হেতু-ব্যাধি উভয় সদৃশ ঔষধ।

১। হেতুবিপরীতার্থকারী ঔষধ—যে সমস্ত ঔষধ হেতুর সমান-ধর্ম্মী অর্থাৎ যে কারণে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার যেরূপ ধর্ম্ম বা ক্রিয়া তদ্রূপ ধর্ম্ম বা ক্রিয়াযুক্ত হইয়াও রোগ প্রতীকারে সক্ষম। সেই সমস্ত ঔষধকে হেতু বিপরীতার্থকারী ঔষধ বলা যায়। যথা,—মদ্যপান জনিত রোগে মদ্য।

২। ব্যাধিবিপরীতার্থকারী ঔষধ—রোগের যেরূপ ধর্ম্ম সেইরূপ ধর্ম্ম বা ক্রিয়াযুক্ত ঔষধকে ব্যাধিবিপরীতার্থকারী ঔষধ বলা যায়। যথা,—উন্মাদ রোগে ধুস্তুর; অম্লপিত্ত রোগে জম্বীর-রস; বমন রোগে মদন ফল (ট) ইত্যাদি।

(ট) এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। আমরা আয়ুর্ব্বেদসঞ্জীবনীর প্রথম সংখ্যায় এক স্থানে লিখিয়া ছিলাম,

২। উভয়বিপরীতার্থকারী ঔষধ—যে সমস্ত ঔষধ রোগের কারণ এবং রোগ উভয়ের সম-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াও রোগ প্রতীকারে সক্ষম, তাহাকে উভয় বিপরীতার্থকারী ঔষধ বলা যায়। যথা,—অগ্নি-দগ্ধ স্থানে অগ্নি-সন্তাপ এবং উষ্ণবীর্য্য বস্তুর প্রলেপ ইত্যাদি।

তিন প্রকার সদৃশ ঔষধের মোটামুটী লক্ষণ মাত্র বলা হইল। উহাদের পরস্পর প্রভেদ কি, প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক।

যে, "সদৃশচিকিৎসাপ্রণালী আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্ভূত" এই বিষয়ে পণ্ডিতবর পূজনীয় শ্রীযুক্ত এডুকেশন গেজেট সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, যে, "এই বিষয় আমরা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলাম না" উক্ত সম্পাদক মহাশয় আমাদের লিখিত বিষয় কতদূর প্রামাণিক তাহা অবগতির জন্য বিজয়রক্ষিত এবং আতঙ্ক-দর্পণ নামক দুইখানি নিদান-টীকায় লিখিত মদনফলের ব্যাখ্যা তাঁহার পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত ফলের বমন নিবারণবিষয়ে যেরূপ ক্ষমতা লিখিত আছে তাহা পাঠ করিয়াই তিনি সন্দিগ্ধ হইয়াছেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে প্রবন্ধলেখকেরও ঠিক ঐরূপ সন্দেহ ছিল। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের তান্ত্রিক পরিবর্ত্তন আলোচনা করিয়া লেখকের সেই সন্দেহের অপনয়ন হয়। বিজয়রক্ষিত বা আতঙ্ক-দর্পণ প্রায় একই টীকা। উহাদের ব্যাখ্যা বৈদিকসময়ে ঔষধপ্রয়োগের যেরূপ প্রণালী বা সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেই প্রণালী বা সূত্র অবলম্বন করিয়াই লিখিত, কিন্তু তান্ত্রিক সময়ে যে উহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা উক্ত টীকাকারদ্বয় অনুসন্ধান করেন নাই, অথবা তাঁহাদের অনুসন্ধানের আবশ্যকতাই হয় নাই। সেই পরিবর্ত্তন এস্থলে বিবৃত করা আমাদের প্রয়োজন নয়, তবে একটীমাত্র উদাহরণ দ্বারা তাহার আভাস দেওয়া গেল। বৈদিকসময়ে সর্পাহত ব্যক্তির শরীরে স্থাবরবিষ প্রয়োগ করিয়া তাহার চৈতন্য ও আরোগ্য সম্পাদন করা হইত। এবং এই বিষয় লইয়াই স্থাবর বিষ জঙ্গমবিষের ঔষধ এবং জঙ্গমবিষ স্থাবর বিষের ঔষধ এই সিদ্ধান্ত তৎকালে সকল চিকিৎসকই অবলম্বন করেন।

হেতুসদৃশ এবং ব্যাধিসদৃশ এই উভয়ে প্রভেদ এই যে, হেতু-সদৃশ কেবল হেতুরই (যে কারণে রোগ উৎপন্ন হয়) সদৃশ।

ভারত রচয়িতা ভগবান্ ব্যাসদেবও বিষপানে মৃতপ্রায় ভীমের সর্পদংশনে পুনশ্চৈতন্যসম্পাদন পক্ষেও ঐ যুক্তিই প্রদর্শন করেন। কিন্তু তান্ত্রিক-সময়ে সর্পাহত ব্যক্তির অচৈতন্যাবস্থায় সর্পবিষ অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিয়া তাহার আরোগ্য সম্পাদনের উপদেশ আছে। তান্ত্রিক গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলেই এরূপ বহুল উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে "শ্রূয়তে হি যথা লোকে বিষস্য বিষমৌষধম্" এই কালিদাসের উক্তি ও উক্ত তান্ত্রিক যুক্তিমূলক, দ্রব্যের অল্পমাত্রা যে বিরোধি-শক্তি প্রকাশ করে, ইহা তান্ত্রিক সময়েই প্রস্ফুট হয়। অরুণদত্ত দ্রব্যের গুণবৈপরীত্যপ্রস্তাবে লিখিয়াছেন।

"অণুশো: (তিলশো) নিষেব্যমানং বিষমপি সঞ্জায়তেঽমৃতসমানম্।
ভল্লাতকং সহ তিলৈস্তৎ কার্য্যমপি কুষ্ঠমুপহন্তি।
সংস্কারেণ লঘুভ্যঃ শক্তুভ্যঃ সিদ্ধপিণ্ডিকা গুরবঃ॥" ইত্যাদি।

অর্থাৎ পরিমাণ, দ্রব্যান্তরের সহিত মিশ্রণ, সংস্কারাদি বশতঃ দ্রব্যের বিপরীত ফল প্রকাশ পায়। যথা,—বিষ অণুমাত্রায় সেবন করিলে তাহার বিপরীত ফল প্রসব করে। ভল্লাতক কুষ্ঠ জনক হইলেও তিলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে কুষ্ঠ নাশক হয়। এবং লাজশক্তু লঘুপাক হইলেও পিণ্ডাকারে মোদকাদি প্রস্তুত করিয়া লইলে গুরুপাক হয়, ইত্যাদি। সদৃশ বস্তু অল্পমাত্রায় যে বিরোধি-ফল প্রকাশ করে, তাহা এইরূপ নিয়মে পরীক্ষা করিয়া তান্ত্রিক সময়ে অনেক ঔষধের প্রয়োগ হইয়াছিল। সেঁকো, কুচিলা, ভেলা প্রভৃতি তান্ত্রিক বিষাক্ত ঔষধের মূলসূত্র সম্বন্ধে তান্ত্রিকগণ প্রোক্ত বচনই উল্লেখ করিয়াছেন। রসেন্দ্র-চিন্তামণিপ্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে সহজেই উহার মীমাংসা হইতে পারে। আমরা সদৃশ চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত বলিলেও অবিকল হানিমানের চিকিৎসাই যে আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত ইহা বলি না। কোন কোন অংশে কিছু কিছু মতভেদও আছে। হয় ত হানিমানের চিকিৎসায় কিছু দোষও থাকিতে পারে। সেই দোষই মতভেদের কারণ। যাহা হউক এই বিষয় "প্রচলিত চিকিৎসাসমূহের দোষগুণবিচার" নামক প্রবন্ধে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে।

ব্যাধির যে প্রকার লক্ষণ হউক না কেন, তাহার সহিত সাদৃশ্যের কোন আবশ্যকতা নাই। মনে কর পান-দোষে অজীর্ণ, দাহ ও পিপাসাপ্রভৃতি অনেক প্রকার রোগ উপস্থিত হইতে পারে, ইহাদের যে কোন রোগ যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উপস্থিত হউক না কেন, সমস্ত রোগেই মদ্য প্রয়োগ করা যায়। ব্যাধিসদৃশ ঔষধ ঐরূপ নহে। অর্থাৎ যে কোন কারণে রোগ উপস্থিত হউক না কেন, ঔষধ কারণের সদৃশ না হইয়া রোগের সদৃশ হওয়া চাই। মনে কর ধুস্তূর-সেবনে উন্মাদ রোগ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু ধুস্তূর ভিন্ন অন্য কোন কারণে যদি উন্মাদ রোগ উপস্থিত হয়, সেই স্থলে ধুস্তূরপ্রয়োগ করাই যথার্থ ব্যাধি সদৃশ ঔষধ। উভয় সদৃশ ঔষধ উভয়ের মিশ্র লক্ষণ-যুক্ত। যথা,—পারদ জনিত ক্ষত রোগে পারদ অথবা অগ্নি দগ্ধ স্থানে ঐ অগ্নিরই সন্তাপ ইত্যাদি।

ক্রমশঃ

স্বাস্থ্যবিধান।

স্বাস্থ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূল। শরীর সুস্থ না থাকিলে সমগ্র পৃথিবী, পার্থিব সমুদায় ঐশ্বর্য্য—দান, ধ্যান, যোগ, ভোগ, মন আর কিছুতেই তৃপ্তি মানে না। অসুস্থ ব্যক্তির নিকট সমুদায় সংসার যন্ত্রণার আকর বলিয়া বোধ হয়। ভোগসুখ সকল সমল ও ক্ষণিক। ভোগে রোগ-ভয় আছে, কিন্তু স্বাস্থ্যসুখ বিমল ও দীর্ঘব্যাপী। ক্রমাগত ভোগ সুখ করিতে২ ভোগ্য বিষয়ে সুখানুভব করিবার শক্তির হ্রাস হইতে থাকে। কিন্তু স্বাস্থ্য সুখ বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। ভোগ সুখে কেবল যে ইন্দ্রিয় শক্তির হ্রাস হয়, তাহা নহে; পরন্তু তাহাতে মন অসৎ সংকল্পের আবাস হয় এবং বুদ্ধি-বৃত্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। কিন্তু যে সুখে আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন তিনেরই স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তাহাই স্বাস্থ্যসুখ। বিবিধ আয়োজনের ও

অনেক চেষ্টায় পর তবে ভোগ সুখ লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু স্বাস্থ্য সুখ অনেক পরিমাণে আয়ত্তাধীন।—রাজা বা ধনী না হইলে—বিধিমত চেষ্টা না করিলে ভোগ সুখের অধিকারী হওয়া যায় না। কিন্তু কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি নির্দ্ধন—সকলেই স্বাস্থ্য সুখের অধিকারী। যাহা অগ্রে সম্মোহনকর, কিন্তু পরিণামে বিষময়, তাহা ভোগ সুখ—তাহাই তামসিক; কিন্তু যাহা অগ্রে অপ্রীতিকর, কিন্তু পরিণামে রমণীয়, তাহাই স্বাস্থ্য সুখ—তাহাকে শাস্ত্রকারগণ সাত্ত্বিক বলিয়া গিয়াছেন। বৈদ্যকে আছে যে, যাহাতে দেহ সমদোষ, সমাগ্নি ও সমধাতু হয়—যে সুখে আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন তিনিই প্রসন্ন থাকে, তাহাই স্বাস্থ্য সুখ। সুতরাং আত্মধর্ম্মে মনোধর্ম্মে ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে ও দেহধর্ম্মে যে সুখ লাভ হয়, অথবা আত্মা, ইন্দ্রিয় ও দেহ ইহাদের একতান সামঞ্জস্যে যে সুখ হয়, তাহাকেই আমরা স্বাস্থ্য সুখ বলি। যাহা দেহের অনুকূল, কিন্তু মনের প্রতিকূল, যাহা আত্মার অনুকূল, কিন্তু দেহের প্রতিকূল তাহাকে স্বাস্থ্যসুখের মধ্যে গণনা করা যায় না। কিন্তু যাহা জীবের দেহ, মন ও আত্মা তিনেরই উপযোগী তাহাকেই স্বাস্থ্যসুখ বলা যায়। এই বিবেচনায় আর্য্যগণের সমগ্র আচার ব্যবহার স্বাস্থ্যসুখের মধ্যে পরিগণিত। ধর্ম্মবিবেচনায় যদিও আর্য্যগণ আচার প্রতিপালন করিয়া থাকেন—কিন্তু দেহের অবিরোধী ধর্ম্মোৎপাদ্য সুখও ইহাদের স্বাস্থ্যের প্রতিপোষক। এই কারণ আয়ুর্ব্বেদের স্বাস্থ্য প্রকরণে স্মৃতি শাস্ত্রের অধিকাংশ আচার প্রকরণ নিরূপিত হইয়াছে। দেহ, মন ও আত্মা লইয়াই মনুষ্য। এই তিনের সামঞ্জস্যসুখই মনুষ্যের স্বাস্থ্য। কিন্তু আমরা স্থূল বুদ্ধিতে কেবল দেহোৎপাদ্য সুখকেই মনুষ্যের স্বাস্থ্য বলিয়া বিবেচনা করি এবং এই দেহোৎপাদ্য সুখের দিকে কেবল দৃষ্টি প্রসারিত করি বলিয়া ভোগ সুখের সহিত স্বাস্থ্য সুখের প্রভেদ বিবেচনা করিতে পারি না।

আজ কাল জনসমাজ ভোগসুখের জন্য যে প্রকার ব্যস্ত হইয়াছে, স্বাস্থ্যসুখের জন্য তাহার কিয়ৎ পরিমাণও চেষ্টা দেখা যায় না। অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বিবিধ ভোগসুখে মগ্ন থাকিব, মনুষ্যের ইহাই একমাত্র কর্ম্ম এবং চেষ্টা। ভোগ-সুখ উৎপাদন করিবার জন্য কল, কৌশল, যন্ত্র, বিজ্ঞান ও শিল্পাদির দিকেই মানববুদ্ধির একমাত্র প্রেরণা। যত কিছু বাহ্য আড়ম্বর দেখিতে পাও, সবলি ভোগসুখের জন্য। স্বাস্থ্যসুখের জন্য এত আড়ম্বর—এত আয়োজনের অতি অল্পই প্রয়োজন হইয়া থাকে। দিনে দিনে সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে মানবায়ু হ্রস্ব ও মানবজীবন রোগময় হইতেছে, স্বাস্থ্যের সহিত এই বাহ্য সভ্যতার কতদূর সম্বন্ধ, এতদ্দ্বারা অনায়াসেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। সভ্য সমাজসকল এক্ষণে স্বাস্থ্যের অনুকূলভাবে অবস্থিত নয়, সামাজিকতার অনুসরণ করিতে গিয়া প্রায় সকলকেই কিছু না কিছু পরিমাণে স্বাস্থ্য-সুখে জলাঞ্জলি দিতে হয়। সভ্য-সমাজ সকলের ধন-বিভাগ, শ্রম-বিভাগ, কার্য্য-কৌশল স্বাস্থ্য-দৃষ্টিতে সম্পন্ন নয়।

অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ ও আলোক প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ-নিচয় স্বাস্থ্যের বাহ্য উপাদান। নির্ম্মল প্রজ্ঞা ও নিষ্পাপ অন্তঃকরণ ইহার আন্তরিক উপাদান। অন্তরে আন্তরিক চেষ্টা হইতেছে ও বাহ্যে সমগ্র প্রকৃতি সেই চেষ্টার সহায়তা করিতেছে, ইহাতেই স্বাস্থ্য বিধৃত হয়। প্রাকৃতিক পদার্থসকলের পরিমিত সেবনেই স্বাস্থ্য-সুখলাভ করা যায়। সভ্য জগতের বিষম আড়ম্বরের মধ্যে পতিত হইয়া যে সকল পদার্থকে বা যেসকল আচারকে আমরা এক্ষণে গণনার মধ্যে আনয়ন করিনা, মনুষ্যের স্বাস্থ্য সেই সমুদায় পদার্থের বা সেই সমুদায় আচারের উপরেও নির্ভর করে। জল, বায়ু, আলোক ও আহার্য্য ইহাদের সেবনে একটু ইতর

বিশেষ হইলেই মনুষ্যের স্বাস্থ্যের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল পদার্থের সহিত মনুষ্যের ঘনিষ্ঠতম যোগ ও দেখা যায়। অতি তুচ্ছ দ্রব্যে বা অতি তুচ্ছ কারণে যেমন আমাদের রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমাদের স্বাস্থ্যও তুচ্ছ কারণ-সমূহে রক্ষিত হইতেছে।

বাহ্যে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কার-শোভিত হইয়া বিরাজ কর, অতি প্রশস্ত সুরম্য অট্টালিকায় বিবিধ-বিলাসদ্রব্য-বেষ্টিত হইয়া অবস্থান কর, কিন্তু যদি যথাকালে শৌচাদি ক্রিয়া সম্পন্ন না হইয়া থাকে, তবে তোমার নিজের মন আর তোমাকে পবিত্র বলিবেনা। উহাতে শরীর ম্লান হইয়া গ্লানি অনুভব করিতে থাকিবে, দৈহিক ক্রিয়া সকল বিকৃত ভাবে সম্পাদিত হইতে থাকিবেক। বায়ু বৃদ্ধি হইয়া উদর স্ফীত হইয়াছে, বুদ্‌২ শব্দ অনুভূত হইতেছে, একটু অধিককাল শরীরে জল লাগাতে মস্তিষ্ক ভার হইয়াছে, দেখিবে, তখন রাজনীতি, সমাজনীতি, বিষয় ও বিভব—মন আর কিছুরই পানে ধাবিত হইবেনা। আপনা হইতেই মন তখন ঐসকল স্থানে বিচরণ করিতে থাকিবেক। শারীরিক রোগ বিমুক্ত হওয়াতে কত সময়ে সম্রাজ্য-লাভেরও অধিক আনন্দ বোধ হয়, ইহা কেনা স্বীকার করিবেন? রুগ্নব্যক্তি সাংসারিক বাহ্য বিষয়বিভবকে অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা করে। বাস্তবিকও স্বাস্থ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে সাংসারিক সমুদায় লাভই তুচ্ছ কথা। কিন্তু যাহা তুচ্ছ কথা, লোকের আকর্ষণ এক্ষণে সেই দিকেই অধিক ধাবিত; যাহা মানবজীবনের একমাত্র প্রার্থনীয়, লোকে এক্ষণে তাহাকেই নগণ্যের মধ্যে গ্রাহ্য করিয়া থাকে। অর্থ উপার্জ্জনজন্য লোকের যে প্রকার চেষ্টা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাহার কিয়ৎ পরিমাণও চেষ্টা নাই। মনুষ্য পঞ্চভূতসমবায়ে গঠিত, প্রাকৃতিক পদার্থ তাহার জীবনের অন্ন, সুতরাং প্রাকৃতিক পদার্থনিচয়ের প্রতি তাহার অধিক

মনোযোগী হওয়া উচিত। এজন্য পান, ভোজন, আসন ও শয়নাদির বিধি আমাদের পক্ষে যেরূপ গুরুতর বোধ হয়, জগতে অপর কোন কার্য্যই আমাদের পক্ষে ততদূর গুরুতর নয়। কিন্তু আমরা কালে কালে এতদূর বিকৃত হইয়া পড়িতেছি, বিকৃতির মধ্যে—কৃত্রিমতার মধ্যে বাস করিয়া আমরা এতদূর আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি, যে, যাহার সহিত আমাদের জীবনের ঘনিষ্ঠতম যোগ, তাহাকে আমরা দূরের পদার্থ মনে করি ও যাহাদের সহিত আমাদের জীবনের দূরতম সম্বন্ধ, তাহাদিগকে আমরা নিকট সম্বন্ধীয় জ্ঞান করি। হস্তমৃত্তিকা উই মৃত্তিকাতে করিতে নাই, একথা লোকের নিকট এক্ষণে উপহাসাস্পদ, কিন্তু অঙ্গরক্ষার (জামার) বোদাম ঝিনুকে হইলে ভাল হয়, এই কথায় লোকের অধিক মনোযোগ হইয়া থাকে। যে স্বাস্থ্য জগতের একমাত্র বরণীয়, সেই স্বাস্থ্যবিধি পালন করিবার জন্য লোকের এক্ষণে অবকাশ নাই। কিন্তু স্বাস্থ্য বিহীনে লোকের যে বিষয় বিভব তুচ্ছ, সেই বিষয় বিভব উপার্জ্জনেই লোকের সম্পূর্ণ অবকাশ।

আমাদের অন্নপানীয় প্রস্তুত করা আমরা পথিকের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি এবং পথিকের ব্যয়ের ভার আমরা স্বয়ংই গ্রহণ করিয়া তজ্জন্য ব্যস্ত থাকি। যাহা নিকটের বস্তু তাহা দূরে গেল এবং দূরের বস্তু এক্ষণে নিকট হইল। কল কৌশলের নিয়ম কিসে রক্ষা হয়, সাধারণতঃ লোকে তজ্জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু দেহের কৌশল কিসে সুচারু নির্ব্বাহ হয়, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। এত কৃত্রিমতার ভিতর, এত বিকৃতির ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া যদি মনুষ্য অল্পায়ু না হইবে, তবে প্রকৃতিই যে অপ্রকৃতি হয়?

আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে নিন্দাবাদ করি, অশিষ্ট ও অসভ্য জ্ঞান করি, কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের এতদূর

দৃষ্টি ছিল, যে এক্ষণে সভ্যজগৎ তাহা কল্পনাই করিতে পারে না। তাঁহারা আচার প্রতিপালন করাকে সকল ধর্ম্মেরই মূলীভূত বলিয়া জানিতেন। অগ্রে আচার প্রতিপালন না হইলে তাঁহারা অর্থচেষ্টা বা ধর্ম্মচেষ্টায় ব্যস্ত হইতেন না। প্রতিদিন শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য যে সকল আচরণ করিতে হয়, ভৃত্যবর্গের উপর তাহার ভার না দিয়া অগ্রে নিজে সেই সকল সমাধা করিয়া পশ্চাৎ অর্থ বা ধর্ম্ম চেষ্টায় ধাবিত হইতেন। পূর্ব্বে আর্য্যসমাজ এতদূর আত্মজ্ঞানী ছিল, যে যাহারা আচার বা স্বাস্থ্য প্রতিপালন না করিত, তাহারা কেহই আর্য্যসমাজ-ভুক্ত হইতে পারিত না, ম্লেচ্ছ বোধে আর্য্যসমাজ তাহাদের সংস্রবে রোগ হইবার ভয়ে দূরে থাকিত। আমাদের আর্য্য শাস্ত্রসকলে বিজ্ঞানের তথ্য তত পাও বা না পাও, ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় আচার প্রতিপালনে কিরূপে শরীর সুস্থ রাখিতে হয় তাহা দেখিতে পাইবে। ভোগ সুখ অপেক্ষা আর্য্যগণ স্বাস্থ্যসুখকে এত বরণীয় মনে করিতেন, যে উহা তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। স্বাস্থ্য-প্রতিপালন না করিলে নিরয়গামী হইতে হয় বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাঁহারা স্বাস্থ্যের উদ্দেশে এত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিষয় সকল চিন্তা করিয়াছিলেন, যে এত দূরবর্ত্তী সময়েও ঐ সমস্ত বিষয় কিরূপে উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ব্রাহ্ম্য-মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া কি প্রকারে শৌচকার্য্য সমাধা করিতে হয়, স্নান করিবার কালে স্রোতের কোন অভিমুখে স্নান করিতে হয়, কোন্ কোন্ দ্রব্য দন্তধাবনে প্রশস্ত, কোন্ কোন্ সময়ে শৌচ-কার্য্য প্রশস্ত, শয়ানকালে কোন্ কোন্ শিরে শয়ন করিলে স্বাস্থ্য-রক্ষা হয়, কোন্ কোন্ বস্ত্র কোন কোন কালে পরিধেয়, ইত্যাদি হিতকর বিষয় আর্য্যগণের শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত আছে, তদ্রূপ অন্য কোন জাতির শাস্ত্রে আছে কি না সন্দেহস্থল।

এমন অনেক আয়ুষ্য শিষ্টাচারের উল্লেখ আছে, যে আজি কালির বিজ্ঞানের অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও সেই সকলের মর্ম্ম উদঘাটনে সমর্থ নহে। আমাদের আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসিতস্থান তত ব্যাপক হউক বা না হউক, কিন্তু ইহার স্বাস্থ্য প্রকরণ যেমন সুন্দর, বোধ হয়, কোন জাতির চিকিৎসাশাস্ত্রে সেই রূপ নাই। বাস্তবিকও স্বাস্থ্য প্রকরণ ব্যাপক হইলে ঔষধপ্রকরণব্যাপক হউক বা না হউক তাহাতে ক্ষতি কি? যে জাতি স্বাস্থ্য রক্ষণে সম্যক যত্নশীল, রোগের ঔষধ অনুধাবনে তাহাদের তত আয়াস গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই, বাহ্য বিষয়ের দিকে যাঁহাদের দৃষ্টি অধিক তাঁহারা অধিক আত্মজ্ঞানী, না যাঁহাদের শরীরের দিকে দৃষ্টি অধিক তাঁহাদের বিশেষ আত্মজ্ঞান আছে বলিতে হইবেক?

বিকৃত আহার ও বিকৃত আচরণ দ্বারা রোগ উৎপাদন করিয়া তাহার ঔষধ অনুসন্ধান করা অপেক্ষা যাহাতে মূলে রোগ উপস্থিত হইতে না পারে সেই বিষয়ে সদা জাগরূক থাকা যে পরিণাম-দর্শীর কার্য্য ইহা কে না স্বীকার করিবেন? যাহাতে আদৌ রোগ উৎপন্ন না হয় এজন্য প্রাচীন আর্য্যগণ অনাগত-বাধ প্রতিষেধ প্রকরণের সম্যক্ প্রশংসা ও আলোচনা করিয়া থাকেন। কেন না, গাত্রে পঙ্ক লেপন করিয়া উহা ধৌত করা অপেক্ষা পঙ্কস্পর্শ না করাই সাধু সম্মত কার্য্য।

যেমন রোগের অনুভূতি সকলের থাকে স্বাস্থ্যের অনুভূতি তদ্রূপ সকলের থাকে না। মনুষ্য সমাজ এতদূর বিকৃত হইয়াছে, যে প্রকৃত স্বাস্থ্য-সুখ প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। শরীরের ভিতর একটুও গ্লানি নাই মন ও আত্মা সকলই সুপ্রসন্ন, এমন ব্যক্তি সংসারে অতি বিরল। সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ বা পৈতৃক বা মাতৃক বীজদোষে পুষ্কলাঙ্গ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই; কাহারও দেহে বা

কৌলিক রোগ চিরবসতি করিতেছে; কেহবা অযথা ইন্দ্রিয় সেবা করিয়া জন্মের মত স্বাস্থ্যবিহীন হইয়া ভগ্ন-তরীর ন্যায় সংসার তরঙ্গে সশঙ্কভাবে ভাসমান রহিয়াছে; দরিদ্র অবস্থায় জন্মগ্রহণ করায় অপরিমিত শ্রম করিয়া কেহবা স্বাস্থ্যহীন হইয়াছে, বিবিধ চিন্তায় আক্রান্ত থাকাতে কাহারও বা স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিয়াছে—এইরূপ সমুদায় লোকের মধ্যেই একটী না একটী ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃত স্বাস্থ্য কি তাহা মনুষ্য সমাজে এক্ষণে অন্বেষণ করিলে পাওয়া যায় না।

আপনাতে আপনি অবস্থান করার নাম স্বস্থ বা প্রকৃতিস্থ। কিন্তু সমুদায় বিকৃতির মধ্যে মনুষ্যের আদিম প্রকৃতি কি তাহা এক্ষণে অনুভব করা দুরূহ ব্যাপার; প্রকৃত সুস্থ শরীরে দৈহিক শ্বাস প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া সকল কি পরিমাণে? কিরূপ ভাবে নির্ব্বাহ হওয়া উচিত, নিদ্রা, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি দৈহিক ব্যাপার সকল কিরূপে সমাধা হওয়া অথবা প্রবৃত্তি নিচয়ের উদ্রেক কোন কালে কিরূপ ভাবে হওয়া যে মনুষ্য প্রকৃতির স্বতঃ সিদ্ধ তাহা এক্ষণে কে বলিবে? সুতরাং স্বাস্থ্য শব্দ আমরা আপেক্ষিক ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদের অপেক্ষা আর একজন অপেক্ষাকৃত সুখী বা দুঃখী এইরূপ বিবেচনায় যেমন সুখ দুঃখ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, স্বাস্থ্য কথাও তদ্রূপ চলিতেছে, তথাপি মানব সাধারণের স্বাস্থ্য পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ স্বাস্থের যেরূপ সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, আয়ুর্ব্বেদীয় স্বাস্থ্যের আদর্শের সহিত অপরাপর জাতির স্বাস্থ্যের আদর্শ কিরূপ কি কি মূলকারণেই বা স্বাস্থ্য বিকৃত হইয়া থাকে, তদ্বিষয় ক্রমে আলোচিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

রোগ ও রোগের বিভাগ।

২য় খণ্ডে প্রকাশিতের পর।

অতি বলিষ্ঠের সহিত দুর্ব্বলের বাহুযুদ্ধাদিবশতঃ শারীর যন্ত্রাদির বিলোড়ন বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিনাশ বা অকর্ম্মণ্যতা প্রভৃতি যে সমস্ত আগন্তু [১] পীড়া উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে সংঘাত-বল-প্রবত্ত রোগ বলে। এই শ্রেণীর পীড়া সমূহ আধিভৌতিক রোগ মধ্যে গণ্য। ইহা স্থূলতঃ দুই প্রকার। যথা,—

১ শস্ত্রাদিকৃত ;—২ ব্যাঘ্রাদিপ্রাণি-কৃত।

তরবারি, বর্ষা, হস্তের মুষ্টি প্রভৃতি শস্ত্র, বা তীর, গুলি, লাটি প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা আঘাত, অথবা পর্ব্বত, বৃক্ষাদি অত্যুচ্চ স্থান হইতে নিম্নে পতন, ইত্যাদি কারণে শারীরযন্ত্রাদি অতিশয় আহত হওয়াতে আংশিক বিকৃতিপ্রাপ্ত বা বিপর্য্যস্ত এবং বাতাদিদোষ পদার্থের প্রকৃতির অন্যথাভাব হইলে, তাহাকে শস্ত্রাদিকৃত আগন্তু রোগ বলে।

ব্যাঘ্র, ভল্লুক, কুক্কুর, সর্প প্রভৃতি জন্তুতে দংশন করিয়া কোনও স্থান ক্ষত করিলে, তদ্দ্বারা শরীরের বিকৃতি এবং তাহাদিগের বিষ দ্বারা দেহের যে অন্যথাভাব উপস্থিত হয়; তাহাকে এস্থলে ব্যালাদি-কৃত আগন্তু রোগ বলা হইয়াছে।

---

[১] আগন্তু শব্দে অন্যান্য স্থলে, অপরাপর কারণ সম্ভূত কতক গুলি রোগকেও বুঝায়। যথা—

"অভিঘাতাভিষঙ্গাভ্যামভিচারাভিশাপতঃ।
আগন্তু র্জায়তে দোষৈর্যথাস্বং তং বিভাবয়েৎ॥" (চরক)

অর্থ এই যে, শস্ত্রাদিধারণ অভিঘাত, কোনও বিষয়ে মনের অতিশয় আসক্তিরূপ অভিষঙ্গ, যজ্ঞ বিশেষ দ্বারা অভিচার এবং সিদ্ধ পুরুষদিগের অভিশাপ দ্বারা যে রোগ হয়, তাহার নাম আগন্তু।

কিন্তু, ঐরূপ বিভাগ দ্বারা প্রস্তাবিত বিভাগের কোনও হানি নাই। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংজ্ঞা প্রদান করিলেও মূল পদা-র্থের অন্যথা হয় না।

সংঘাতবলপ্রবৃত্তা য আগন্তবো দুর্ব্বলস্য বলবদ্ বিগ্রহাদিত্যাদিঃ। সুশ্রুতঃ।

আধিদৈবিক রোগসকল প্রথমতঃ তিন শ্রেণীতে পরিগণিত। যথা.—১ কাল বল-প্রবৃত্ত ;—২ দৈব বল-প্রবৃত্ত ;—৩ স্বভাব-বল-প্রবৃত্ত।

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি কালের অর্থাৎ ঋতু সকলের প্রাদুর্ভাব সময়ে, শীতগ্রীষ্মাদির অযথা সেবন দ্বারা শরীরে যে জড়তা, দাহ, কম্প অথবা জ্বর ও ব্রণ প্রভৃতি রোগ জন্মে, উহাদিগের নাম কাল-বল-প্রবৃত্ত।

কাল-বল-প্রবৃত্ত রোগেরও দুইটী শ্রেণী। যথা,—

১ অব্যাপন্ন ঋতুতে উৎপন্ন ;—২ ব্যাপন্ন ঋতুতে উৎপন্ন।

পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্যপ্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ সকল যে স্থানে থাকাতে, বা যে ভাবে গমন করাতে বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত প্রভৃতি ঋতুগুলি পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সকল ঘটনার কোনরূপ অন্যথাভাব না ঘটিলে, ঐ সকল ঋতু এক প্রকৃতিতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ শীতের কালে শীত এবং শীতপ্রধানস্থানে অধিক শীত আর গ্রীষ্মের কালে গ্রীষ্ম এবং গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে অধিক গ্রীষ্ম, ইত্যাকারে ঋতুসকলের আবির্ভাব হয়। ঐরূপ ঋতুকে অব্যাপন্ন অর্থাৎ অবিকৃত ঋতু বলে। তাদৃশ ঋতুতে যে রোগ জন্মে, তাহার নাম অ-ব্যাপন্ন-ঋতু-জাত। যথা,—শরৎ ঋতুতে অর্থাৎ কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে [২] পিত্তজন্য জ্বরাদি রোগ, বসন্ত ঋতু ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে শ্লেষ্মজন্য রোগ এবং প্রাবৃট্ ঋতু আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে বাতজন্য রোগসকল।

(ক্রমশঃ)

[২] আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বাত পিত্ত ও একরূপ রোগোৎপাদক পদার্থদিগের সঞ্চয় প্রকোপাদি নির্দ্ধারণার্থ যে ঋতুগণনা হইয়া থাকে, সেই ঋতু শ্রেণীর মধ্যে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস শরৎ, ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্ত, এবং আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস প্রাবৃট বলিয়া গণ্য হয়।

সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৬ অ, দ্রষ্টব্য।

তস্যাশিতাদ্যাহারাৎ বলং বর্ণশ্চ বর্দ্ধতে।
যস্যর্ত্তুসাত্ম্যং বিদিতং চেষ্টাহারব্যপাশ্রয়ম্॥
হরেদ্বসন্তে শ্লেষ্মানং পিত্তং শরদি নিহরেৎ।
বর্ষাসু শময়েদ্বায়ুং প্রাগ্বিকারসমুচ্ছ্রয়াৎ॥

চরক। সূত্র, ৬।

কালতত্ত্ব।

"কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতি প্রজাঃ"। মহাভারত।

"আমি" এই সাধারণ জ্ঞান প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে বটে, কিন্তু তাহাতে "আমি" কিংস্বরূপ? দেহের কোন্ অংশ আমি? বা "আমি" কি বস্তু? ইত্যাদি প্রকার প্রশ্নের প্রকৃত সিদ্ধান্ত সাধারণের পক্ষে যেরূপ দুর্গম, সেইরূপ, কাল কি? লোকে তাহা সাধারণ ভাবে জানিলেও, সকল ব্যক্তির পক্ষে উহার প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া দুরূহ। এই জন্যই কালতত্ত্বানুসন্ধায়ী প্রাচীন পণ্ডিতগণের এত মতভেদ। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা প্রস্তাবিত প্রবন্ধে বর্ণন করিব। বলিতে পারিবেন না যে, আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনীতে কালতত্ত্ব বর্ণন করিবার প্রয়োজন কি? কেন না, কালতত্ত্ব অবগত হওয়া ব্যক্তিমাত্রেরই প্রয়োজনীয়। যিনি যে কার্য্য করুন না কেন, সকল ব্যক্তিকেই কাল অকাল জানিতে হয়। যিনি কৃষি করিবেন, তিনি যদি কালাকাল না জানেন তবে তাঁহারঅনেক ক্ষতি। যিনি রোগনির্ণয় করিবেন, যিনি ঔষধ প্রয়োগ ও ঔষধ প্রস্তুত করিবেন, কালতত্ত্ব না জানিলে তিনি বিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারিবেন না। কাল সকলেরই প্রয়োজনীয়, কাল ছাড়িয়া, কালজ্ঞানে অভিজ্ঞ না হইয়া, কেহই কিছু করিতে পারেন না, পারিবেনও না। অতএব, কালতত্ত্ব নির্ণয় করা আয়ু-

র্ব্বেদের অপ্রাসঙ্গিক নহে। কালতত্ত্ব নির্ণীত হইলে, অবশ্যই তদ্দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের প্রধান প্রধান প্রয়োজন সাধিত হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কোন দার্শনিক বলিয়াছেন, কাল একটি প্রত্যক্ষাতীত দ্রব্য পদার্থ এবং মহৎ প্রকৃতি হইতে জন্য-কীটাণু পর্য্যন্ত বস্তু মাত্রের পরিণামকারণ। ন্যায়বাদিগণ কালিক সম্বন্ধ নামে একটি সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া ঐ সম্বন্ধটী জগতের উপর বিস্তৃত ভাবে নিক্ষেপ করেন; সুতরাং তাঁহাদিগের মতে কাল জন্য-বস্তু-মাত্রেরই কোন এক প্রকার জনক এবং পূর্ব্বাপর জ্ঞানের সাধক। পৌরাণিকেরা বলেন, জগদভ্যুদয়ের যতগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে কালই প্রধান এবং যাহা কিছু ঘটিতেছে, ঘটিবে, তাহারও প্রধান কারণ কাল; সুতরাং কালই জগতের দ্বিতীয় কর্ত্তা।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক সাঙ্খ্যাচার্য্য বৈশেষিক মত খণ্ডন উদ্দেশে বলিয়াছেন, কাল কিছুই নয়, কেবল অনাগতাদি-ব্যবহার-ভেদক উপাধি মাত্র। বিখ্যাত ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরাও স্ব স্ব গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক-প্রধান সাঙ্খ্যাচার্য্যের অনুসরণ পূর্ব্বক ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কাল বিষয়ে এইরূপ মতভেদ হইলেও মনুষ্য নাম ধারী জীব-গণের অস্থি মাংসে জড়িত হইয়া কাল যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের এক প্রকার প্রধান সাধক হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদিকগণ কালতত্ত্বে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না। আয়ুর্ব্বেদের এমন অনেক বিষয় আছে যে, কালই তাহার একমাত্র নিয়ম, কালের রহস্যভেদ না হইলে সেই সকল তত্ত্বের আভাসও বুঝা যাইতে পারে না। তৃতীয়ক বা চাতুর্থক জ্বর এক দিন বা দুই দিন একবারে অদৃশ্য হয়, এবং পুনরপি আসিয়া উপস্থিত হয়। কালতত্ত্বে সুপণ্ডিত না হইলে, কে ইহার তথ্য শিখাইতে পারে?

উন্মাদরোগ ত্রয়োদশ বর্ষে উৎপন্ন হইলেই বা কেন অসাধ্য হয়? কালতত্ত্বজ্ঞই ইহার মূল রহস্য জানিতে পারেন।

ক্যাণ্ট নামক সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মণ দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত কালকে জ্ঞানমাত্রে নিয়তোপস্থিতিক এবং জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থবর্গের পরস্পর সম্বন্ধঘটক মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ের অন্যতর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

Time and space are ultimate mental forms.

স্পেন্সার নামক বিখ্যাত ইংলণ্ড দেশীয় পণ্ডিত ধারাবাহিক জ্ঞান সমূহের ধারাগত সান্নিবেশিক সম্বন্ধগণের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া কালকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

And Time in general as known to us, is the abstract of all relations of position among successive states of conciousness.
Herbert Spencer Principles of Phylology, Vol. II.

এই দুই ইংরাজ পণ্ডিত কালতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ অংশ বা ছায়া মাত্র বুঝিয়া ছিলেন, সংশয় নাই। কিন্তু ইংরাজ পণ্ডিতের উপদিষ্ট কালজ্ঞান আমাদের দুরবগাহ আয়ুর্ব্বেদের বহিরাবরণও স্পর্শ করিতে পারে নাই বলিলেও বলিতে পারি। আমাদের বিবেচনায় যোগসিদ্ধ বৈদিক ঋষিদিগের উপদিষ্ট কালতত্ত্ব আয়ুর্ব্বেদবিদ্গণের বিশেষ উপকারী। বৈদিক কালতত্ত্ব কিরূপ তাহা শুনুন।

বৈদিক ঋষিরা কালতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য কালকৃত কার্য্য সমূহের মূল ভাব প্রদর্শনের জন্য, প্রথমত জীবাজীবগত সমস্ত ভৌতিক বিক্রিয়ার কারণীভূত মণ্ডলতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

"স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষ-মৈতিহ্যমনুমানশ্চতুষ্টয়ম্।
এতৈরাদিত্যমাণ্ডলাং সর্ব্বৈরেব বিধাস্যতে।"

পণ্ডিতগণ স্মৃতি, বেদ, পুরাণ, জ্যোতিষ ও শিষ্টাচার প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া আদিত্য মণ্ডলের নিয়মিত বিধানই জানিয়া থাকেন অথবা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

ঋষি কি বলিতেছেন? বলিতেছেন যে, সূর্য্যমণ্ডলই কাল-নির্ব্বাহক যন্ত্র, উহারই বিচিত্রক্রিয়া কাল-কায়ার মূলতম রহস্য। ঋষি তাহা পরমমন্ত্রেই সঙ্কেত করিয়াছেন। যথা—

"সূর্য্যোমরীচিমাদত্তে সর্ব্বস্মাদ্ভুবনাদধি।
তস্যাঃ পাকবিশেষেণ স্মৃতং কালবিশেষণম্॥"

যজুর্ব্বেদোক্ত অরুণকেতুক মন্ত্র।

অন্যার্থ—"ভুবনগতং সর্ব্বভুতজালং অধিকৃত্য রসবীর্য্যবিপাকাদিভিঃ তত্তদনুগ্রহসমর্থং মরীচিং সূর্য্য আদত্তে স্বীকরোতি। তৎকৃতেন ভুতপাক-বিভেদেন নিমেষাদিপরার্দ্ধপর্য্যন্তঃ কালবিভেদোহস্মাভিরবগতো ভবতি।

ঐ সূর্য্যমণ্ডল ভুবনস্থ ভুত অধিকার করিয়া রস, বীর্য্য ও বিপাক প্রভৃতি পরিণামরূপ অনুগ্রহ শক্তিসম্পন্ন রশ্মি বা তাপ স্বীকার করিতেছেন। তৎকৃত বিচিত্রভুতবিপাক প্রভেদ দ্বারা আমরা নিমেষ হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত অনুভব করিয়া থাকি।

এই আশ্চর্য্য আর্য্যবিজ্ঞানের বা এই অদ্ভুত কাল রহস্যের সহিত আয়ুর্ব্বেদের যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা অন্য এক বিস্তীর্ণ প্রবন্ধে বর্ণন করিব। ক্ষণপরিণামঘটিত জীর্ণত্ব পুরাণত্ব প্রভৃতি সমস্তই সূর্য্যকিরণের অধীন, ইহা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝান যাইতে পারে। মহামতি কাণ্ট যে জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থবর্গের পরস্পর সম্বন্ধঘটক মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ের অন্যতরকে কালসংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন তাহা উত্তম হইত যদি তিনি উল্লিখিত সম্বন্ধটী উত্তমরূপে বুঝাইয়াদিতে পারিতেন। যাহাহউক, বৈদিক কালতত্ত্বটী আমরা এই প্রবন্ধে বিস্তৃতরূপে না বলিয়া সংক্ষিপ্ত কথায় তাহার আভাসমাত্র বর্ণন করিতেছি, মনোনিবেশ করুন।

প্রত্যেক বস্তুর অঙ্গে অবিচ্ছেদে ক্রিয়োৎপত্তি হইতেছে, পরন্তু তাহা আমরা এই অনেকাগ্রতাকালে বোধগম্য করিতে পারি না।

সেই সমুৎপন্ন প্রত্যেক ক্রিয়া এত সূক্ষ্ম যে তাগ আমাদের বুদ্ধি অধিকারের বহির্ভূত। পর পর, বা উপর্য্যুপরি, ২।৩।৪ এবং-ক্রমে শত শত ক্রিয়া উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা আমাদের মানস প্রত্যক্ষের অবিষয় থাকে। বহু ক্রিয়া অতীত হইলে পর, ক্রিয়াশ্রিত দ্রব্য যখন স্থূলতম বিক্রিয়ার অধীন হয়, রূপাদির অন্যথা হওয়ায় অন্য এক নূতন আকারে পরিদৃষ্ট হয়,তখন তাহা আমরা বুদ্ধ্যারোহ করিতে পারি, তৎপূর্ব্বে পারি না। এক ক্রিয়ার পর অন্য ক্রিয়া, তৎপরে আবার অন্য ক্রিয়া, এতদ্রূপ ক্রমে বহু ক্রিয়া উৎপন্ন হওয়াতেই যে ক্রিয়াপরম্পরার দ্বারা বস্তুর সারূপ্যপ্রচ্যুতি হয়,ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। আপনার এক খণ্ড জীর্ণ বস্ত্র লইয়া যৎকিঞ্চিৎকাল চিন্তা (মানসক্রিয়া উত্থাপন) করিলেই উক্ত সিদ্ধান্তের প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এক বৎসর পরে দেখিলাম, আমার নূতন বস্ত্র পুরাতন হইয়াছে অর্থাৎ জীর্ণ হইয়াছে। ভাবিয়া দেখুন, সেরূপ পুরাতনতা বা সেরূপ জীর্ণতা এক দিনে হইয়াছে কি বহু দিনে হইয়াছে? সেরূপ জীর্ণতা এক দিনে হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাহা বহুদিনেই হইয়াছে এবং তাহা ক্ষণপরম্পরাক্রমে ও সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মক্রমেই হইয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে সেই একবৎসরকালকে বিভাগ করিয়া ক্ষণ করুন এবং তদ্রূপ জীর্ণতাকে বিভাগ করিয়া সূক্ষ্ম করুন। দেখিতে পাইবেন, বস্ত্রখানি ক্ষণপরম্পরাক্রমে ও ক্রমিক সূক্ষ্মতম সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মরূপে অল্পে অল্পে বিকৃত হইয়া তদ্দশায় উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্রূপ ক্রিয়াতত্ত্বের দ্বারা জানা যায় যে, যে গণিত ক্রিয়াকে আমরা বৎসর নাম দিতেছি, সেই অগণিত ক্রিয়াই তাহাকে অল্পে অল্পে ও সূক্ষ্মতমাদি ক্রমে জীর্ণতায় পরিণত করিয়াছে। সেই জন্যই আমরা তাহাকে একবৎসরের পুরাতন বলিতেছি এবং অনেক কালের জিনিশ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। এতদ্রূপ জীর্ণতা-রহস্য-বিচারের দ্বারা

ইহাই অবধারিত হয় যে, কাল কি? না কতকগুলি ক্রিয়া সমষ্টি।* ক্রিয়াই কাল; অন্য কোন অলীক কল্পনা ইহাতে নাই। যাহারা ভাবেন, কাল একটী মনঃকল্পিতভাব বা জ্ঞানাভাসমাত্র, নিশ্চিত তাঁহারা কালশক্তিবিজ্ঞানে বঞ্চিত।

ক্রিয়াই কাল, এ কথায় অনেক প্রশ্ন উঠিবে। কাল কাহার ক্রিয়া? কিংনিষ্ঠ ক্রিয়া? এ কথার প্রত্যুত্তরে কালবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন,—সূর্য্যক্রিয়া ও বস্তুক্রিয়া, উভয়ক্রিয়াই কাল, ক্রিয়ামাত্রেই কাল। বস্তুকায়ায় যে নিরন্তর ক্রিয়া জন্মিতেছে, তাহার প্রধান কারণ তেজ বা তেজোমণ্ডলাত্মক সূর্য্য। সূর্য্যই বস্তুরূপ অধিকরণে স্বীয় ক্রিয়ার দ্বারা বিকারজনক ক্রিয়ান্তর জন্মাইতেছেন এবং নিজেও ক্রিয়াবান্ হইয়া পরগত ক্রিয়ার পরিচ্ছেদ বা পরিমাণ বিধান করিতেছেন।

সূর্য্য কি? সূর্য্য তেজঃপিণ্ড, দিব্য ও ভৌম-তেজের আকর বা প্রকৃতি। ঐ মণ্ডলাত্মক সূর্য্য হইতেই ভৌম ও দিব্য প্রভৃতি বিবিধ তেজ উদ্ভূত, উপতিষ্ঠমান ও উপধ্বস্ত হইয়া থাকে। ঐ তেজের শত শত অজ্ঞাত শক্তি আছে। উহার জ্ঞাত শক্তি এই—

"ঊর্দ্ধভাক্ পাচকং দগ্ধৃ পাবকং লঘু ভাস্বরম্।
প্রধ্বংস্যোজস্বি বৈ তেজঃ পূর্ব্বাভ্যাং ভিন্ন লক্ষণম্॥"

পাক, দাহ, পরিবর্ত্তন, সংশোধন, লঘুত্ব, নৈর্ম্মল্য, সংযোগধ্বংস, উগ্রতা,—এসমস্ত তেজের জ্ঞাত শক্তি। বস্তুর পাকক্রিয়া, দাহ ক্রিয়া, আণবিকসংযোগের বিয়োগ, শৈথিল্যক্রিয়া, সংশোধনক্রিয়া, (সাঙ্কর্য্যভঙ্গ) পরিবর্ত্তনক্রিয়া, লাঘবক্রিয়া,—এ সমস্তই তেজের দ্বারা বা তেজঃপ্রবেশের দ্বারা সাধিত হইতেছে। তেজের মূলবস্তু কি? না সূর্য্য বা সূর্য্যমণ্ডল। সূর্য্যই তেজের প্রস্রবণ। অতএব,

---

* "ক্রিয়ৈব কাল ইতি মতানুসারাদুক্তম্।" [স্মৃতিদেখ।]

সূর্য্যনামক তেজ প্রত্যেক ভূতবিক্রিয়ার মূলে জীবস্তভাবে স্থিতি করিতেছে। যদি সূর্য্যনামক তেজোমূল না থাকিত, তাহা হইলে শীত হইত না, গ্রীষ্ম হইত না, বর্ষা হইত না, শিশির হইত না, মেঘ হইত না, বিদ্যুৎ হইত না, ফলাদি পাক নিষ্পত্তি হইত না, কাষ্ঠ পুড়িত না বা প্রজ্বলিত হইত না, অধিক কি কিছুই হইত না। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, সূর্য্যের সহিত জগতের কিরূপ সম্বন্ধ এবং কাল বা ক্রিয়া কি জিনিষ।

কালের বা অনুভবযোগ্য ধারাবাহিকক্রিয়ার ক্রমসন্তানিতা অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন বিক্রিয়ার আবির্ভাব হইয়া থাকে। কালতত্ত্ব অপেক্ষা, কালের বা ক্রিয়ার ক্রমতত্ত্বটী অতীব দুর্নিরূপ্য। দুর্নিরূপ্য হইলেও তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও অবশ্যজ্ঞাতব্য। বস্তুরূপ আধারে কত অগণ্য ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া তাহাকে জীর্ণ করে, কিরূপ আধার কিপ্রকারে ও কি পরিমাণ ক্রিয়ার দ্বারা বিকৃত বা পাক প্রাপ্ত হয়, এই ভৌতিক দেহের উপর কিপ্রকারের কত ক্রিয়া আপতিত হইলে ইহার জীর্ণতা সম্ভব, এই স্বস্থশরীর, ইহাতে যে পরিমাণ ক্রিয়ানৈরন্তর্য্য স্বাভাবিক আছে, যাহা ঠিক থাকিলে ইহাতে দশ বৎসরেও জরা আসিতে পারে না, যাহা ঠিক না থাকিলে অর্থাৎ যাহার পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে ইহাতে দশবৎসর দূরের জরা এক দিনেই উপস্থিত হইতে পারে, এসকল বিষয়ের জ্ঞান কালিক ক্রমতত্ত্বজ্ঞানের অধীন, ইহা নিশ্চিত জানিবেন। এসকল তত্ত্ব ঋষি ভিন্ন, যোগী ভিন্ন, অন্যের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়; অথচ ইহা চিকিৎসকদিগের জ্ঞাতব্য।

"কাল" এই শব্দের ব্যুৎপত্তিতে সুশ্রুতাচার্য্য বলিয়াছেন যে, সঙ্কলয়তি কালয়তি বা ভূতানি" টীকাকার ডল্লনাচার্য্য নানাপ্রকার অর্থ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা এস্থলে জ্যোতির্ব্বিৎ প্রধান সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতানুযায়ী অর্থ প্রকাশ করিলাম।

কাল দুই প্রকার প্রথম অখণ্ড কাল "সঙ্কলয়তি ভূতানি" অর্থাৎ ভূত শব্দে পঞ্চভূত আকাশাদিকে বুঝাইবে ঐ ভূতগণের পরস্পর সংযোজনকারক অখণ্ড কাল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কাল জগতের আশ্রয় এবং ঈশ্বরানুরূপ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা কেননা অখণ্ড কালে সংযোজিত বস্তুর স্থিতি বিলয়ও কালের অধীন।

দ্বিতীয় খণ্ডকাল "কালয়তি বা কলয়তি" অর্থাৎ এস্থলে কল ধাতুব অর্থ জ্ঞান যিনি নিমেষাদি বিবিধরূপে মনুষ্যগণের জ্ঞানের বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। জ্যোতিষিকেরা প্রোক্ত কালকে যতখণ্ডে বিভাগ করিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদিকেরাও প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় ইতি কর্ত্তব্যতা বিধানের পরিচয় দিতে ক্রুটী করেন নাই; দ্বিতীয় কাল আমাদের প্রয়োজনীয় এবং বক্তব্য হইলেও আমরা কালকে ঈশ্বর কল্পনা করিতে চাই না।

তস্য সংবৎসরাত্মনো ভগবানাদিত্যঃ। সুশ্রুতঃ।

অল্পকাল হইতে যুগ পর্য্যন্ত কালকে যত অংশে বিভক্ত দেখিতেছি, তাহার মধ্যে সম্বৎসর কালই পরিবর্ত্তন শীল; এই সম্বৎসরের পুনরাবর্ত্তনে যুগাদি সংখ্যা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব সংবৎসরের বর্ণনা মাত্র লিখিত হইবে।

খণ্ডকাল আবার দুই প্রকার প্রথম অণু (সুক্ষ্ম) অপ্রধান। দ্বিতীয় স্থূল (মূর্ত্ত) প্রধান।

অনিবার্য্যভাবে সুর্য্যের রশ্মিপাত হইতে পারে, এমন কোন এক প্রকার সমতল স্থানে একটী সঙ্কু (কীলক) সরল ভাবে রোপিত করিয়া তাহার ছায়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকিলে ঐ ছায়ার গতি দ্বারা সূর্য্যের গতি প্রমাণ করিতে হইবে; ঐ গতি একটী পরমাণু দেশ অতিক্রম করিতে যে সময় অতীত হইবে তাহাকে এক অণুকাল জানিবে। এই প্রকার ১, ২, ৩, পর্য্যন্ত এক রেণুকাল, ইহার

ত্রিগুণে এক ক্রুটী, একশত ক্রুটীতে এক বেধ। ইত্যাদি অননুভবনীয় কালই সূক্ষ্ম কাল। এই কাল গণনীয় সংখ্যার মধ্যে বটে কিন্তু ব্যবহারের অযোগ্যবলিয়া অপ্রধান নাম দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় "স্থূল বা মূর্ত্ত" কাল কোন স্বস্থ ব্যক্তি সুখাসনে উপবেশন করিলে তাহার নিশ্বাস পতনের কালকে প্রাণ বলে; ইহার ছয় প্রাণে এক বিনাড়ী (পল) ৬০বিনাড়ীতে এক নাড়ী (দণ্ড) ৬০নাড়ীতে এক অহোরাত্র। পঞ্চদশ দিনে এক পক্ষ। পক্ষ দুই প্রকার, কৃষ্ণ ও শুক্ল; দুই পক্ষে বা ত্রিংশৎ অহোরাত্রে এক মাস বা এক রাশি; বারমাসে বা দ্বাদশ রাশিতে এক সংবৎসর। দিন দুই প্রকার চান্দ্র এবং সৌর। চান্দ্র দিন রাত্রের শেষার্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিরা পরদিবসীয় পূর্ব্বার্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত। সৌরদিন সূর্য্যের উদয় হইতে পুনরায় উদয় কাল পর্য্যন্ত।

(ক্রমশঃ)

রোগ ও রোগের বিভাগ।

মধ্যে মধ্যে বিবিধ কারণে শীতগ্রীষ্মাদি ঋতুর ব্যাপত্তি অর্থাৎ অন্যথা-ভাব উপস্থিত হয়। তজ্জন্য দেশবিশেষে বা প্রদেশবিশেষে জনপদোধ্বংসকারী মহামারী (ম্যালেরিয়া প্রভৃতি) বিবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে [৩] ঐ সকল রোগকে ব্যাপন্ন-ঋতু-জাত বলা যায়।

---

[৩] কি কারণে, অস্বাভাবিক ঋতু-ব্যাপত্তি উপস্থিত হয়, কি কারণে ও কিরূপেই বা বিভিন্নবয়স্ক, ও বিভিন্নপ্রকৃতি লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশক মহামারী (ম্যালেরিয়া প্রভৃতি) নামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তদ্বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদীয় সিদ্ধান্ত কি, আমরা তাহা প্রস্তাবান্তরে ব্যক্ত করিব।

দৈব বল দ্বারা অনেক প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। যথা,—

১ দেবদ্রোহজাত ;—২ অভিশাপজ ;—৩ অভিচার-কৃত ;—৪ উপসর্গজাত, ইত্যাদি।

দেবতা, গুরু, সিদ্ধপুরুষপ্রভৃতির প্রতি ধৃষ্টতা, গর্ব্বপ্রভৃতি প্রকাশ করিলে, যে দুরদৃষ্ট জন্মে, তজ্জন্য উৎপন্ন রোগকে দেব-দ্রোহ-জাত রোগ বলে। [৪]

তপোবলশালী মহর্ষিপ্রভৃতির নিকট পাপাচার প্রকাশ করিলে, তাঁহাদিগের অভিশম্পাতবশতঃ যে রোগ জন্মে, তাহার নাম অভিশাপজ।

অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রবিশেষদ্বারা সম্পাদিত কার্য্যবিশেষকে অভিচার বলে। তজ্জন্য যে রোগ জন্মে, তাহার নাম অভিচারজ।

কখন কখনও মুল ব্যাধি সামান্যাকারে উৎপন্ন হইবার পর অপর কোনও প্রবল ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হয়। এস্থলে, তাহার নাম উপসর্গজাত।

ঐরূপ দৈববল-প্রবৃত্ত রোগ সকল, চারি প্রকারে উপস্থিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য উহারা প্রথমতঃ চারি শ্রেণীতে পরিগণিত। যথা,—

১ বিদ্যুদশনিকৃত ;—২ পিশাচাদিকৃত ;—৩ সংসর্গজাত ;—৪ আকস্মিক।

---

[৪] দেবতা বা সিদ্ধপুরুষ প্রভৃতির অলৌকিক প্রভাবের বিষয়ে বিদ্যমান সময়ের ব্যক্তিবিশেষের অবিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু জগতের তত্ত্বজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদ তাহাতে অশ্রদ্ধা করেন না। বিবিধ কারণানুসন্ধায়ী আর্য্য মহর্ষিগণ প্রস্তাবিতরূপ কারণমাত্র বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; তাঁহারা, তাদৃশ রোগের স্বরূপ ও তাহার চিকিৎসার সামঞ্জস্য দেখাইয়া গিয়াছেন। আজি কালি পৃথিবীর সভ্যসমাজে প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের নিকট এতাদৃশ বিষয় আর অসম্ভব বলিয়াও গণ্য হয় না।

মেঘ হইতে মধ্যে মধ্যে পৃথিবীতে যে অসাধারণ তেজোময় পদার্থ পতিত হয়, তাহাকে "তাড়িত" বলে। সংস্কৃত ভাষার পুরাণাদি শাস্ত্রে উহার নাম অশনি অর্থাৎ বজ্র। ঐ তাড়িত পদার্থের বর্ণকে বিদ্যুৎ বলা যায়। অশনির বিদ্যুৎ ছাড়িয়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই। সেই অশনি ও বিদ্যুৎ পাতদ্বারা যে মৃত্যু (মৃত্যুও রোগমধ্যে গণ্য হইয়াছে) অথবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকলতা হয়, তাহার নাম বিদ্যুদশনিকৃত। [৫]

গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচাদির আক্রমণবশতঃ যে সকল রোগ হয়, তাহাদিগের নাম পিশাচাদিকৃত। যথা—ভূতোন্মাদ প্রভৃতি।

কোন কোনও রোগ এরূপ আছে যে, তাদৃশ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অতি নিকটে অবস্থান বা তাহার সহিত একত্র শয়ন ও আহারাদি করিলে, ঐ রোগ আক্রমণ করে। ঐরূপ রোগকে এস্থলে সংসর্গজাত বলা হইয়াছে। যেমন, কোন কোনও জ্বর, রাজযক্ষ্মা ও বিসূচিকা প্রভৃতি।

পূর্ব্বে কোনও লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া হঠাৎ যে রোগ জন্মে, তাহার নাম আকস্মিক। যথা, সংন্যাসনামক মূর্চ্ছা প্রভৃতি।

প্রাকৃতিক নিয়মকে স্বভাব বলে। স্বভাবানুসারে যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদিগের নাম স্বভাব-বল-বৃত্ত। যথা,—ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, জরা ও মৃত্যু প্রভৃতি [৬] ঐ সকল স্বাভাবিক রোগের দুইটী শ্রেণী। যথা,—

---

[৫] বজ্রকে লোকে যে "দধিচি" নামক ঋষির অস্থি এবং দেবরাজ ইন্দ্রের অস্ত্র বিশেষ বলিয়া থাকেন, তাহা পুরাণশাস্ত্রের আলঙ্কারিক বর্ণনা হইতে শ্রুত হইয়াছে। পুরাণ কর্ত্তা মহর্ষিগণ বিবিধ কারণে লোকের প্রবৃত্তিভেদ লক্ষ্য করিয়া প্রায় সকল শাস্ত্রেই অলঙ্কার বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

[৬] লোকে যাবজ্জীবন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিয়া চলিতে

১ কাল-কৃত ;—২ অ-কালকৃত।

শরীর ও মনের সুস্থতা রক্ষার নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের যে সকল ব্যবস্থা আছে। তদনুসারে চলিলেও যেরূপ ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি এবং যেরূপ মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহার নাম কাল-কৃত ব্যাধি।

যথাকালিক ও পরিমিত পরিমাণের ক্ষুধা-পিপাসাদি রোগ, বলিয়া গণ্য হইবার কারণ এই যে, শরীরস্থ পদার্থদিগের অভাব বোধক এক এক প্রকার যন্ত্রণাবিশেষের নামই ক্ষুধা, পিপাসা ইত্যাদি। যন্ত্রণাবিশেষ হইলেই, ব্যাধিশব্দে গণ্য হইল। আবার অন্ন আহার বা জল পান করিলে, সুখানুভব হয় বলিয়া, ক্ষুধা ও পিপাসাকে সুখজনক বলা যাইতে পারে না। অপিচ একপ্রকার সুখের সাধন বলিয়া এতাদৃশ স্বাভাবিক রোগগুলি প্রার্থনীয়ও হইতে পারে না। কারণ, যদি ক্ষুধা উপস্থিত হইয়া ক্লেশভোগ না করাইত, তবে আহার জন্য তৃপ্তিও হইত না। সাংসারিক লোকের শারীরিক পরিশ্রমাদি দ্বারা শরীরস্থ রসরক্তাদির ক্ষয় হইলে, আহার দ্বারা তাহার পুরণ হয় বটে; কিন্তু সংসারত্যাগী যোগী ব্যক্তিগণের তাদৃশ ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়ন-চিকিৎসা অথবা যোগশাস্ত্রোক্ত যোগ দ্বারা তাঁহাদিগের ক্ষুধা পিপাসাদির নাশ হইয়া থাকে, অথচ তাদৃশ ব্যক্তির সুখের অভাব নাই। এইরূপে সূক্ষ্ম বিচার করিলে পরিমিত ক্ষুধা পিপাসাদিও দুঃখজনক পদার্থ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

পারিলে, অতিসার, অজীর্ণ, বা ক্রিমি প্রভৃতি রোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত অতিসারাদি রোগ সকল স্বাভাবিক নহে। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম প্রতিপালিত হইলেও, ক্ষুধা, পিপাসা এবং জরা ও মৃত্যু, একেবারে নিবারিত হয় না। এই জন্য এই ক্ষুধাপিপাসাদি রোগদিগের নাম স্বাভাবিক। স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম পালন করিয়া না চলিলে, ঐ ক্ষুধা পিপাসাদি পরিমিত পরিমাণাপেক্ষা বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া অস্বাভাবিক রোগ বলিয়াই গণ্য হয়।

স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মে না চলিলে,অথবা স্বাস্থ্যভঙ্গ কারক নিষিদ্ধ কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিলে, যেরূপ ক্ষুধা পিপাসাদি এবং যেরূপ মৃত্যু ঘটে, তাহাদিগের নাম অকালকৃত ব্যাধি।

বাস্তবিক ব্যাধি বা রোগের প্রকারভেদ অসংখ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহারা উপরি উল্লিখিত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তিনটী বিভাগকে অতিক্রম করিতে পারে না ; তাহার সন্দেহ নাই।

প্রকারান্তরে বিভাগ করিলে, যাবতীয় রোগের তিনটী শ্রেণী উপস্থিত হয়। যথা,—

১ দোষ-জন্য ,—২ কর্ম্ম-জন্য ;—৩ কর্ম্মদোষ-জন্য। [৭]

জন্মান্তরীণ পাপ বা দুরদৃষ্ট ব্যতিরিক্ত, স্বাভাবিক কাল নিয়মে অথবা ঐহিক আহার বিহারাদির নিয়ম বিরুদ্ধ ব্যবহারবশতঃ অথবা আঘাতাদি আগন্তু কারণে যথাকালে, যথা পরিমাণে বাত পিত্তাদি দোষদিগের যথা সম্ভব প্রকোপাদির অনুযায়ী রূপে উৎপন্ন রোগ সকলকে দোষজন্য রোগ বলে। যথা, বসন্ত ঋতুতে স্বাভাবিক নিয়মেই শরীরে শ্লেষ্মার প্রকোপজন্য শ্লেষ্মপ্রধান রোগ, অথবা তৎকালে শ্লেষ্মবর্দ্ধক নিদান সেবন বশতঃ অতিশয় শ্লেষ্মপ্রকোপাদি হওয়াতে শ্লেষ্মপ্রধান জ্বর ইত্যাদি, অথবা আঘাতাদি প্রযুক্ত কোনওরূপ ক্ষতরোগ।

পুর্ব্বোক্তরূপ ঐহিক কারণ ব্যতিরেকে জন্মান্তরীণ দুরদৃষ্টপ্রযুক্ত যে রোগ জন্মে, তাহার নাম কর্ম্মজন্য রোগ। যথা, সম্পুর্ণরূপে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন করিতে করিতেও বসন্ত ঋতুতে পিত্তজন্য রক্তপিত্ত রোগ।

---

[৭] কর্ম্মজা ব্যাধয়ঃ কেচিৎ দোষজাঃ সন্তি চাপরে।
কর্ম্মদোষোদ্ভবাশ্চান্যে কর্ম্মজাস্তেষহেতুকাঃ ॥
[সুশ্রুত উত্তরতন্ত্রে, ৪০ অ]

জন্মান্তরীণ কর্ম্মজন্য পাপ এবং ঐহিক অত্যাচার জন্য প্রকুপিত বাতাদি দোষ এই উভয় কারণ মিশ্রিত ভাবে যে রোগ উৎপাদন করে এবং জন্মান্তরীণ শুভাদৃষ্ট বা পুণ্য এবং ঐহিক অত্যাচার এই উভয়ের মিশ্রিত কার্য্যের ফলস্বরূপ যে রোগ জন্মে তাহার নাম কর্ম্মদোষজন্য।

শেষোক্ত কর্ম্মদোষজন্য রোগেরও দুইটী শ্রেণী হইয়া থাকে। যথা—

১ ঐহিক কারণের উপযুক্ত রোগাপেক্ষা অধিক পরিমাণেরোগ; —২ ঐহিক কারণাপেক্ষাতে অল্প পরিমাণে রোগ। [৮]

যদি অধিক পরিমাণে ব্যায়ামপ্রভৃতি বাতপ্রকোপের, কটু-রস-সেবনপ্রভৃতি পিত্তপ্রকোপের, গুরুদ্রব্যসেবনপ্রভৃতি শ্লেষ্ম প্রকোপের নিদান অথবা আঘাতপ্রভৃতি আগন্তু নিদানের কোনও একটী ঐহিক কারণ বা অনেকগুলি কারণের সমষ্টি ও জন্মান্তরীণ পাপ, এই উভয়ে মিশ্রিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে, তবে ঐহিক কারণের উপযুক্ত রোগের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যাধি জন্মে।

যদি জন্মান্তরের এরূপ পুণ্য থাকে যে, তজ্জন্য ইহ জন্মে সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন হইতে পারে, অথচ ইহ জন্মে শারীরিক আহার বিহারাদির অত্যাচার করা হয়, তবে, রোগের উৎপাদক ঐহিক কারণের উপযুক্ত রোগাপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে রোগ জন্মিয়া থাকে। [৯]

---

[৮] সূক্ষ্ম বিভাগ করিলে, আরও অনেক শ্রেণীভেদ হইতে পারে। যথা, পূর্ব্বজন্মের পাপ ঐহিক নিদানের তুল্য, অল্প বা অধিক এবং জন্মা-ন্তরীণ পুণ্য ঐহিক নিদানের তুল্য, অল্প বা অধিক। আবার অধিক, অধিকতর অধিকতম ইত্যাদি।

[৯] চরক সংহিতাতেও মানবের জীবন মরণ যে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কারণের প্রতি নির্ভর করে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে। যথা,—

বিকৃত বাতাদি দোষ পদার্থ রস রক্তাদি ধাতু পদার্থদিগকে দূষিত করিয়া যে সকল রোগ উৎপাদন করে, তাহারা সাত শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

১। রস-দোষ-জ বা রসজাত। যথা, জ্বর, অরুচি প্রভৃতি।

২। রক্তজাত। যথা প্লীহা, বিদ্রধি ইত্যাদি।

৩। মাংসজাত। যথা, অর্শঃ গলগণ্ডপ্রভৃতি।

৪। মেদোজাত। যথা—অতিস্থূলতা, অতিস্বেদ প্রভৃতি।

৫। অস্থিজাত। যথা—কুনখ, অস্থিতোদ (হাড়ের মধ্যে বেদনা) প্রভৃতি।

৬। মজ্জাজাত। যথা—অন্ধকার-দর্শন, মূর্চ্ছাপ্রভৃতি।

৭। শুক্রজাত। যথা—ক্লীবতা, শুক্রমেহ প্রভৃতি। (১০)

শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রানুসারে বিভাগ করিলে, অনেকগুলি শ্রেণী হইতে পারে। তন্মধ্যে আমাশয় ও পক্বাশয় যন্ত্রগত রোগের বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্‌ভিন্ন অপর দুইটী স্থূল শ্রেণী আছে। যথা—

১ মলাশয়জাত ;—২ ইন্দ্রিয়াশয়জাত। (১১)

"দৈবে পুরুষকারে চ স্থিতং হ্যস্য বলাবলং॥"

এবং "দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলং হ্যপহন্যতে।

দৈবেন চেতরৎ কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে॥" [বিমানস্থান।]

আত্মার জন্মান্তরগ্রহণঘটিত পূর্ব্বকাল ও পরকালে অবিশ্বাসকারী অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ, রোগের পক্ষে এতাদৃশ কারণ বর্ণনা শ্রবণ করিয়া হাস্য বা উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু পৃথিবীর পণ্ডিত-শিরোমণি জগতের কারণতত্ত্বাভিজ্ঞ আর্য্য মহর্ষিগণ বহু চিন্তা ও যোগলব্ধ জ্ঞান দ্বারা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দূরদর্শী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের নিকট তাহা উপহাসের বিষয় হইতে পারে না।

[১০।১১] সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ২৪ অ, দ্রষ্টব্য।

উণ্ডুক নামক মলাশয়ের বিকৃতি বশতঃ যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদিগের নাম মলাশয়জাত। যথা,—চুলকানো, পাচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগ।

চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের আধারযন্ত্রদিগের অন্যথাভাব প্রযুক্ত যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়াশয়জাত বলা যায়।

চিকিৎসা দ্বারা শান্তিবিধানবিষয়ে, রোগদিগের শ্রেণীভেদ করিলে, প্রথমতঃ দুইটী শ্রেণী উপস্থিত হয়। যথা,—

১ সাধ্য রোগ ;—২ অসাধ্য রোগ।

যেরূপ উপায়ে যত দিনেই হউক, যে রোগের সর্ব্বতোভাবে শান্তিবিধান হইতে পারে; তাহার নাম সাধ্যরোগ।

আয়ুর্ব্বেদিক উপায়ে কোন প্রকারেই যাহার সর্ব্বতোভাবে শান্তিবিধান হইতে পারে না, তাহার নাম অসাধ্য রোগ।

সাধ্য ও অসাধ্য, এই দুই প্রকার রোগেরও প্রত্যেকের দুই শ্রেণী আছে। যথা,—

সাধ্যরোগ—১ সুখসাধ্য,—২ কষ্টসাধ্য।

অসাধ্যরোগ—১ যাপ্য,—২ প্রত্যাখ্যেয়।

যাহাকে অল্পায়াসে শমিত করা যায়, তাদৃশ রোগের নাম সুখসাধ্য।

যাহাকে শমিত করা অনেক আয়াসের কার্য্য, তাহাকে কষ্ট-সাধ্য বলে।

সর্ব্ব প্রকার চেষ্টাতেও যে রোগের মূল বিনাশ হয় না, কেবল কিছুকালের জন্য তেজের হ্রাস হয়, তাহার নাম যাপ্য।

যে রোগের তেজের হ্রাসও হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তাহাকে প্রত্যাখ্যেয় বলে। ইতি।

কবিরাজ শ্রীঈশানচন্দ্র শর্ম্ম-বিশারদ।

ঔষধসূত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে যে তিন প্রকার বিপরীতার্থকারী বা সদৃশ ঔষধের উল্লেখ করা গিয়াছে, সদৃশশব্দের প্রয়োগ দেখিয়া কেহ মনে না করেন, ঐ সকল ঔষধ বর্ত্তমান হোমিওপ্যাথি-মতানুসারী। কেন না, হোমিওপ্যাথীমতের সহিত কোন অংশে এক হইলেও সর্ব্বাংশে তুল্য নহে। ঐ সমস্ত ঔষধের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া এবং মাত্রাদির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে। এবং জানিতে পারিবে যে ঐ সমস্ত ঔষধ বিপরীত ঔষধেরই অর্থাৎ এলোপ্যাথিকেরই অন্তর্নিবিষ্ট। কেবল কোন ধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য-বশতঃ নামমাত্রে পৃথক্‌শ্রেণীভুক্ত। এই বিষয়টী সুন্দররূপে বুঝাইবার নিমিত্ত নিদানটীকাকার বিজয়রক্ষিত এবং নৃসিংহাচার্য্য যে কয়েকটী পূর্ব্বাপরপ্রসিদ্ধ উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে সেগুলি উদ্ধৃত করিলাম।

১ম। বমনরোগে মদনফল।

মদনফল যাবতীয় বমনরোগে প্রয়োগ করিতে হয় এমন নহে। যে স্থলে উদরে বা হৃদয়ে বহুপরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকে, ঐ সঞ্চিত শ্লেষ্মার আধিক্যবশতঃ রোগীর বমন বা বিবমিষা হইতেছে বলিয়া পরীক্ষিত হয়, এমন স্থলে উক্ত শ্লেষ্মা নিঃসারণের জন্য বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করাই আশু উপকারক। কেন না যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা নির্গত না হইলে শীঘ্র বমননিবারণ হওয়ার সুযোগ নাই। এই বিবেচনায় রোগের কারণীভূত কফ নিংসারণ করার অভিপ্রায়েই ঐরূপ স্থলে মদনফল প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং ইহা হেতুবিপরীত ঔষধই হইল।

২ য়। অগ্নিদগ্ধ স্থানে অগ্নির উত্তাপ।

আপাত বুদ্ধিতে বোধ হয়, শৈত্য-সংযোগে অগ্নিদাহের উপশম হইতে পারে, অতএব দগ্ধ স্থানে শীতল জল সেচন করাই উচিত। বস্তুতঃ ঐরূপ শীতপ্রক্রিয়ায় উপকার না হইয়া বরং অপকারই ঘটে। কারণ শীতল জল স্বাভাবিক সঙ্কোচনশক্তিবশতঃ দগ্ধস্থানের রক্ত জমাট করে, পরে ঐ ঘনীভূত রক্ত পাকপ্রবণ হইয়া পড়ে। কিন্তু দগ্ধ স্থানে অগ্নির তাপ লাগাইলে তাপের সঞ্চালনশক্তিবশতঃ উক্ত রক্ত চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হয়, জমাট বাঁধিতে পারে না। সুতরাং পাকিবারও আশঙ্কা থাকে না। অতএব আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে এই তাপও হেতুবিপরীত ঔষধ বলিয়াই বোধ হইবে।

৩য়। বিষে বিষক্ষয়।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে জাতীয় বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার বিরোধি-জাতীয় বিষ পূর্ব্বোক্ত বিষের নাশক। যেমন স্থাবর মৌল বিষ, জঙ্গম বিষের ঔষধ এবং জঙ্গম বিষ স্থাবর মৌলবিষের ঔষধ। কেন না উভয় প্রকার বিষ, বিষত্ববিষয়ে এক হইলেও পরস্পর বিরোধি-ক্রিয়াশীল। জঙ্গম বিষ ঊর্দ্ধগামী এবং স্থাবর বিষ অধোগামী। এরূপ বিপরীত ক্রিয়াকারী বলিয়া ইহাও হেতুবিপরীত ঔষধের মধ্যে ধর্ত্তব্য।

৪ র্থ। মদ্যপানজনিত-মদাত্যয়রোগে মদ্যপান।

প্রোক্তটীকাকারদ্বয় এই উদাহরণে দুইটী উপপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম উপপত্তি—মদ্য মাত্রই সদৃশ-গুণ-যুক্ত,এমন কথা হইতে পারে না। কোন মদ্য রুক্ষ, কোন মদ্য বা স্নিগ্ধ ইত্যাদি। সুতরাং কোন মদ্যের সহিত কোন মদ্যের বিরোধিতাও আছে।

অতএব রুক্ষ মদ্য পান করিয়া যাহার পীড়া হইয়াছে, তাহাকে স্নিগ্ধ মদ্য পান করাইবে। এইরূপ স্নিগ্ধ মদ্য পানে যাহার পীড়া জন্মিয়াছে, তাহাকে রুক্ষ মদ্যপান করিতে দিবে, কাজেই এইরূপ ব্যবস্থা হেতুবিরোধীই হইল। দ্বিতীয় উপপত্তি—যে স্থলে সমজাতীয় মদ্যপান দ্বারা রোগীর পীড়া নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়, সেই স্থলে কোনরূপ দ্রব্যান্তরের সহিত সংযোগে ঐ মদ্যের বিপরীত ক্রিয়া উপস্থিত করিয়া হেতুবিরোধী করিয়াই লইতে হয়। সুতরাং উহা হেতুবিপরীত ঔষধের মধ্যেই গণ্য হইল।

৫ম। ব্যায়ামজনিত বাতরোগে জলসন্তরণরূপ ব্যায়াম।

যেমন কুম্ভকারপয়নস্থ অগ্নি উপরিস্থিত মৃল্লেপের আবরণে সংবৃত থাকায়, অভ্যন্তরে পিণ্ডীকৃত হইয়া সমধিক প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ সন্তরণকারী ব্যক্তির আভ্যন্তরিক তাপ, জলের শৈত্য ক্রিয়া বশতঃ লোমকূপ পথে বহির্গত হইতে না পাওয়ায় অভ্যন্তরে সঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সেই তাপের সাহায্যে মেদ এবং শ্লেষ্মা গলিত হয়, তৎ সহকারে সন্তরণ-শ্রমোৎপন্ন বায়ু পূর্ব্বসঞ্চিত বাতকে স্বস্থানে প্রত্যানয়ন করে। সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাও হেতুবিপরীত ঔষধের মধ্যেই পরিগণিত হইল।

এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যদি বিপরীতার্থকারী ঔষধ আভ্যন্তরিক ক্রিয়াপ্রভৃতি কারণবশতঃ বিপরীত ঔষধের মধ্যেই গণ্য হইল, তাহা হইলে উহাকে পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করার তাৎপর্য্য কি এবং সদৃশ ঔষধ এইরূপ নামই বা কেন দেওয়া হইল? ইহার উত্তরস্থলে টীকাকারগণ যাহা বলেন, তাহা এই—

যদিও বিপরীতার্থকারী ঔষধ প্রকৃত প্রস্তাবে বিপরীত ঔষধেরই অন্তর্নিবিষ্ট, তথাপি উক্ত ঔষধের ধর্ম্মগত আংশিক বৈলক্ষণ্য দেখাইবার জন্যে পৃথক্ শ্রেণীতে গণনা করা হইয়াছে। যদি বল

বৈলক্ষণ্য কি? আপাতত সমধর্ম্মী বা সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াই বৈলক্ষণ্য। *

(ক্রমশঃ)

* "ননু ছর্দ্দ্যাং বহুশ্লেষ্মজায়াং বমন-যোগ্যায়াং যদি বমনং ন ক্রিয়তে,তদা চিরানুবর্ত্তী রোগোঽনুচ্ছেদ্যো বা স্যাৎ। ততশ্চ বমনং প্রযুক্তং দোষপ্রত্যনীকমেব ভবতি যদুক্তং সুশ্রুতে। ছর্দ্দিষু বহুদোষাসু বমনং হিতমুচ্যত ইতি। এবমগ্নিপ্লুষ্টেঽপ্যুষ্ণক্রিয়য়া রক্তস্য বিলপনেন স্থানান্তরগমনাৎহেতু-প্রত্যনীকত্বৈব। অন্যথা রক্তং দাহপ্রকুপিতং তত্রস্থং পাকমারভেত। যদুক্তং সুশ্রুতে। অগ্নিনা কুপিতং রক্তং ভৃশং জন্তোঃ প্রকুপ্যতি। ততস্তেনৈব বেগেন পিত্তমস্যাপ্যুদীর্য্যত ইতি। শীতক্রিয়া চ তত্র নিষিদ্ধা রক্তস্য স্ত্যানত্বহেতুত্বাৎ। যদাহ সুশ্রুতঃ। প্রকৃত্যাহ্যুদকং শীতং স্কন্দয়ত্যতিশোণিতং। তস্মাৎ সুখয়তি হ্যুষ্ণং ন তু শীতং কথঞ্চনেতি। স্কন্দয়তি স্ত্যানীকরোতি। তথা জঙ্গমবিষে ঊর্দ্ধগস্বরূপে মৌলবিষমধোগস্বরূপং হেতুবিপরীতমেব। যদুক্তং চরকে। বিষং বিষঘ্নমুক্তং যত্তৎপ্রভাবপ্রভাবিতমিতি। অস্যায়মর্থঃ বিষত্বা-বিশেষেঽপি কুতো গতিভেদ ইত্যত প্রভাবপ্রভাবিতমিতি। তথা মদ্যকৃতে মদাত্যয়ে যন্মদ্যং তদপি মাতুলুঙ্গচুক্রাদিযুক্তং সুশ্রুতাদিভির্ব্বিহিতং দ্রব্যান্তর সংযুক্তমন্যদেব। অথবা বাতমদাত্যয়ে রুক্ষমাধ্বীকাদিনা জনিতে তত্র স্নিগ্ধপৈষ্টিকাদিমদ্যং প্রযুজ্যমানং হেতুবিপরীতমেব। যদুক্তং সুশ্রুতে। যথা নরেন্দ্রোপহতস্য কস্যচিৎ ভবেৎ প্রসাদস্তত এব নান্যতঃ। ধ্রুবং তথা মদ্যহতস্য দেহিনো ভবেৎ প্রসাদস্তএব নান্যত ইতি। তন্মদ্য জাতীয়ানামতি-প্রায়েণৈব। ব্যায়ামজনিত সংমূঢবাতে জলপ্রতরণরূপো ব্যায়ামঃ, তত্রাপি জলস্য শৈত্যাদ্বহিরনির্গচ্ছন্ দেহোষ্মা লিপ্তকুম্ভকারপবনন্যায়েনান্তঃপিণ্ডিতো-মেদঃশ্লেষ্মাণৌ বিলায়য়তি। ব্যায়ামশ্চ তৌ শোষয়তি ততস্তু নিরাবরণো-বায়ুঃমার্গপ্রতিপন্নো ভবতীতি হেতু-প্রত্যনীকত্বৈব। অনেন ন্যায়েন সর্ব্বমেব তদর্থকারি যথাসম্ভবং হেতু-প্রত্যনীকাদাবেবান্তর্ভবতীতি উচ্যতে।

যদ্যপেবং তথাপ্যবান্তরবৈধর্ম্ম্যপ্রতিপাদনার্থমাচার্য্যৈঃ পৃথক্ দর্শিতং।

বৈধর্ম্ম্যঞ্চ হেতুসমানধর্ম্মকত্বেঽপি রোগপ্রশমকত্বমিতি।"

আয়ুর্ব্বেদানুবাদ।

আমরা সটীক-সানুবাদ-চরকসংহিতা-মুদ্রাঙ্কনের এক খানি অনুষ্ঠানপত্র প্রাপ্ত হইলাম।

* চরক-সংহিতা আয়ুর্ব্বেদের প্রধানতম গ্রন্থ। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহা এখন পর্য্যন্ত সাধারণের গোচর হয় নাই। যদিও দুই তিন বার ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তথাপি তদ্দ্বারা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার প্রকৃত সুবিধা হয় নাই। কারণ, চরক-সংহিতা অতি দুর্ব্বোধ গ্রন্থ, উৎকৃষ্ট টীকার আশ্রয় ও গুরূপদেশ ব্যতিরেকে, ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য কেহ সর্ব্বাংশে বুঝিতে সমর্থ হন্ না। অতএব আমরা আয়ুর্ব্বেদের গভীর-তত্ত্বজ্ঞ-চক্রপাণি-দত্ত-কৃত আয়ুর্ব্বেদ-দীপিকানামক টীকা, শিবদাস-কৃত চরক-তত্ত্বদীপিকার আবশ্যক অংশ, বিশদ বঙ্গানুবাদ, উৎকৃষ্ট বিবৃতি এবং গুরূপদেশের সহিত উহা উত্তম কাগজ ও অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে উদ্যত হইয়াছি। উক্ত সংহিতার মূল ও টীকা বেনারস, কাশ্মীর ও বোম্বে প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইতেছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন শ্রীযুক্ত কবিরাজ হরিনাথ বিশারদ ও শ্রীযুক্ত কবিরাজ ঈশানচন্দ্র বিশারদ মহাশয়দ্বয়, ইহার অনুবাদ ও সংশোধন প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। দুই তিন জন ধনবান্ ব্যক্তিও ইহার ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কার্য্যটী দুরূহ বটে, কিন্তু তাহার নির্ব্বাহের উপকরণ প্রভৃতিও উপযুক্তই হইয়াছে। সুতরাং এ কার্য্য যে সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। দেশ হিতৈষী বিদ্যানুরাগী মহাত্মাগণের উপযুক্ত উৎসাহ প্রদান প্রার্থনীয়। প্রত্যেক মাসে চারি ফর্ম্মা করিয়া প্রচারিত হইবে। বার্ষিক মূল্য ২।০ বিদেশে ডাকমাসুল ।৵০ আনা অধিক লাগিবে।

যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় আমার নিকট মূল্যাদি প্রেরণ করিবেন ইতি।

২৬ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীপ্যারীমোহন সেন কবিরাজ।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বৈদ্যকগ্রন্থের মুদ্রণ ও অনুবাদের দুরবস্থা দেখিয়া অনেক সময়েই আমাদের মনে বিলক্ষণ ক্ষোভ উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ অনুবাদকগণের ভ্রম, অনবধানতা ও মূর্খতায় স্থানে স্থানে যেরূপ অনিষ্টাপাত দেখা যায়, তাহা স্মরণ হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হইতে থাকে। যে শাস্ত্রের সহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, জীবনের হিতাহিত বা মঙ্গলামঙ্গল যে শাস্ত্রের উপদেশের উপর নির্ভর করে; তাহার মুদ্রণ ও শোধন কতদূর সতর্কতার সহিত হওয়া উচিত, ইহা অনেকেরই বোধ নাই। সংস্কৃতের একটী সামান্য বিন্দুবিসর্গেরও ব্যতিক্রমে যে কিরূপ অর্থান্তর ঘটে, তাহা অনেকেরই ধারণা নাই। একটী পাঠান্তরের দ্বারা যে কিরূপ ফল পাওয়া যায়, তাহা অল্প লোকেই চিন্তা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ যে সমস্ত গ্রন্থ অতি প্রাচীন, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তে ঐ সমস্ত গ্রন্থের কতদূর পদপাঠের ব্যত্যয় হইয়াছে, ও কত অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এইসকল হিতকর বিষয়ে বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি না করিয়া যাহারা কেবল ব্যবসায়ের অনুরোধে পুস্তক মুদ্রিত করেন, তাহাদের দ্বারা জগতের প্রবঞ্চনা ভিন্ন কোন উপকার দেখিতে পাই না। সংস্কৃত মূলগ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন যে প্রকারই হউক না কেন, উহাতে সাধারণের অপকারের সম্ভাবনা কম। কেননা সংস্কৃত মূল গ্রন্থ পণ্ডিত ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ লোকে প্রায় পাঠ করেন না, কিন্তু সাধারণ লোকেরা বিশেষতঃ পল্লী-গ্রামের হাতুড়িয়ারা প্রায় অনুবাদ পাঠ করিয়া তদনুসারেই চিকিৎসাদি করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই অনুবাদের রহস্য বা উপকার অপকার বুঝিয়া লইতে পারেন না।

যাহারা বরাবর কোন বিষয়ান্তরে লিপ্ত ছিলেন তাহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদের অনুবাদক হইয়া হঠাৎ কৃতনামা হইতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদের "মা বাপ কেহই নাই", কেইবা দৃষ্টিপাত করে। সুতরাং একজন সামান্য সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে ডাকাইয়া তাড়াতাড়ি

অনুবাদ আরম্ভ হইল। আয়ুর্ব্বেদের সঙ্কেতানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বাবুর নাম প্রচার করিবার জন্য "উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া" অতি দ্রুতবেগে অনুবাদ সমাপন করিলেন। তৎপরে সর্ব্বজ্ঞ সমালোচকগণ দীর্ঘ সমালোচন আরম্ভ করিলেন। আর গ্রন্থের গৌরবের সীমা থাকিলনা, উহা বেদের ন্যায় অকাট্য ও প্রামাণিক হইয়া পড়িল।

এক দিন আমাদের কোনও বিশ্বস্ত আত্মীয় কোন পুরাতন অনুবাদককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মহাশয় যে গ্রন্থের অনুবাদ করিলেন উহা কিরূপ বুঝিলেন? অনুবাদক বলিলেন আমি গ্রন্থের অল্পই বুঝিয়াছি। তবে এখনকার বাজার বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আমাদের আত্মীয় পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। বাজার বিলক্ষণ বুঝিয়াছি ইহার অর্থ কি? অনুবাদক উত্তর করিলেন, এ বাজারে যে অধিক পণ্ডিত নাই, যাঁহারাও আছেন, তাঁহারাও যে নিদ্রিত, ইহা ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। কেননা আমি আয়ুর্ব্বেদ কখনও আলোচনা করি নাই, উহার ভিতরে কি আছে, তাহাও জানি না। দুই একখানি অভিধানের সাহায্যে যাহা অনুবাদ করিয়াছি তাহাই যখন অনেকে প্রশংসা করিতেছেন, তখন আর উক্ত কথা বুঝিবার বাকী কি? এইরূপ উত্তর শুনিয়া আমাদের আত্মীয় অবাক্ হইয়া গেলেন। ফলতঃ এই সমাজে যেমন গ্রন্থলেহী অনুবাদক, তেমন ভূমিকাপাঠী সমালোচক, আবার তেমনই মলাটদর্শী পাঠক। এই তিনের সুন্দর রাজযোটক হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে অনেক সময়ে কিরূপ সর্ব্বনাশ ঘটে, এই বিষয়ে পণ্ডিতগণ ও সামাজিক লোকের মনোনিবেশ করা আবশ্যক। চিকিৎসাশাস্ত্র কাব্য নয়, সাহিত্য নয়, ইতিহাস নয় অথবা কাল্পনিক কোন উপন্যাস নয়, ইহা পরীক্ষা-সিদ্ধ সত্য। সত্যের কোনরূপ স্খলন হইলেই বিপদ্। বিশেষ আয়ুর্ব্বেদের ভাষা অতি জটিল ও সন্দিগ্ধ, অনুবাদক বা ব্যাখ্যাতার অনবধানে

হিতে বিপরীত হইয়া পড়ে। আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ আছে, গর্ভিণীর কোন পাচনে "বিষ" শব্দের উল্লেখ আছে, বিষ শব্দে যে মৃণাল বুঝায়, তাহা ব্যাখ্যাতা জানিতেন না। কাঠবিষই জানিতেন, তদনুসারেই তিনি কাঠবিষ প্রয়োগ করিয়া গর্ভস্রাব করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অম্লপিত্তের কোন পাচনে মার্কব শব্দের উল্লেখ আছে, মার্কব শব্দে যে ভৃঙ্গরাজ বুঝায় তাহা অনুবাদক জানেন না, তিনি উক্ত শব্দকে অর্কশব্দমূলক মনে করিয়া আকন্দের ক্ষীর অর্থ করিয়াছেন। আকন্দের ক্ষীর একটী উগ্র বিষ; উহা যে অম্লপিত্তরোগে কোন অংশেই উপযুক্ত হইতে পারে না, ইহা তাহার বুদ্ধিতেই উপস্থিত হয় নাই। আমরা জানি, এক ব্যক্তি উক্ত অনুবাদ দেখিয়া পাচন প্রয়োগ করায় বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। অল্পদিন হইল কোন প্রসিদ্ধ গায়ক পঞ্চকোল পাচনের অযথোচিত অনুবাদের দোষে উদরাময়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কতস্থানে এইরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিতেছে, তাহার সংবাদ কে জানে। বিশেষ পল্লীগ্রামের অবস্থা আরও শোচনীয়। বিজ্ঞ কবিরাজের সংখ্যা কম থাকায় হাতুড়িয়ার হস্তে অনেকেই জীবন সমর্পন করেন। তালিকা বা অনুবাদই হাতুড়িয়াদিগের প্রধান সম্বল। ইহাদের সংস্কার আরো কিছু অদ্ভুত। ছাপান কাগজ দেখিলেই বিশেষ কলিকাতায় মুদ্রিত উত্তম কাগজ, উত্তম বান্ধান ও বৃহদাকারের কোন পুস্তক পাইলে ইহাদের ভক্তির পরিসীমা থাকেনা। তাহাতে যদি পুস্তকের ভূমিকায় দুই একটী আর্য্য শব্দের প্রয়োগ দেখে, দুই এক বার ভারতের পুর্ব্বাবস্থার বর্ণনা শুনিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা সেই আনন্দে একেবারে মোহিত হইয়া পড়ে। এইরূপ গ্রন্থের লেখক যে একজন অবতার বিশেষ বা অভ্রান্ত পুরুষ, এবিষয়ে তাহাদের কোনও দ্বিধাই থাকে না। সুতরাং এরূপ অনুবাদ দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে কত ব্যক্তির অকালে প্রাণনাশ হইতেছে,

তাহার বিশেষ শাসন হওয়া উচিত কিনা ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। অশ্লীলতানিবারণের জন্য যদি আইনের একটী ধারা হইতে পারে, তাহা হইলে অনেকের প্রাণরক্ষার্থ কোন প্রকার ব্যবস্থা হওয়া বোধ হয় অসঙ্গত নয়।

ইয়ুরোপ ও আমেরিকার অনুবাদক বা গ্রন্থকারকদিগের পক্ষে যে বিশেষ শাসন আছে তাহা এদেশে নাই। হইতেও অনেক বিলম্ব আছে। তত্রত্য সুসভ্য দেশ সকলে সাহিত্য,ইতিহাস,ভূগোল, অঙ্ক, শিল্পবিদ্যা, চিকিৎসা, দর্শনপ্রভৃতি প্রত্যেক শাস্ত্রের অনুশীলন ও উন্নতির জন্য এক বা অধিক সমাজ বা সম্প্রদায় আছে। এই সম্প্রদায়-সমূহ স্বদেশ ও বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিগণই ইহাদিগের সভ্যশ্রেণীভুক্ত। ইহাদিগের দ্বারা কোন ব্যক্তি সম্মানিত হইলে, তিনি যে সভ্য জগতে সম্মানিত হইলেন তাহার আর সন্দেহ কি? প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক একখানি সাময়িক পত্রিকা আছে। উক্ত পত্রিকাসকলে শাস্ত্রীয় বিষয়ের আলোচনা, নূতন আবিষ্কৃত বিষয়ের আন্দোলন ও প্রচারিত বিষয়সকলের সমালোচন হয়। নূতন রচনা বা নূতন অনুবাদ তাঁহাদিগের নিকট সমালোচনের জন্য প্রেরিত হইলে, তাঁহারা উক্ত কার্য্য সর্ব্বদা নিরপেক্ষভাবে এবং বিশেষ যত্ন ও বিজ্ঞতার সহিত সম্পন্ন করেন। এই কারণেই তাঁহাদিগের প্রতিপত্তির লোপ হয় না, এবং তাঁহাদিগের প্রকাশিত মতের উপর নির্ভর করিয়া সাধারণ ব্যক্তি-সকল পুস্তক ক্রয় করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের সমালোচকদিগের প্রকৃতি অন্যরূপ, তাঁহাদিগের ভয়ের বিষয়ও অতি অল্প এবং তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রমবিমুখ। এই জন্য তাঁহাদিগের সমালোচনকার্য্য সর্ব্বথা সমুচিত মত নির্ব্বাহ হয় না। অপিচ এদেশের সমালোচকদিগের সকল পকার শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা

সকল সময়ে ঘটে না। স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া কোন বিষয়ে একান্ত মনে সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হওয়া একরূপ এবং সামান্য যশো লিপ্সার অনুগত হইয়া উহাতে হস্তার্পণ করা অন্যরূপ। যাহাহউক যে কোন কারণে প্রচারিত বা অনুবাদিত পুস্তক সকলের যথাযোগ্য সমালোচন থাকিলে গ্রন্থকারক ও অনুবাদকদিগের একরূপ শাসন হইতে পারে।

অন্য বিষয়ে যাহাই হউক, অন্ততঃ আয়ুর্ব্বেদীয় অনুবাদের কোন-রূপ ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতি হওয়া উচিত। নতুবা অলক্ষ্যভাবে চিকিৎসা দোষে মূর্খের হস্তে কত শত ব্যক্তির যে প্রাণ বিয়োগ হইতেছে, তাহার স্রোত নিবারণের অন্য উপায় নাই। একেত চিকিৎসার অধিকাংশ ব্যাপারই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও আনুমানিক। অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তিকেও অনেক সময়ে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হয়। যে স্থলে অতি সূক্ষ্মনির্ম্মলবুদ্ধি ব্যক্তিরও বুদ্ধি কুণ্ঠিত এবং আকুলিত হয়,সেস্থলে বিদ্যা,বুদ্ধি বা চেষ্টার অসাধ্য বলিয়া মীমাংসা করা যায়। কিন্তু মূর্খ অর্থলুব্ধ অনুবাদকগণের দৌরাত্ম্যে যে সকল অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে তাহা আর ঐরূপ মীমাংসার যোগ্য নহে। যাঁহারা ঐরূপ অনুবাদক, তাঁহাদের ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, কিন্তু যাঁহারা পণ্ডিত হইয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন, সাধারণকে উহা বুঝাইয়া না দেন তাঁহারাও উক্ত পাপের কিঞ্চিৎ অংশভাগী কি না সভ্যসমাজ তাহার বিচার করুন।

আমরা যাহা বলিলাম, ইহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষ আমাদের লক্ষ্য নহে, কিংবা বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ কাহার কোন দোষোদ্ঘাটন করা উদ্দেশ্য নহে। কেবল দেশের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল এবং অনু-বাদকের মঙ্গল চিন্তাই উদ্দেশ্য। আমাদের বিবেচনায় অনুবাদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মসমূহ অবলম্বন করিলে, সাধারণের উপকার হইতে পারে।

১। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসমূহ প্রধানতঃ দুই প্রকার। মূলগ্রন্থ ও সংগ্রহ গ্রন্থ। সংগ্রহ গ্রন্থ আবার তিন প্রকার; বৈদিকসংগ্রহ, তান্ত্রিকসংগ্রহ এবং মিশ্রসংগ্রহ। মূল গ্রন্থে সূত্রাংশ এবং ঔষধকাণ্ড উভয়ই সমান ভাবে আলোচিত হইয়াছে, সংগ্রহগ্রন্থে সূত্রাংশ অল্প এবং ঔষধের কাণ্ড (ঔষধের তালিকা) ই অধিক দৃষ্টি-গোচর হয়। এই হিসাবে অধিকাংশ মূল গ্রন্থকে শাস্ত্রীয়তাপ্রধান এবং সংগ্রহ গ্রন্থ গুলিকে তালিকাপ্রধান বলা যাইতে পারে। তবে সংগ্রহগ্রন্থে শাস্ত্রীয়তা নাই এমন নহে, শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঔষধের ফর্দ্দই অধিক পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে। সংগ্রহকারকের মধ্যে যাহারা দৃষ্টফল ঔষধ যত বেশী পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংগ্রহই তত উৎকৃষ্ট বলিয়া বৈদ্য সমাজে আদৃত। মূল-গ্রন্থসমূহ শাস্ত্রীয়তাপ্রধান বলিয়া সংগ্রহগ্রন্থ অপেক্ষা দুরূহ, এবং সংগ্রহগ্রন্থগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত বলিয়া মূলগ্রন্থ অপেক্ষা দুরূহ। কেন না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত জানিতে না পারিলে পরস্পর-বিরোধী মতসমূহের মীমাংসা বা সমাবেশ করা যাইতে পারে না। সুতরাং মূলগ্রন্থের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা কোন কোন অংশে সংগ্রহগ্রন্থ অপেক্ষা কঠিন, এবং সংগ্রহ গ্রন্থের অনুবাদ বা ব্যাখ্যাও মূলগ্রন্থ অপেক্ষা কোন কোন অংশে কঠিন।

২। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা হইল, অতঃপর অনুবাদের বিষয় বলা আবশ্যক। অনুবাদও সাধারণতঃ দুই প্রকার; স্বাধীন অনুবাদ এবং আক্ষরিক অনুবাদ। কোন গ্রন্থ অধ্যয়নান্তে তাহার মর্ম্ম সুন্দর রূপে অবগত হইয়া গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বিষয় নিজের ভাষায় বিশদ করার নাম স্বাধীন অনুবাদ। অপর,গ্রন্থের লিখিত ভাষার অবিকল অনুবাদ করার নাম আক্ষরিক অনুবাদ। উভয় অনুবাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অনুবাদই

কঠিন। কঠিন হইলেও উহা প্রকৃত ভাবব্যঞ্জক। আয়ুর্ব্বেদের যে যে গ্রন্থ বা অংশ সূত্রপ্রধান বা শাস্ত্রীয়তাপ্রধান সেই সেই গ্রন্থে বা অংশে স্বাধীন অনুবাদই প্রশস্ত। কেন না আয়ুর্ব্বেদীয় সূত্রসকল দার্শনিক সূত্রের ন্যায় স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত, বহুচিন্তা ও পরীক্ষা ভিন্ন সহসা ঐ সকল সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্যগ্রহ হইতে পারে না। সুতরাং "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" করিয়া অনুবাদ করিলে উহাতে কোন পাঠকের উপকারের সম্ভাবনা নাই। কোন কোন অজ্ঞলোক মনে করেন, গ্রন্থের প্রতিশ্লোকের অক্ষরে অক্ষরে যদি মূলের সহিত ঐক্য না রহিল, তাহা হইলে অনুবাদ কি? কিন্তু তাহাদের ইহা বুঝা আবশ্যক, সকল গ্রন্থের শব্দ-চর্ব্বণ আবশ্যক নহে, ক্রিয়াপ্রধান বা ফলপ্রধান শাস্ত্রের ভাব বা তাৎপর্য্যই আবশ্যক। সেই তাৎপর্য্যবোধের যদি ব্যাঘাত ঘটিল, তাহা হইলে অনুবাদে বিশেষ লাভ কিছু নাই। অন্ধ অনুবাদ হওয়া অপেক্ষা না হওয়াই ভাল। স্বাধীন অনুবাদে শ্লোকাঙ্কের মিল সর্ব্বত্র রাখিলে ভাল হয়না। কখন কখন একটী শ্লোককে চারি পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়া অনুবাদ করিতে হয়। আবার মূলগ্রন্থে কতকগুলি এমন অংশ আছে, অনুবাদে যাহা পরিত্যাগ করিলেও কোন হানি নাই। বরং কিছু স্থান লাভ হয় যথা—প্রায় অনেক অধ্যায়ের শেষ অংশে "ভবন্তি শ্লোকাঃ" এইরূপ উল্লেখের পরে কতকগুলি শ্লোক আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে যে বিষয়গুলি গদ্যে লিখিত হইয়াছে, সেই গুলি পুনর্ব্বার শ্লোকে লিখিত হইল। কেন না, শ্লোকে বা কোন ছন্দে লিখিত বিষয় শীঘ্র কণ্ঠস্থ হয় এবং অনেক দিন স্মরণ থাকে। যিনি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে গিয়া এস্থানে 'শ্লোকে কহিতেছেন' প্রতিজ্ঞা করিয়া গদ্যে অনুবাদ করিলেন, ইহাতে গ্রন্থের শব্দের অনুবাদ হইল বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের অভিপ্রায় অনুসারে অনুবাদ হইল না। তবে উহা পদ্যে অনুবাদ